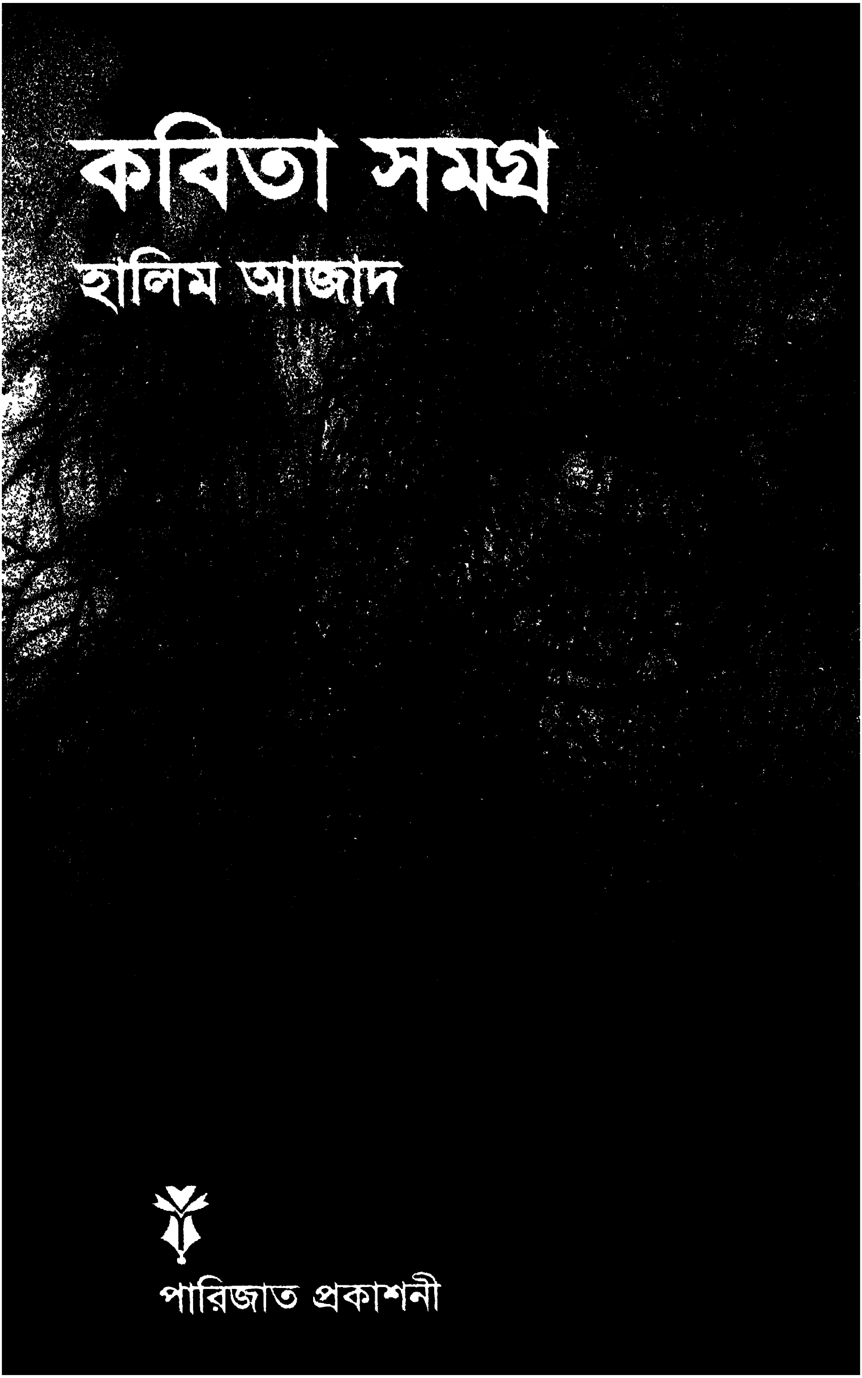


কবিতা সমগ্র || হালিম আজাদ



কবিতা সমগ্র

হালিম আজাদ

পারিজাত প্রকাশনী

কবিতা সমগ্র ⌟ হালিম আজাদ

প্রথম প্রকাশ : ২০১২
প্রকাশক : শওকত হোসেন লিটু
পারিজাত প্রকাশনী ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬-৫০৯৬ মোবাইল : ০১৭১১-৯০৬০৪০
প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন
আগরতলা পরিবেশক : মৌমিতা প্রকাশনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
বর্ণবিন্যাস : শাওন কম্পিউটার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণ : হেরা প্রিন্টার্স, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা
মূল্য ৫০০ টাকা

KABITTA SOMOGRO

(A collection of poems by Halim Azad
Published by Showkat Hossain Litu
Parijat Prakashani 68-69 Pyaridas Road Dhaka-1100
Phone : 716-5096 e-mail : parijat.prakashani@gmail.com
U.S.A Distributor : Muktadhara, Jackson Heights, New York
U.K Distributor : Sangeeta Limited. 22 Brick Lane, London E1 6RF
First Published 2012

Price : Taka 500 Only

ISBN : 978-984-507-109-3

উৎসর্গ

বাংলাদেশ, মাটি ও মানুষ

সূচিপত্র

অদ্ভুত দরোজার কাছে

মস্কো টাওয়ারে কিছুক্ষণ

কারো কারো দিকে অবিরাম চেয়ে থাকা

পাথরের মানুষ

ভেঙে দাও নারকীয় দেয়াল

যে তিমির হৃদয় ছুঁয়ে যায়

অগ্রন্থিত কবিতাগুচ্ছ

অদ্ভুত দরোজার কাছে

কেন পাখির স্বভাব চাও

আমি কি পাখির সন্তান যে কেবল এক গাছ থেকে আর এক গাছ,
এক বন থেকে অন্য এক বনে উড়ে উড়ে কাটাবো কাল।
এতোকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে আছি পৃথিবীর বুকে,
নদী থেকে জল, মাঠের ফসলে চুমু দিয়ে বুঝে নিয়েছি
মানুষের অধিকার।

কারো সাথে শত্রুতার ভাব-টানাটানি, কানাকাটি নেই,
কোথাও রাখিনি পা যেখানে সহজেই ফোটে বিষবাস্প ফুল
সকলের সাথেই বন্ধুত্ব হবার কথা ছিলো,
কারো কারো ভালোবাসা, পতাকা উদ্ধারের কথা ছিলো,
কেউ-কেউ বোন, কেউ হয়তো ময়ের মতো স্নেহ দেবার কথা ছিলো

কথা ছিলো আমি আর কোথাও যাবো না,
অন্যগ্রহে, এলোমেলো পথে যাবো না
আমি এদেশেরই লোক, পিতৃহীন ঘরছাড়া এক বাউল সন্ন্যাস—
যার অন্তরে একঝাঁক ঝড়ের চিহ্ন, বেদনার দাগ,
যার ভেতরে আঘাতের মিছিল মুহুর্মুহু নির্যাতন করতে আসে
রাতের প্রহরে, দিনের দুপুরে খাঁ-খাঁ করে জলে
আপনজনের অভাব!

তোমরা সেই শ্মশানবিদ্ধ দেয়ালে পুনর্বার লিখতে চেয়েছো
দূরের ঠিকানা ডাকছে তোমাকে তুমি যাও! .
এই বিরহকাতর দিনে আমি কোথায় যাবো,
কোন বন্দরে একাগ্র হবো এই ছিন্নভিন্নকালে!

আমি তো পৃথিবীরই লোক,
এখানে তো সবাই থাকতে পারে, কেন অধিকারহীন চাও?
কেন চাও চোখের আড়ালে দূরের নির্জনে কারাবাস?
আমি তো পাখির মতো নই, কেন পাখির স্বভাব চাও?
কেন চাও অতল সমুদ্র? মরাকাল নিশ্চিহ্ন কঠোর পথ?

এক রাত এক যুগ

যে-রাতে না-খেয়ে থাকি
সে-রাত যেন রাত নয়,
মনে হয় যুগ যুগ ধ'রে ক্ষুধার সমুদ্রে
পড়ে আছি বহু কালের শ্রমিক!

ক্ষুধার রাত বয়ে বয়ে দীর্ঘজীবী হয়,
পৃথিবীর সমান বয়সী হয়,

যে-রাতে না-খেয়ে থাকি,
সে-রাত আসে মহাযুদ্ধের খবরাখবর নিয়ে।
যেন মহাকাল,
উপোসি প্রাণহীনের বেগে হামাগুড়ি দেয়া,
মনে হয় কতোকাল ধ'রে ভুখা জীবনের ঘানি টানাটানি
শূন্যতার রঙ্গমঞ্চে।

যে-গাছ এখনও

আমি কেন ইচ্ছেমতো হাঁটার জন্যে পথ পাই না,
সবার মতন খাওয়ার জন্য ভাত পাই না
চাঁদের মতন উদার ভাবের মন পাইনা,
শিখা'র মতন যোগ্যতম বোন পাই না!

আমিও মানুষ,
আমারও তো বাঁচার জন্যে ঘর থাকা চাই,
দুঃখ-কষ্ট বোঝার জন্যে জন থাকা চাই,
একলা আমি পথের মানুষ
    বুকের ভেতরে জমছে শুধু দহন বায়ু
এই যাতনা পুড়ে ফেলার হাত থাকা চাই,
গাছের মতন সরল প্রাণের মন থাকা চাই!

আমি কেন নদীর মতন শুধু শুধু ক্ষয়ে যাবো!
এ-পথ থেকে আরেক পথে, মধ্যরাতে, ফুটপাতে
                                সঠিক জীবন খুঁজতে খুঁজতে
অনাদরে, অনাহারে লেলিহানের স্বাদ নেবো!
কেন আমি একা একাই পাপবিদ্ধ লাশ নেবো!
ছিন্নমূলের খরা থেকে ফসল নেবো!

আমারও তো অসুখ হলে সেবার জন্য লোক থাকা চাই,
এই যে জীবন বরফ হয়ে গলছে কেবল, আমার এসব
আঁধার কালের ধুলোবালি, করুণ বনের হানাহানি,
ধ্বংস করার লোক থাকা চাই!

বিপরীত মানুষের গল্প

তোমাকে ছাড়া নির্জীব পাথর যেন ঢাকার পথে পথে
ঘুরি ফিরি বিরহের বাঁশি,
যেনো ফতুর গৃহ তান্ডবে হারিয়ে সব শূন্য ভিটায় কাঁদে ।
খুঁটিহীন দেহ, লকলকে বৃক্ষের মতো উড়ে উড়ে আর ভাঙে,
যেন দুর্ঘটনা, চোখের আয়নায় জুড়ে আছে পরাজিত খাম,
চিহ্নহীন পিয়নের ঝোলা,
কিংবা তাড়া-খাওয়া একটি কুকুর অনর্গল ঘেউঘেউ করছে
বাতিল গাড়ির ভেঁপু,
অযথাই রাস্তায় নুড়ি ও বালির সাথে গড়াগড়ি যায়
সমস্ত বিকেল,
এই চাষবাসে বিপর্যস্ত চাষি কখনো কি ফিরে পাবে
হারানো বসন্ত নদী ।

খুব একাকিত্বে বাঁশি হাতে বংশিবাদক,
এলোমেলো পাতা যেন গাছ থেকে পড়ে যাই নষ্ট খাদে,
নিজের বিরুদ্ধে নিজেই সাজিয়ে রাখি মরণের দৃশ্য ।

এখন আমার জেগে ওঠার সময়,
তোমার ভয়াল মূর্তির ভেতরে সাবলীল আঘাত হেনে
ঘরের জন্যে ঘর, কবিতার জন্যে কবিতা নয়,
পাষাণ নারীত্ব তছনছ করে সংসার গড়ার উপযুক্ত দিন ।
আমি এই উলঙ্গ দোতারা লন্ডভন্ড করে সমাজ বানাতে চাই ।

তোমাকে চেয়েছি বলে দিয়েছো তোমার এক বিপরীত সাপ,
ছোবলে আঘাত ঢেলে করেছো পৃথিবীর বর্জিত বীজ,
যেখানেই যাই আগাছার বান কাঁদিয়ে মারে আমায়,
যে-পথে রাখি পা সে-পথেই আজ নিষিদ্ধ মানব বলে—
যে-ফুলে গন্ধ নিই, সে-ই আমায় অধিকার-ছাড়া করে ।
যেন আমি এক নাগরিকত্ব-হারানো অন্য দেশের পাখি,
যাকে তুমিই দিয়েছো ঠেলে নির্বাসন আর পুড়ে মরা ।

অস্ত্রহীন নই

বন্দুক দেখচ্ছো কেন?

দেখছো না বিশ কোটি হাত।
বিশ কোটি হাত মানে
বিশ কোটি রাইফেল,
দশ কোটি হৃদয় মানে
দশ কোটি অস্ত্র!

আমরা কখনো করিনি ভয়,
কখনো ছাড়িনি হাতিয়ার,
এখনও ভেঙে চলেছি শাণিত দেয়াল।
আমরা ভাঙতে ভাঙতেই এসেছি
আসাদের স্বপ্নের বাড়ি,
আমরা হারাতে হারাতেই এসেছি
রফিকের কবরে, শবমেহেরের দেশে।

আমাদের ভাঙ্গনের কোনো ভয় নেই,
আমাদের হারাবার কোনো ভয় নেই,
বন্দুক দেখাচ্ছো কেন?

অস্ত্র নেই বলে আমরা অস্ত্রহীন নই!

আততায়ী ১৯৭৫

আমি আর কতোটুকু অন্ধকারে যাবো! কতোকাল
পড়ে থাকবো বোবা সন্ন্যাসীর বেশে তাতানো ঘরে!
পাথরের মতো—কাতর ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘকাল
নুয়ে আছি পরবাস অরণ্যে, রোগাটে স্বদেশের
অতল ঘা বহন করে, এ-কাঁটা আমার বুকের
দরোজায় বার বার আততায়ী হয়ে ঢুকে যায়!
এই নিষিদ্ধ হাতিয়ার বাগানের ফুল, বৃদ্ধার
জামা, প্রেমীয় মুদ্রার সচ্ছলতা—চোখ কেড়ে নেয়!

নিরন্ন কাল মাটির ওলান ঘেঁষে বেঁধেছে ঘর!
ক্ষয় আর ঘুণের ছায়াপাত এই মরূদ্যান থেকে
আমাদের উঠে আসবে হবে! অমৃত গানের জন্যে
মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে প্রকৃত সাহস।

আমরা আর কতবার নিঃস্ব হবো, কতটা যুগ
সারি সারি লাশ—ধ্বংসস্তূপের মাঝে শূন্য হবো।

এই কবিতাটি

এই কবিতায় আর কিছুই নেই—শুধু উপোস-করা মানুষ,
ক্ষুধায় জর্জরিত কারখানার শ্রমিক লিয়াকত,
পরান আলীর ঘাম বিদ্ধ হয়ে আছে, যাকে আমি
দেখেছি—শোকে সন্তাপে।

সব-হারানো চিৎকারে উত্তপ্ত করেছিল পৃথিবী,
নির্মম আততায়ীর অগ্রাসনে যাদের সংসার
বিপন্ন হয়েছিল,
শিশুদের কান্নায় মায়াময় প্রভাত,
ভালোবাসার সকাল—ভেঙে চুরমার হয়েছিল।

এই কবিতা সেই চাঁদ-হারানো আদিম সভ্যতার
অবসান চায়,
এই কবিতা চায় ইট-ভাঙা রমণীর বসন্ত দিন,
সড়ক দুর্ঘটনায় যে মা হারিয়েছে তার
শেষ সম্বল শিশুটি!

এই কবিতা একদিন সুন্দর ফুল হবে গাছ হবে।
শিশুদের খাদ্য হবে—মাঝির বৈঠা হবে।
বঙ্গভবনের গণতান্ত্রিক সভা হবে।
এই কবিতা চায়—জাতিসংঘ শান্তির কর্ণধার হোক,
পৃথিবীর বেহেস্ত হোক।

এই কবিতা হোক ভুবনজোড়া খাদ্যগুদাম,
হোক পিতামাতাহীন সন্তানের আদুরে বাতাস,
এই কবিতা চায় তোমার আমার পরিপূর্ণ মুক্তি,
সংঘাতহীন বয়ে চলা,
এই কবিতায় অন্য কিছু নেই।

ভুলের গল্প

মিছেমিছি সান্ত্বনা তুই চলে গেলি,
ফুলের গুচ্ছ তুচ্ছ ভেবে
মন ভরে কেন আঘাত নিলি,
সরল বনে বিষাদ এনে,
আপন ঘরে আগুন দিলি।
স্বর্গের দ্বার খোলাই ছিলো,
মনের মতো মানুষ ছিলো
মধ্যরাতে একা একা—
চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে,
কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলি
শুভ্র প্রাণে বিষ ঢেলে তুই।

মিছেমিছি আমার প্রতি
অভিমানের মশাল জ্বেলে
হৃদয় ভরে ঘৃণার সাগর
শ্রমিক প্রাণে নষ্ট প্রহর,
কবির গৃহে দাহ এনে
অবুঝ আহা হারিয়ে গেলি,
অন্ধকারে নেচে নেচে!

এখন আমার আকাশ জুড়ে
লালনগীতির কথার মতো;
বাউল স্বপ্নের চিত্রগুলো.
ভাবিয়ে তোলে—মরা নদীর ক্ষতের মতো।
ধুঁকে ধুঁকে এমনি করে—
আর কতকাল শেষ হওয়া যায়,
এখন আমি পথে পথে—নগ্ন ঘাসে
ক্রমাগত তোরই সাথে—
মাটি জলে—সকাল-সন্ধ্যা রয়ে গেছি,
যেমনি ছিলাম ছয়টি বছর,
আজও আছি তেমনি ভাবে!

মনে রাখিস, অবুঝ পাথর,
অভিমানে রঙিন গাঁয়ের স্মৃতিগুলো
মুছে দিলি,
মুক্তি সে নয়, কষ্টগুলো নিজের ভিতর
নিজেই তুই যে ইচ্ছেমতো গড়ে নিলি।

গৃহের দিকে

হাতের ময়লার মতো খুব ঘষামাজা করে ফেলে দিয়েছো আমায়,
ছেঁড়া বস্ত্রের টুকরোর মতো—তোমার আকাশ থেকে যেদিন
মাটির কণার সাথে দিয়েছো ঠাঁই!
সেদিন থেকেউ পড়ে আছি তুচ্ছ ঘাসের সাথে, তলহীন তলে!
মানুষের পায়ের নিচে কীভাবে থাকি, কি করে কাটাই দিন
কখন আমার করুণ সূর্য ওঠে, কখন বেদনার রাত বয়ে যায়—
তা কি কোনোদিনি দেখেছো তুমি! কখনো কি নেয়েছো আমার খোঁজ।

কতটা কাঁদিয়ে মারবে আমায়,
কতোটুকু বিবর্ণ জলরাশি দেবে,
জীবনের সব বসন্তে দিয়েছো মরা শকুনের বয়ে চলা।
কাঁটার মালা পরিয়ে সেই যে তাড়িয়ে দিয়েছিলে অসহ্য বনে,
এই কুয়াশার বান—আমায় রাখে কি ভাঙে,
ভাঙে না জ্বালায়
তার তো কিছুই বোঝনি তুমি!
ভুলেও ফেরাওনি চোখ আমার হৃদয়-খসা মরুভূমির দিকে।

আমার পথে পথে আজ লালবাতি জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে এক
অলৌকিক ট্রাফিক!
তার কাছে সবুজ প্রদীপ নেই,
সে তার উঁচানো হাত ওপরেই রাখতে জানে,
নামাতে পারে না কোনোদিন,
তার কাছে স্বস্তির বাঁশি না দিয়ে তুমি কী করে
তাড়িয়ে দিলে আমায়।
আমি আছি কি নেই, বিরহে না দুঃখেই
কত যে কালিমার স্রোত ভাসিয়ে নিয়েছে প্রেম
তার কি রেখেছো খোঁজ।

আমি রোদে পুড়ে আঁখির জলে ভিজে ভিজে কাতর হয়ে যাই,
তোমরা তো কেউ আমায় কোনোদিন ডাকোনি, 'আয় হালিম আজাদ
ঘরে আয়।

ভাত ও তহুরার কথা

ভাত, আহা কী অদ্ভুত জাতের জিনিস—তোর জন্যেই তহুরা বিবি
গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেলো,
তবুও কি তোর পাষাণ মুখ দেখবে না সরল মানুষ! জীবন
আহা কী দুষ্প্রাপ্য—অবৈধ দোতরার গান!
তোকে খুঁজতে খুঁজতে
কত আর খালি হবে গ্রাম?
ক'কোটি তহুরা নিষিদ্ধ খাতায় চোখের জল ফেলে
লিখতে থাকবে নাম?

তোর জন্যেই করুন মাঝি নৌকো ছেড়ে এসেছে বস্তির খোপে,
কৃষক কালাই চান; ভূমিহীন সাবের আলীর দল সিঁড়ির নিচে
গামছা সিথান দিয়ে ফিরে পেতে চায় হারানো
বধূর রাত,
যেন কতোদিন যায় শ্রমজীবী বুক শূন্য, জ্যোৎস্না থেকে দূরে।

ওখানে ওই ছনের বেড়ায় লেগে আছে বিরহ কাঁটার কলি,
ন্যাংটো শিশুর গৃহ চায় সুষম পৃথিবীর অবিরাম বেড়ে চলা।
ওদের পেটের ওলান বাসা বেঁধে থাকে পাথর নামের সুধা!
তবুও কি তোর কালিমার স্রোত, আতপ্ত
জ্বালামুখ ভাসিয়ে দেবে আমার প্রিয় জামার মতো এই দেশ!
কত আর উপোস রবে ভাঙা স্বপ্নের ঘুণেধরা মানব-সংসার।

ভাত, আহা কী দুঃশাসন, আহা কী কষ্টের সংবাদদাতা,
তুই আর কতোটা দুঃখ উপহার দিবি!
কত আর "থাক থাক কাঁদে না" এইসব মিছেমিছি
শোনাবি গান!

কয়েকটি দুঃখ

১.

বার বার তাড়িয়ে দিয়েছো বলে বার বার এসেছি কাছে,
কত আর কাঁদাবে আমায় কতোটা ফল থাকে একটি গাছে!
ভেঙেছো হৃদয় খেয়েছো অমৃত বৃক্ষের ফল তুমি
কিছুটা স্বস্তির দিন দাও কিছুটা জল, তাজা হোক এই
তৃষিত ভূমি।

২.

ফিরে চাও ফিরে চাও বলে কত ডাকলাম, আহা মানবী
একদিনও দেখলে না ফিরে,
এই না-চাওয়ার ব্যথা, কঠিন দেয়াল দূর পথ গড়েছে
তোমাকে আমাকে ঘিরে!

৩.

আমি যেই মাটির মানুষ তুমিও তার বুক দিয়ে হাঁটো,
কষ্ট পাই দুঃখ পাই তবু কেন এর বেড়ে চলাকে কাটো!
আমি যেই ভাষার শরীরে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি দিন,
তুমি অবুঝ দোতারা, তার কাছে জমিয়ে যাচ্ছো শুধু ঋণ!

৪.

আমিও ঘরের আশায় ভেঙেছি ঘর বুঝলো না অবুঝ মেয়ে,
পৃথিবীতে নাই কোনো গৃহসুখ হবে তোর যেখানে গিয়ে!
কী এমন অচল মুদ্রা আমি তোর কাছে দামহীন হয়ে আছি,
ও কঠোর মেঘ, এখানে ঝরাও শস্যের প্রাণ সবাই আমরা
বাঁচি।

৫.

এখনও রাত ব্যথা-বেদনায় ঝরিয়ে যায় নিরন্ন কালের ঘাম,
এখনও পথে কষ্টের গাড়ি কেবলই বাড়িয়ে চলে জ্যাম,
এদেশ কি আর কখনো দেখবে না ভালোবাসার রাত
এ-পথে কি আর আসবে না সে-গাড়ি, যাতে বোঝাই থাকে
ভাত!

যে-মেয়ে সেতার বাজায়

যে-মেয়ে সেতার বাজায় রাত জেগে জেগে,
তার বুকে খুব ব্যথার পাহাড় আছে!
ভৈরবী তাল ধরে গভীর অরণ্যের মাঝে ডুবে
যে-মেয়ে আবিষ্ট হয় গানে,
তার অন্তর্হিত আবেগে সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস
আঙুলের টোকায় ভাসে—
ফুটে ওঠে যেন নবীন বৃষ্টির স্বাদ।

নির্দয় তার ঘষে ঘষে—ক্লান্তির বাতাসে আনে মলিন সুর,
তার তো সময় অসময় নেই,
ঝড়ের উচ্ছ্বাস বেগে কখনো মায়াময় দৃশ্য মমতা গড়ে,
তর্জনীর প্রেমে বেঁধে ফ্যালে গত জীবনের স্বরলিপি।
সে সকলই পারে,
পারে বনবাস—অস্থির কথামালা নিয়ে ঘুমিয়ে যেতে!

নিবিড় করুণায় মিশে আছে এই যন্ত্রী পাগল মেয়ে,
সে যেন মেয়ে নয়;
শীতল সংলাপঘেরা ভাষাহীন এক পাখি!

যেন কতকাল পর—
সুরেলা বায়ুর মধ্য থেকে বের হয়ে এল অদম্য কারিগর,
রাত জেগে জেগে চাঁদের অন্তরে ঢুকে গেছে অই অন্তরঙ্গ ফুল,
সে যেন মেয়ে নয়—পৃথিবীজোড়া এক নির্মল বসন্ত!

সমুদ্রদহন থেকে

বারবার দুঃখ দেয়ার চেয়ে তুমি শুধু একবার
আমাকে চরম অভিশাপ দাও,
আমি সমস্ত ব্যথার আগুন, জ্বালাময় পাথর ভেঙে
ফিরে যেতে চাই—
নিঃসঙ্গ তাতানো গৃহের দিকে!

এইভাবে সব হারাতে হারাতে একদিন শূন্য হয়ে যাবো,
দেখছো না, খরতাপ—দগ্ধ সময়ের ঘুণপোকা
আমাকে খুঁটে খুঁটে খায়,
যেন প্রতিটি দিবস এক এক যুগের সাথে আলুথালু
অস্তিত্ব বিলীন হওয়া,
খসে খসে যাওয়া—মূল্যহীন মুদ্রার আদলে
কতোটুকু আর সহ্য করা যায়!

নিরন্ন চিত্র আঁকাআঁকির এই কাল,
দোহাই আমাকে একেবারে দূরে ঠেলে দাও,
হয়তোবা,
এমন একটি যন্ত্রণা এনে দাও
এমন একটি পথ করে দাও
যাতে জীবনের সব গ্লানি, ঝুলে থাকা দুঃখের ভার
ভেঙেচুরে
কেবল একবার, শুধু একবারই শেষ হয়ে যাবো!

আমি শুধু তোমার অন্তর থেকে একটি যোগ্য ব্যাধি চাই,
বারবার দুঃখ পাবার চেয়ে,
মৃত্যুর ঠিকানা—এরকম
বাঁচার সাহস চাই!

স্বাধীনতা এই শস্যপর্ব

স্বাধীনতা তার, যে মেয়েটি যুদ্ধের মাঠে হৃদয় রেখে
শাড়ির আঁচল ভরে দুখের বান,
অন্তরে গুলির আঘাত নিয়ে শহীদ হয়ে গেছে।
যে-বালক ফিরে আসবে বলে মাকে কথা দিয়েছিলো,
অবশেষে সেও রক্তের বদলে তেজোদ্দীপ্ত ফুল, স্বদেশ-পতাকা,
অম্লান বাঙলা করে গেলো মুক্ত!
এই অমর দেশের স্বাধীনতা—
আমি সেই বালকের জীবনত্যাগের কাছে,
সেই আত্মদান বালিকার চোখের জলের কাছে
অর্পণ করে বলবো,
তোমাদের ঋণ শোধ করার মতো কড়ি, মুদ্রার পাহাড়,
তা তো আমাদের কাছে নেই,
যে-চাঁদ উদ্ধার করে আলোকিত করেছো মহান ঘর,
যে-মায়ের স্বপ্নের বীজ ফসলের খামার হয়ে ডাকে!

সন্তানের বিনিময়ে—
গোলাপের কলি ঝরে পবিত্র হয়েছে এই উপত্যকা,
এই শ্রমের সব সুখময় আনাগোনা তোমাদের।
ভোরের হাসি, রাত্রির মধুময় কুহুতান তোমাদের।
নদীর জলের নিরাময় কলতান—স্রোতোধারা তোমাদের।
গ্রাম্য মেয়ের হাঁটাহাঁটি, ঘুঙুরের শব্দ, শিশিরভরা পাতা,
সবই তোমাদের প্রণয়ে বাঁধা,
এই মূল্যহীন স্বাধীনতা তোমাদের নামে লিখে দেয়া চলে।
পতাকার মালিকানা তোমারই, শার্টের বোতাম খুলে
যারা প্রতিশোধের বুলেট বুকে নিয়ে অম্লান হয়েছে কালে,
আমি এইসব আনন্দের দিনরাত তোমারে দিয়ে দিতে পারি।

স্বাধীনতা তার,
যার নামে শহীদ মিনার প্রতিদিন গানের সংলাপ বোনে,
যে-মাঝি বৈঠা ফেলে যুদ্ধে দিয়েছে প্রাণ
লাঙল ফেলে যে-কৃষক একাত্তরে হারালো প্রিয়মুখ বধূ,
বিদ্যালয়ের সেই এগারো বছরের কিশোর,
যে কাফনের পোশাক পরে
কবরের সাথে কথা কয়।
তার প্রতিটি হাড়ের সাথে,
সমস্ত মৃত্যুর স্মৃতির সাথে,
স্বাধীনতা জড়াজড়ি করে আছে এই বাঙলায়।

বাড়ি ফেরা

যদি বাড়ি ফিরে না যাই কেউ ডাকবে না,
কেউ বলবে না, আহা ভালোবাসাহীন পথের শ্রমিক,
কত আর শেষ করে যাবে সবুজ বৃক্ষের ফল,
তার কি ঘরের প্রয়োজন নেই!
তার কি নেই এক জ্যোৎস্নাময় ঘাসে উজ্জ্বল হয়ে যাওয়া!

একদিন লাটাইয়ের সুতো ছিঁড়ে জননীর কোল থেকে
কাঁদতে কাঁদতে
ফেলে এসেছিলাম পিতামহের ঐ বাড়ি,
কেউ ফেরায়নি, বৃদ্ধা মাতা ছনের দরোজা খুলে
চেয়ে থাকে পথে,
শুধু এই পোড়া খুঁটি—ধরে রেখেছে আমার যত স্মৃতি,
কেউ ডাকবে না আমি জানি,
অন্তত আমার মা একদিন ডাকবে, একদিন বুঝবে
একদিন চিৎকার করে বলবে,
কষ্টের বাউল তুই, আয় একবার তোর মায়ের অন্তরে—
ফিরে আয়।

গান ও মাটির ভূমিকা

তুমি একটা গানের কথা বলেছিলে,
শুনেছি গানটার ভেতরে—একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধার মা,
তাঁর হারানো সন্তানের কথা বলতে বলতে,
ভাঙা খুঁটির মতো আছড়ে পড়েছিলো—
খোলা আকাশের নিচে।
তাঁর দীর্ঘশ্বাসে ভূমিকম্পের মতো শুধুই ঝরেছে
বেদনার পাতা—অনুভবের গ্রাম!

আঁচলে ছেলের মুখ, উর্বর আঙিনা—বইয়ের মলাট
আর ছোট্ট শিশুর আদরে চিৎকার নিয়ে সেই মা—
শহরের কালিমায় ঢুকে,
রাস্তাগুলোকে এতোকিছু বলে যেতো
তখন সব মানুষ 'অগ্যাঁ পত্যিয়ের' আন্তর্জাতিক গান গেয়ে
বেড়াতো উজ্জ্বলতার দিকে,
তাঁর কান্নার ভারে মাকড়শার সুতোর মতো থরথরে কেঁপেছে
বোবা পৃথিবী—স্থিরতায় অন্তর!

এমন একটি গান—যা কেবল হৃদয়ের সারিতে
একবার বাজিয়েছিলো সালামের গুলিবিদ্ধ লাশ,
সে-গান আজও বাজে রাজার শোষণে,
বাজে তোমাদের অষ্টপ্রহরে—আমাদের কাজে—চলার পথে!

বাড়িটি জাদু জানে

কতবার বললাম দোহাই দোহাই আমাকে না ডাকাই ভালো,
আমি আর কোনোদিন আসবো না এ বাড়ি,
আমাকে ক্ষমা করে দাও হে বিষাদিত কালো দ্রাঘিমা!

কতবার বললাম,
আমি একা একা থাকতে চাই—আমার খুব কষ্ট হয়,
তার পরও বিষণ্ন বাউল,
নির্জন পিয়ানো ইশারায় আহ্বান করে,
বলেছি, আমাকে মুক্তি দাও
অসহ্যের বারান্দা—উত্তপ্ত চোখ,

তার পরও দেখি হাহাকারভরা বায়ু,
বেদনামাখা ভোর, ঝড়ে কাতর হওয়া উলঙ্গ বৃষ্টির ফোঁটা
সমস্ত প্রণয় ঢেলে ফিরে এসে গেছে কাছে,
আমাকে আবারও জয় করে ফেলেছে অদ্ভুত দোতারা!

দেখি ভয়ের জানালা খুলে বীভৎস তাকায় ব্যথাতুর চাঁদ,
যার উৎসব দূর সমুদ্রের ফেনায় ফেনায়
আপ্লুত হয় গানে,
বলেছি, আমি এ-ঝড়ের অবসান চাই!

বাড়িটি জাদু জানে, নইলে এভাবে ডাকবে কেন?
কতবার বললাম,
দোহাই দোহাই আমাকে না ডাকাই ভালো,
তার পরও কে যেনো কেড়ে নিয়ে যায় সেই দরোজায়,
তার পরও ফিরে আসা হয়—এই ফুসমন্তরের ঘরে।

শোণিত পথের দিকে

আমাকে এভাবেই বাতাসে গন্ধ নিতে হবে,
চারিদিকে নিরন্ন সাগর,
বিনিদ্র চোখের কোণে স্বপ্নহীন—মন্বন্তরঘেরা লোক,
তপোবন ছেয়ে গেছে শক্তিমত্তাহীন ঘাতক—
শৈল্পিক গহনে বদ্ধাহত বুকের নিশ্বাস,
শ্রমের বাগানে উদ্বেলিত ছায়ায় হাঁটাহাঁটি।
শস্যের উদরে হেলিয়ে পড়েছে শ্যামল বৈশাখ,
কবিতা হয়ে গেছে পথের ঠিকানা
পৃথিবীতে মানুষের খোঁজ নেই!

আমাকে এভাবেই বাতাসে গন্ধ নিতে হবে,
এভাবেই রুগ্ন সীমান্তের কোলে দিতে হবে রঙিন প্রহরা।
জরায়ু ছিঁড়ে আনতে হবে আগামী সকাল!
তোমরা সবাই প্রস্তুতির কথা বলো,
বলো মানবিক সবুজের কথা!

আমাকে এভাবেই বাতাসে গন্ধ নিতে হবে!

নিবেদিত জ্যোৎস্নায়

আমি সেই লোকালয়ে ফিরে যাবো—
যেখানে ভাদ্র মাসের বৃষ্টিতে ধানের জমি নেচে ওঠে বারবার,
প্রভাতি কোকিলের ডাকে—অনাহারী মানবিক মঞ্চে
ভেসে আসে কোমল উদ্যান,

যেখানে মরমি লতা, মায়াময় প্রণয়সম্ভার,
ভালোবাসার জিয়নকাঠি প্রতি ভোরে নিয়ে আসে
যুদ্ধ-প্রার্থনার সকাল!
পঁচিশ বছরের ঘাম ঝরে যে-চন্দ্রমল্লিকার হাসি ফুটেছিল,
আমি তার গর্জনে মেলাবো কণ্ঠ,
আমি সেই লোকালয়ে ফিরে যেতে চাই!
আমাকে কিসের উচ্ছ্বাসে তলিয়ে দিতে চাও,
কিসের রংঢং, অমরতার ভুল গল্পে—নিষিদ্ধ লোবানে
আবিষ্ট করতে চাও।
আমি কি জানি না কে পরাতে চায় বেদনার পোশাক।
আমি কি চিনি না শোষক বেজন্মার দল, বিষদাঁতঘেরা
শকুন-শকুনির মুখ,
আমার সকলই মনে আছে,
কে কোন জাতের বৃক্ষ, কোথায় করি নির্লজ্জ বাস.
আমি সবকিছু বলে দিতে পারি,
আজ রক্তের বদলে রক্তের সমুদ্র বয়ে যাবে,
যদি না ফিরিয়ে দাও—স্বপ্নের বাগান
স্বজনহারানো লোকালয়!
আমি সেই লোকালয়ে ফিরে যাবো,
যেখানে মুখর শহরের জন্যে,
প্রার্থিত গ্রামের জন্যে
সারিবদ্ধ লাশ পড়ে আছে,
কাঙ্ক্ষিত ভুবন অপেক্ষায় আছে
বাউল সংগীতে যেখানে ধ্বনিত হয় নতুন দিনের পথ,
আমি সেই জনপদে ফিরে যাবো,
সেই লোকালয় জুড়ে শোনাবে বাংলার ইতিহাস।

নষ্ট ক্রীড়নক

সব নদীতে জাহাজ এসে ফেলে না নোঙর।
আমার দুই অদ্ভুত নদীর গভীরে কী এক দুদ্দার মাঝি,
সুদীর্ঘকাল ধরে নোঙর ফেলে আছে,
অন্য কোনো ঘাটে তার বৈঠার বাতাস লাগে না,
অপর জলের স্বাদ, শ্যাওলার স্পর্শ তাকে টেনে
নেয়নি তো কোনো কালে!
আমাকে ছুঁয়ে গীতলতার কী এমন মধুর দিনকাল কাটে,
তার কি স্বপ্নের বৈপরীত্য নেই?

সেই কবে থেকে বসন্ত পাখির মতো অসহ্যের খেয়া,
ঝড়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে
ন্যাংটো শিশুর মতো,
মাটির ওলান ঘেঁষে এখানে বেঁধেছে ঘর, ওরা
যা ইচ্ছে তা-ই তো করে!

কখনো থাবায়,
কখনো কীটের আদলে চুষে নেয় সতেজ বুক।
কৃত্রিম শস্যের মাঠ এই জ্বালাময়, নিরন্ন দেশের মাঝি,
আমার দুই অসহায় নদীর জলেতে
অনায়াসে ফেলে-যায় নির্মম বুটের খেলা।
বুদ্ধের হাঁটুর মতো আসন পেতে—নষ্ট ক্রীড়নক
ঝরায় বাতাবি জীবনের পাতা,
একটু একটু করে যায়।

হৃদয়হীন বালুচরে

কী এমন নিয়েছি তোমার উসুল করতে চাও,
প্রতিদিন নীরব শরীর, ছিন্নভিন্ন বুক—অবলুপ্ত গ্রাম
ক্ষয় হয়, ভাঙে—উজাড় করে চলে সকলি আমার!
আমি কি পাথর, যার দুঃখ পাওয়া নেই,
শেষ হওয়া নেই।

তবুও তুমি ভেতরে ঢুকে চুষে নিচ্ছো সব প্রেম।
কি এমন খেয়েছি তোমার কাঁদিয়ে মারতে চাও?
এভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কোথায় ঠেকাবে তরী,
কোন প্রান্তরে ঝুলিয়ে রাখবে এই দেহ,
তা তো বললে না হে কঠোর চাঁদের আলো।
কী এমন বসন্ত হারিয়ে ফেলেছো এই কালে!

যে তুমি আমাকেই,
শুধু আমাকেই নিয়ে যাবে হৃদয়হীন বালুচরে!

আমার প্রশ্নগুলো

আগুন নয় তবুও পোড়ে উজাড় করে বুক,
কাঁটাও নয় তবুও বিঁধে ঝাঁজরা করে মুখ!

এমনি রোগ আমাকে ঘিরে তোমার খেলা চলে,
থাবায় ভাঙে—তোমার হাতে কঠিন বাতি জ্বলে!

কেমন জাদু জানো যে তুমি জ্বালিয়ে দিচ্ছো ঘর,
এভাবে সব পালিয়ে যায়, বইছে দেহে ঝড়।

এমনি করে আঘাত হেনে মারছো কেন নারী,
আমার ঘাটে নোঙর করে কেবলই ভ্রষ্ট গাড়ি!

বিরোধী নই, তবুও তীর ছুড়ছো দিনে রাতে,
মারছো ঘরে মারছো পথে মরছি শূন্য ভাতে!

কেমন হলে তোমার কাছে সঠিক হবো আমি,
বলতে হবে পাষাণ কেন কাঁদাও দিবাযামি।

ক্ষতচিহ্ন

কিছু-কিছু রাত আছে যা কেবল কষ্ট দিতেই আসে,
এইসব শোষক রাত্রিতে হৃদয়ের মাঝে কারা যেন
হাতুড়ি পেটায়।
জলোচ্ছ্বাসের মতন ভাসিয়ে নেয় সমস্ত ভুবন,
ওরা আসে জল্লাদের ছুরি হাতে
ভাঙনের স্বপ্ন চোখে নিয়ে।
কখনো জ্বালায়
কখনো পুড়তে পুড়তে মানবিক স্থিরতা
লন্ডভন্ড করে দেয়,
যেন আমি এক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক যার লাঙল নেই,
ভূমিহীন মজদুর।
এইসব রাত আণবিক বোমা হয়,
পৃথিবীর শত্রু হয়—যুদ্ধক্ষেত্র হয়,
খুঁড়তে খুঁড়তে অন্তরের একদিক থেকে অন্যদিকে যায়,
যেনো আমাকে নিশ্চিহ্ন করা ওর কাজ!

কিছু-কিছু রাত আছে—ইতিহাসের পাতায় পাতায়
যার লেখা থাকে নাম,
এইসব রাত মোমের মতন হয়, মানুষ বিরোধী হয়!

রবীন্দ্রনাথ

পৃথিবীতে এত স্বর্ণলতা—কুসুমিত শিল্পের আনাগোনা,
প্রকৃতির সোহাগ নেচে নেচে সম্ভাব্য কোমলতা এসে ভিড় জমায়,
গাঙচিল উড়ে উড়ে বিকেলের জনপদ বিশুদ্ধ করে,
চৈত্রের খরতাপ ভেঙে উলঙ্গ বৃষ্টির জোয়ার মুগ্ধ করে
ঘাসফুল, তৃষ্ণার্ত পথ,
তবুও তোমর কাছে যেতে হয়।

অজানায় দুয়ার খোলে বেগবান নাবিক, কৃষকের লক্ষ্মী বউ,
পাপহীন শিশুর প্রাণ, দুলে দুলে অজান্তে
কেবলই তোমার কাছে যায়।

তোমার জাদুমাখা গীতির প্লাবনে অন্ধকার মুছে যায় নির্নিমেষ,
আমি হাঁটতে হাঁটতে এক পথিকের ঝোলায় দেখেছি—
গীতাঞ্জলি চুপিচুপি ছন্দের ঢেউ তোলে
আর অঙ্কুর বিছিয়ে রাখে।
একরাশ নদীর জলে কলতান বেড়ে ওঠে মাতম খেলায়।
সবুজ শস্যের কণায় স্বকীয় বীজ বোনার উৎসাহে
এখনও কি দারুণ প্রতীক্ষায় থাকে
শেষের কবিতা,
তোমার অন্তহীন প্রণয় এখনও ছুঁয়ে ফ্যালে মানুষের ভিটেমাটি,
এখনও বাউল নক্ষত্রের উজ্জ্বল চোখে-চোখে
সুন্দর ভুবন দেখি,
এখনও দেবতা প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ—মাঠের শালিকের সাথে
হৃদয়ের কথা বলে!

পৃথিবীতে এতো জীবন, এতো গভীর রঙের উদাস ছড়াছড়ি,
এতো আনন্দ জ্যোৎস্নার প্লাবন, তবুও
তোমার দুয়ারে যেতে হয়!
এতো হীরক, এতো ঝলমল ঘুমভাঙা রাতের ঠিকানা,
শিশিরের নীরব বাগান ফেলে সমস্ত দীর্ঘশ্বাস
বয়ে চলে তোমার প্রহরে।
আজন্ম সুখের বান হে লৌকিক মন্ত্রমুগ্ধ বাউল,

চুপচাপ বসে আছো অন্তরের সবটুকু ঘরে।
ভাটিয়ালি স্রোতে দখল করেছো লালনের উপত্যাকা,
কোমল নিশিতে দেখেছি তোমার সংগীতে ঈশ্বরের আগমন,
কেবলই টেনে নিয়ে যায় পাড়হীন সমুদ্রের কাছে।
যেতে যেতে সবাই তোমার কাছেই যায়, ধ্যানে উজ্জ্বলতায়,
বসে থাকে বারান্দার দেয়ালে-চত্বরে।

রবীন্দ্রনাথ, হে নিকেতন,
শিল্পভরা লতায় লতায় ভরে দিয়েছো তৃষ্ণার্ত আঙিনা,
অমর কারিগন, হে নায়ক রবীন্দ্রনাথ।
পৃথিবীতে এতো নিবিড় অনন্ত উল্লাস!
তবুও তোমার কাছে যেতে হয়!

ভাত ও রুটির জন্য

আমার ক্ষুধার যন্ত্রণাগুলো দিনদিন বাড়ছে,
আমার শান্তির সংখ্যাগুলো প্রতিদিন কমছে।
মানুষের প্রতিনিয়ত অনেক তন্ত্রমন্ত্র থাকে,
সন্তান-সংসার নিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে থাকে,
আমার তন্ত্রের পেছনে রয়েছে আমার দেশ,
আমার শান্তির চাহিদা আমার ভূমির জন্যে।

হৃদয় বারবার যে-ভালোবাসার জন্যে হাহাকার করে,
নিমগ্ন শালিকের মতো আমি যে ভোর হলেই ঘর থেকে
বের হয়ে যাই,
তা কেবল নিঃস্ব শিশুদের ভাত আর রুটির জন্যে।
প্রখর রোদের সাথে যুদ্ধ করে যে-শিল্পের স্রোতোধারা চাই
তাকে কেবল সুন্দর গৃহের জন্যে।
পৃথিবীতে আমি যে একটি গানের জন্মের কথা বলছি,
আমি যে প্রাণান্ত জীবনের প্রাণস্পর্শ চাই,
এই গান আর খাদ্যপ্রিয় বাণী
নবজন্মে একাকার হবে সবখানে।
আগামী বিশ্বে আমি যে বসন্ত ভিটায়
শান্তির বৃক্ষ রোপণ করতে চাই,
তার কথা বলতে বলতে জীবনের অর্ধেক সময় পার করে
দিলাম,
তার পরও কোনো ক্ষুধার্ত শ্রমিক আজও বললো না
আমার খাদ্যের অভাব নেই।
এর পরও কোনো শিশুকে বলতে শুনিনি
আমার দুধের সংকট নেই!

বারবার শুধু পিষণের কাহিনী শুনতে হয়,
মুখোমুখি হতে হয় মৃত্যু আর জ্বালাময় সংগমের সাথে।

তুমি সেই পলিমাটি

কবি আসাদ চৌধুরী'কে

জলের ভিতরে আরও অনেক জল থাকে,
মিশে যায় ওরা একই বৃক্ষের পাতাদের মতো
শিশুদের পাঠশালার মতো একই উচ্ছ্বাসে
বিলিয়ে দেয় হৃদয়,
তুমি বাতাসের ভূমিকায় কোনো-এক
সার্বজনীন ঈশ্বর।
গান গাইতে গাইতে,
ভালো বাসতে বাসতে
দাঁড়িয়ে রয়েছো লালনের দরোজায়।

জীবনে জীবন মিশে কতজন জীবন হারায়,
নদীতে নদী এসে একাকার হয়, হয়তো সমুদ্র হয়,
এভাবে নদী তার হারায় প্রাণ,
শস্যবন—পথঘাট ক্ষয়ে বালুকাময়—পলিমাটি জমে
তুমি সেই পলিমাটি,
যার ক্ষয়ে যাওয়া বড় শখ, নাওয়া-খাওয়া নেই,
দেয়াটাই অনেক অনেক সুখ।

দুটি হাত

দুটি হাত কী কঠিন বরফের মতো গলে গলে বিনাশ হয়,
দুটি হাত দেয়াল ঘড়িরবাটির আকারে ডান থেকে বামে, বাম থেকে
ডানে,
রঙিন ইশারা, স্পর্শের বারুদ ফেলে আপন পথ খুঁজে নেয়।
টা-টা দিয়ে লুকানো বনস্পতির গভীরে মিশে যায়
দুটি স্বার্থবাদী হাত!
যেন জলের স্রোতে ভেসে আসে ভেসে যায়,
ব্যথার দুয়ার ভেঙে নির্জীব উদ্যানের দিকে!

তার পেছন ফেরা নেই-সে কখনো ফেরে না!
খুব কাছে থেকে বোধের বাতি নিভিয়ে একাকী দুটি বোয়িং জলযান
এগোয় বনে,
আমাদের ভিটেমাটির প্রাণ নিঃসঙ্গ দুপুর করে,
এই এক সংক্রমিত ব্যাধি বয়সের চোখ ছিঁড়ে খায়,
দেবদারুদের বুক খালি করে ছায়াময় মুখ থেকে ভাষার শালীনতা
কাড়ে!

এই এক উথালপাতাল মেঘ যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়।

দুটি হাত নিরাময় সন্ধ্যাগুলোকে নির্বাসনে রেখে
হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়!
শস্যহীন বাল্বহীন দুটি হাত অগোছালো বিদায়ের বাণী টা-টা দিয়ে
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায় মৃত জলাশয়ে।

নীরব রবো কেন

আমি শসস্ত্র হবো না কেন, যখন দেখছি
আত্মার ভেতরে বিষপিঁপড়ের দল, উঠোনে খেলায়
নিষিদ্ধ বাজপাখির পোকা।
এই তাতানো ছোবল দেখে
আমি কি পারি অস্বস্তির নিনাদে চুপচাপ
নীরবে কাটিয়ে যেতে কাল!
আমি কি পারি বিষণ্ন বাতাসে নিজেকে তলিয়ে দিতে!

মানুষের স্বপ্নময় আলোর ভেতরে আরও অনেক স্বপ্ন ছিলো,
চিত্রকর এঁকেছিল এক সমুদ্র-দেয়াল, এঁকেছিলো
আজন্ম সুখের প্রহরে নির্মল গাছ।
প্রতি ভোর হলে একদিন এখানে ফুটতো লাবণ্যধারায়
ছন্দময় ফুল,
ধ্যানমগ্ন আকাশের ঘুম ভেঙে যেতো,
তার সৌরভের শোভনলতায়
কৃষকী শরীর ছুঁয়ে বয়ে যেতো বাসন্তী হাওয়া,
আজ কিসের প্লাবনে তার শিকড়ে পড়েছে টান!

এই উপত্যকা কি কিশোরের বেড়ে ওঠা আস্তানা নয়,
এটা কি তোমার আমার কৈশোরের ধূলিমাখা চাঁদ—
পিতামহদের রক্তের শস্যভূমি নয়,
যদি তা-ই হয়, নীরব রবো কেন!

এ কেমন কাঁটা

মৃত্যু একজন মানুষের কতোবার হয়! তুমি
মনের উল্লাসে বারবার চালিয়ে যাচ্ছো শাবল।
যেন আমি এক মাটির পুতুল, দুঃখবোধ নেই!
আমি কি পাথর, না রক্তমাংসহীন কাঠখড়,
আমার কি বেঁচে থাকা নেই! কেন এই অগ্নিকাঁটা!
কেন অচেনার রোগ তুমি নিশিদিন তপ্ত বাণে
অসহ্যের বিষ ঢেলে জ্বালিয়ে মারছো এই বুক!

এভাবে আমি ও আমার পথ হলো কঠিন মেঘ,
তা হলে আমার জীবন—শুধুই পুড়ে পুড়ে যাবে!
এ কেমন তুচ্ছ প্রেম বেদনায় কেটে যায় কাল!

কতো আর জল আছে বলো এই বৃদ্ধ দুই চোখে,
নীরবে-নিভৃতে ঝরে গেছে সব দুঃখ দিয়েছো বলে।
যেন ছাই, প্রতিপাদ্যহীন—মূল্যহীন পড়ে থাকা।
আমার সম্মুখে আজ এ কোন জল্লাদ, উঁচু হাত
টেনে নিয়ে যায় বিষবৃক্ষ, শূন্য সমুদ্রঅতলে
নিয়ে যায় আদিঅন্ত মৃত্যুর প্রহরে, পাহাড়ের
জমাট সম্পন্ন যেন নোনার বাঁধনে দুপা চলে—
আমি সেই আঁধারের হাসি থেকে মুক্ত হতে চাই!

অপেক্ষা

দেখিস সূর্য ডুবে যাবে, তবুও আমি ঘন অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে
ক্লান্ত শ্রমিকের মতো তোর জন্যে অপেক্ষা করে যাবো, ঘাম
মুছতে মুছতে,
তোর আসার কথা ভেবে যোজন যোজন কাল নিভৃত অরণ্যে
আঙরার তাপদগ্ধ ক্ষয়,
সয়ে সয়ে যাবো—
কোনো-এক পাষাণ সন্ধ্যায়!
আমি এই পথেই গেয়ে যাবো বিষাদিত গান—অনাদিকাল!

হেঁটে হেঁটে আর কতখানি পৃথিবী পার হওয়া যায়,
তাড়িত বৃষ্টির মতো মিশে গেছি তুচ্ছ জলরাশির বানে।
কষ্টের সমুদ্র—তার ক্রন্দনে কেবলই অসীম হয় ঋণ,
ঝরে পড়ে অকাল শহর, সস্তা গ্রাম,
বাজারের অল্পদামের সেতার।

একদিন আমিও রোদের গ্লানি হবো, সূর্যের যাতনা হবো,
শেষ হতে হতে শীতলতায় বরফ হবো।
দেখিস একদিন আমিও বিরাগবোঝাই নৌকো কিংবা
বেদনার্ত বিকেল হবো, সেদিন কোথায় রাখবে শরীর,
সেদিন কীভাবে ফেরাবে হাসন রাজার গান,
কিভাবে অধীর হবে লালন ফকিরের সাবলীল চোখ!

খেয়ে যেতে থাক! ক্ষয়ী মানুষ তুই কাঁদাতে থাক
সাজানো আকাশ,
আমি কিছুতেই ফিরে যাবো না মায়ের বুকে
হাহাকারময় গ্লানি নিয়ে।
জানিস পোড়া বারুদের মহিমা থেকেও কখনো কখনো
বিপন্ন শিশুরা জেগে ওঠে,

দেখিস রাতের পর দিন এমনি অনেক যাবে,
তবুও আমি তোর জন্যে
তোর আসার কথা ভেবে—পৃথিবীর একদিক থেকে
অন্য একদিকে
চষে বেড়াবো বাউল পথে পথে।
হয়তো সবাই যার যার দিগন্তে—গৃহের দিকে
চলে যাবে.
সেদিন আমিই হবো আমার বাহক,
আমিই হবো আমার প্রকৃত চালক।
তবুও এ-পথেই রয়ে যাবো আমি—যোজন যোজন কাল।

ক্ষত

ফিরোজ চল আমরা গ্রামে ফিরে যাই।
দেখছিস না শহরে কত ঘনঘন জানাজা হয়,
তাজুলের মতো স্বর্ণময় জীবনেরা খসে খসে পড়ে,
দেশের গভীর চাঁদমুখগুলো শহীদি লতায় কী রকম
আত্মা হারিয়ে দেয়!
কী লাভ এখানে থেকে,
দেখছিস না আদমজির ঘাসে সবুজের রাত
বিফলে কাঁটার সুর বোনে!
এখানে হামেশাই হৃদয়ের বদলে নির্জীব উপখ্যান
রচনা করা হয়,
নিশ্বাসে খরার দ্যোতনা,
পকেটে রাশি রাশি কঠোর হরিণের থাবা, ক্রমশ
বাউল মেঘে ঢাকে সময়।
তুই-আমি তো শুধু প্রতিবাদমুখর থেকে বারবার
মালতী ফসল চাইছি,
আমাদের চিৎকার কেউ একবারও শুনলো না,
শ্রমিকের কথাগুলো কোনোদিন কেউ শুনলো না,
কী লাভ ক্ষয়ে ক্ষয়ে সমকাল উদাস পাহাড় গড়া।
দেখছিস না কোথাও কোনো শুভ সংবাদ নেই!
পত্রিকার পাতা তোর আমার পিষণের চিত্র গ্রহণ করে না,
তোকে গ্রহণ করে না,
আমাকে গ্রহণ করে না, পাথুরে রংচংমাখা নকল নগরী।
চল আমরা গ্রামের দিকে যাই,
পিতামহের ভিটা কীভাবে ডাকছে আমায়,
তোকে কারা কৃষকের ভিড়ে ধরে রাখতে চায়,
এসব বুঝিস না কেন!
তুই বিমুখী পাথর হয়েছিস কেন!
এসব ব্যাগসর্বস্ব সংসার রেখে তোর কি
কোমল শরতের প্রয়োজন নেই।
তুই একটু প্রকৃত মানুষ হয়ে যা,
বিরহের বাগান ফেলে এই নিষ্প্রভকালে—
চল আমরা গ্রামে ফিরে যাই।

হাততালি

আপনারা তো জীবনে কতই হাততালি দিলেন।
ছোট বড়ো, তুমুল মাঝারি, অল্পক্ষণ-দীর্ঘক্ষণ,
এমন কি কোথাও কোথাও ঘণ্টার পর প্রহর
তাল বেতালের—
ভালো-মন্দ, তাজা-রোগা,
অনেক সময় বলবান পুরুষ হাবাগোবা সেজে,
সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার মিছিলে,
দুই হাত নেড়ে নেড়ে তালিয়া বাজায়।
এইসব তুড়ি দেয়া মানে বিজয়উল্লাস নয়,
এইসব তুড়ি মানে জীবনের পাতায় পাতায়
কষ্টের দলিল লেখা।
আমার হৃদয়ে আমি,
আপনার বুকে আপনিই দেখে-শুনে গড়ে তুলি খাদ।

হাত থাকলেই তুড়ি দেয়া যায়,
সব হাত-হাত নয়, কিছু-কিছু হাত বুলেটের মতো
সমাজের বুকে নষ্ট করে দেয় বাঁচার সাহস।
ওইসব হাত সাপের ছানার মতো উৎপাদন করে তুড়ি,
আসলে এসব তুড়ি নয়।

কেউ দেয় পতাকার জন্যে,
কেউ-কেউ টাকার জন্যে, খুনি দেয় রক্তের প্রয়োজনে।
প্রতারক, ঠকবাজি, দেশদ্রোহী প্রতারণার তালি বাজিয়ে
চুষে নেয় শ্রমিকের প্রাণ।
তুড়ি তো শোষক বেজন্মার জন্যে নয়,
কিংবা কাঠের পুতুল নিয়ে খেলাখেলি নয়।
হাততালি মানে চাঁদের আলোতে শুদ্ধ ফল ঘরে তুলে নেয়া,
যেনো কিশোরীর পাপহীন ঘুঙুরের শব্দ অবিরাম কানে এসে বাজে।

আবার সন্ত্রাস

আজকাল নিজের ছায়াকেও অনেকটা ঘাতক মনে হয়,
খুব প্রিয় যে-মানুষ তাকেও আমি বিশ্বাস করতে
পারি না, কেননা
বুক জুড়ে থাকা কঠোর দহনের দুঃশাসনে আমরা কেবলই
ভেঙে যাচ্ছি-পুড়ে যাচ্ছে স্বাভাবিক জীবনের পাতা।
যে-নদীকে অন্তরের অবিচ্ছিন্ন আলো—
নাগরিক বেড়ে ওঠার হাতিয়ার ভাবতাম,
আমরা যাকে জীর্ণ কুটিরের সৈনিক, যোগ্যতম খুঁটি
ভেবে যাই,
আজকাল সে-নদীর জল আত্মহননে খুব স্বাদ পায়।
সেই লালিত সূর্যের আলো থেকে আজ জন্ম নেয়,
স্ববিরোধী শাসন।
তা হলে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে এ দেশের মানুষ!
নিজের মনকে আমি আজকাল বিশ্বাস করতে পারি না,
আমাকেই আমি খুব দূরান্তে হারিয়ে ফেলেছি,
যে পথে দিনরাত হাঁটি,
যে-থালায় খাদ্য খাই, যে-জানালা দিয়ে
বাহিরে জগৎটাকে দেখি,
আসলে এইসব ভুল বাগানের চাষাবাদ।

প্রকৃত সকালের জন্য আমাদের রক্ত দেয়া আজ মিছে,
মা'র মুখে অন্ন দেয়ার স্বপ্ন আজ জ্বলজ্বলে দাহ,
আমরা আমাদের মাটির মায়া থেকে দিনদিন
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি,
একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে যাচ্ছি অজানায়,
শত্রুর মতো রেগে-মেগে যাই পিষণের তালেতালে!

মনে হয় আমরা এদেশের সন্তান নই,
মনে হয় কোনো এক বানে ভেসে-আসা অতিথি ঝড়,
তা না হলে এরকম হবে কেন?
এইসব করুণার মেঘ কেন ছেয়ে যাবে সবার দুয়ারে?

আজকাল আমাকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না,
কখন কি করে ফেলি তার ঠিকঠাক নেই, কারণ
আমার মাথা জুড়ে এক অমানবিক পাথর চেপে আছে,
এ-পাপ তাড়ানোর জন্যেই,
আমি কখন কোন আত্মাকে ছোবল দিই,
তার ঠিকঠাক নেই!

একজন ভাষা-সৈনিকের মা

একজন বৃদ্ধা গতকাল আমায় বলেছিলো, আমি যেন
এই তাতানো বসন্তের প্রহরে তার সন্তানের কথা বলি।
আমি যেন এই ফেব্রুয়ারির শোকের স্তূপে, স্মৃতির মাঠে—
তাঁর হারানো সন্তানের নামে কিছু-একটা বলি,
আমি যেন সেই ভাষা-সৈনিকের নামে পত্রিকার পাতায়,
মিছিলে-স্লোগানে শিশুদের পাঠ্যপুস্তক,
শিশিরঘেরা বাংলার প্রান্তরে
জানিয়ে দিই অমরতার কথা।
যেন বলে দিই মানবিক সংগ্রামের কথা!

সেই বৃদ্ধা আমাকে বলেছিলো—আমি যেন তাঁর
সন্তানের জন্য,
আমাদের স্বপ্নময় ভবিষ্যতের জন্যে
আমি যেন উদার হই।
তাঁর সন্তানের মতো ত্যাগী হই, দেশমাতৃকার হই।
সে বলেছিলো, এই ঘোর কালো সমনে-উন্মাদনায়, সমূহ
বিনাশের কালে,

আমি যেন তার সন্তানের প্রতি
কুকুরের কামড়বেষ্টিত শহীদ মিনারের প্রতি,
উদার হই, আমরা যেন সজীব হই প্রণয়ের প্রতি।

পরিপূর্ণ সকালের জন্য

শুধু সরে সরে যাই কাঁটা ও বিষাদে ছোঁয়া বেলায়,
আজন্ম সকাল এই রোগ, যার দাহ পুড়ে মারে
প্রিয় গ্রাম মানুষের প্রাণ, অদ্ভুত এই এক সাপ!
প্রতিদিন কিছু-কিছু করে ক্ষয় হয় মাথার মগজ,
মাটির সিনা থেকে উড়ে যায় কঠিন জীবনের ভাত।
নিরন্ন কাল নিয়ে শুয়ে আছি বুকে পুষে জ্বালা,
আর কতোটুকু যাবো ক্ষয়ে! কতোবার নিঃস্ব হবো!

দুটো চোখ কেড়ে নেয় বিষমাখা বান, অরণ্যের হাত,
তুমি নিরাকার হয়ে যাও কাতর আঁধার থেকে।
হৃদয়ের সুতো ছিঁড়ে সুখ নিয়ে এসো জীর্ণ দেশে।
তোমাকেই হতে হবে প্রেয়সীর শুভ্র রাঙা ঠোঁট,
ঝলমল দুপুরের বাঁশি—তুমি অন্য এক নাম।

সেই ভুলে-থাকা গান তুমি আর একবার গাও,
হে প্রলয় সাঁকো, আমাদের শৈশবের ভিটেমাটি।

কতোকাল মিছেমিছি শূন্য হাল ধরে বসে থাকা,
কতোদিন বাউলের মতো বনবাস, জীবনযাপন!
কতোরাত দেখে যাবো শস্যহীন ছবি, না-খাওয়া
জনতার সারি সারি লাশ, কীভাবে গ্রহণ করা যায়!
এ তো লাশ, এতো গুম, হাহাকার নিয়ে কতো যুগ
কেঁদে কেঁদে যাবো, যেনো খুঁটে খুঁটে খায় নম্র চাঁদ।

তোমাকেই দিতে হবে ফসলের উজ্জীবিত ভূমি,
এইভাবে শেষ হওয়া নয়, করুণায় চোখ খুলে
চেয়ে চেয়ে থাকা নয়, উজাড় স্বদেশ দেখে দেখে,
হে লালিত বৃক্ষের বাগান, এখানে প্রস্ফুটিত
করে যাও বেঁচে থাকার সাহস-নির্ণয়ের গান!

পতনহীন শব্দ ও আবুল হাসান

গোলাপ কেবলই বাগানের কাছে ঋণ শোধ করতেই ফোটে!
ধূপের জীবন আর ফুলের ক্রন্দনে একই মিছিলের ভাষা,
                                        এসব জেনেও
তুমি বিষের থলেতে বারবার খুঁজেছো অপরূপ দৃশ্যের ছবি।
গণিকার হাহাকারে কান পেতে শুনেছো মানবিক যুদ্ধের ছায়া।
হৃদয়ের নষ্ট দীনতার ঘাতক বর্শাই তোমাকে বিদ্ধ করেছে কালে,
হৃদয়ের বোতাম খুলে ঢুকেছিলো ক্ষুধার্ত জলসার বাঘ,
শিশুর দুধ খাওয়ার মতো গিয়েছিলো সবটুকু আবুল হাসান—
এইভাবে কবিতা, এইভাবে শস্যের মাঠ, দেশের প্রগতি,
শ্রমিকের ভাত,
রাজনীতি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের আদিঅন্ত সূর্যের ঠিকানা।
এইভাবে পাবলো নেরুদা, জীবনানন্দের প্রেমীয় সন্তান।
ওদের হাতেই
তছনছ হয়ে যায়, লন্ডভন্ড করে ফ্যালে
                ওরা অনেক কিছুই পারে।

অন্ধকার ঘরে এসে দেবদূত বাজিয়ে গেছে অমর কবিতার বাঁশি,
মুকুটহীন রাজার সাম্রাজ্য জুড়ে পড়ে আছে পৃথক পালঙ্কের বীজ,
মাটির সংগমে একদিন তা থেকে বের হয়ে আসবে পবিত্র তুলি।
নক্ষত্রের মতো সারাটা আকাশ ভরে দিনরাত জ্বলবে অভিমানী আলো।
তুমি হয়তো দেখবে না,
তুমি শুনবে না, তবুও তোমার কাছে ছুটে যাবে বেপরোয়া সুর।
রহস্যময় সেই অলংকৃত বাণী তোমাকে শিল্পের খবরাখবর দেবে,
করাঘাত করবে প্রতিদিন নীল দরোজা দিয়ে শান্তির দোয়েল।
তখন কোথায় লুকোবে তুমি? কোন ঘাটে নোঙর করবে বলো?

কবিতা : ১৯৮৪

পা বাড়ালেই মৃত্যু, ক্ষুধা, কান্না হাহাকার,
লাখ মানুষের চিৎকার ভাত চাই ভাত চাই—
এই রোগ সব জায়গাতেই।
নেই, একদম সুখ নেই!
খাওয়াদাওয়া, হাঁটা-বসায়, কাজে রাজনীতিতে
আজকাল কোনো-কিছুতেই নেই,
একটুকুও সুখ নেই!

কোথায় গেলো তিন বেলা পেট ভরে ভাত খাওয়া,
বাঙালি ভুলেছে স্বদেশী গান গাওয়া,
আজও আছে পিড়নের পিঠে
দাসত্বের ঘানি টানাতেই,
নেই, কোনোখানেই সুখ নেই!

বড় বড় ফাও-ফতুর কথা বলাবলি হয়,
দেশ গড়ার বেলায় কোনো শালার বেটাই নয়,
মজুর পায় না প্রকৃত দাম শ্রমের বিনিময়ে,
স্বাধীনতা যাচ্ছে যত্নের অভাবে কেবলই ক্ষয়ে ক্ষয়ে!
এতোদিন যারা আশা দিয়েছিলো—সবই বাড়াবাড়ি,
বুঝেছি তোমাদের সে সব কথা শুধুই জারিজুরি!
এক যুগ আগে যেখানে ছিলাম, আজও আছি সেখানেই
নেই, একদম সুখ নেই!

এখানে কেবলই দুঃখে দুঃখে পঞ্জিকার পাতা উলটে যায়,
যার হাতে যায় গুদামের চাবি সে-ই বেশি বেশি করে খায়!
এখানে শান্তির নাম হয়েছে তিলেতিলে শেষ হয়ে যাওয়া!
সব রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকেই কষ্ট উপহার পাওয়া!

পা বাড়ালেই বাধা, উপহাস, গ্লানিময় চিত্রমাখা শব্দ,
কেউ বুঝলো না, কেন বারবার আমরা হয়ে যাচ্ছি জব্দ,
এই বেদনা-ক্লান্তি-জড়তা সব ঋতুতেই,
নেই, প্রিয় মাতৃভূমিতে আজ একদম সুখ নেই!

নিগুতি বেলার ছবি

কী এমন আঘাত সয়েছো এই কম্পিত বুকের জমিনে,
স্বপ্নের ঘর, সোনার সংসার ফেলে পালিয়েছো দূর
বহুদূর অতল গহনে!
কী এমন পুতুল খেলা ভেঙে গেছে তোমার সাজানো ফুলদানি থেকে,
আমি এর কিছুই বুঝতে পরি না!

আজ বড়ো উপদ্রুত মনে হয় আমাকে,
সব কাজের পেছনে তোমার বিশ্বাসগুলো যেন মরা শকুন হয়ে
পড়ে থাকে নির্বিকার,
আমি কিসের আস্তরে কেঁপে উঠি,
আমার চোখদুটি কেঁপে ওঠে কোনো কবিতার জলসায়।

শুধু ফাঁকা শহরের ঢেউ নিয়ে ছুটে যাই শূন্য কুটিরে,
কী দুঃসহ বেদনা আজ আমার হৃদয় ছেয়ে গেছে ওয়াহিদ রেজা—
স্বপ্নহননের মতো স্বদেশ উড়ে যাচ্ছে তোমার ঠিকানায়,
তোমার জন্যে আজ এশিয়ার ঘুম নেই!
ঢাকার বালুচর শুয়ে আছে উদোম বালিশের মতো,
আমার পকেটে দীর্ঘ নিদ্রা যায়
জ্বলজ্বলে সিগারেটের প্যাকেটে,
এ কেমন শোকাহত সময়! মনে হয় সূর্যোদয় বন্ধ হয়ে গেছে।
মনে হয় পৃথিবীতে শুধু অন্ধকার—নির্লজ্জ অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে!

তোমার কি মনে পড়ে মেহগনি পথে হাঁটাহাঁটি,
কিংবা সিরাজদ্দৌল্লা রোডে বসে বসে নিজের লেখা গান গেয়ে যাওয়া,
হয়তো বা বোসের কেবিনে আফিম-মেশানো চায়ে চুমো রাখা।
মায়ের রং-করা পাঞ্জাবি পরে অদ্ভুত চলাফেরা,
মনে কি পড়ে না স্টার সিগারেট টেনে টেনে কবিতা লেখা!
এসব ফেলে তুমি কেন নির্বাসিত হলে,
ঘাসের মমতা—তকতকে পাণ্ডুলিপি—খয়েরি নগর,
প্রণয়ের কিশোর উদ্যান রেখে তুমি কেন
দুষ্প্রাপ্য চাঁদ 'মনুকে' হারাতে গেলে।
কেন গেলে একাত্তরের গ্রামগুলোর মতো কাঁদাতে এই দেশ!

জানি খুব একাকিত্বে আছো নন্দিত স্পর্শের বারুদ ফেলে,
অভিমান তোমাকে দুঃখ দিয়েছে ঢেলে,
কেড়ে নিয়েছে নির্মল সময়ের ঘর ।

আর আমি,
দেয়ালে পিঠ, ভাঙা জানালায় থুবড়ো ভেজা চোখ মেলে
দেখছি তোমার শূন্যতা,
মন ভরে দেখছি তোমার প্রবাসজীবনের অসারতা ।
এই এক কারাগার যেখানে তুমি আছো,
এর কী এমন প্রয়োজন ছিলো—হে বন্ধু আমার!

মেজো ভাই

মেজো ভাই তোর বেঁচে থাকা আমার খুব প্রয়োজন ছিলো,
দেখছিস না, দেড় যুগ গেল ক্ষুধা আর যন্ত্রণার
লাঙল টেনে টেনে।
আমার লাশ আমিই বহন করে চলেছি শোষিত মাটির কোলে।
আমার ভোর হয় প্রতিদিন কতগুলো কষ্টের সূচি নিয়ে,
বেদনার আগুন নিয়ে সারাদিন কোথায় যাই,
খাই বা না-খাই,
এ খবর রাখে না কেউ।
মেজো ভাই, এই পৃথিবী আমাকে একটুও গ্রহণ করে না!

তোর মনে নেই, মেজো ভাই, তোর কি মনে পড়ে না আমার
ইস্কুলে যাবার কথা,
একটা আদর্শলিপি, দুআনা দামের খাতা কিনে তুইই তো
আমাকে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলি।
বাবার মৃত্যুর পর তুই মা, বড় ভাই আর খুশি আপা
তোরাই তো আমাকে বড় করেছিলি,
মেজো ভাই তোর আদর্শলিপির মতো আমাকে আর-এক
জীবন এনে দে।
আমি যেন তোকে স্মরণ রাখতে পারি,
তোর খাতা কেনার ঋণ শোধ করতে পারি,
সেরকম উদারতা, সাহস এনে দে।

মেজো ভাই তোর কি মনে নেই—
তুই আমি একদিন বন্ধু হয়েছিলাম, একসাথে গান গেয়েছিলাম,
সে কথা আজ আমাকে বারবার ভাবিয়ে তুলছে,
এতোকাল পর তোকে আবার 'একমাত্র মানুষ' মনে পড়ছে!
তুই থাকলে আমাকে আজ এতোটা সঙ্গীহীন মনে হতো না,
ক্ষুধার সাথে যুদ্ধ করে—শহরের বুকে বাউলের মতো হাঁটতে হতো না।
মেজো ভাই তুই নেই, একথা আমাকে প্রত্যহ গুলিবিদ্ধ করে
শ্মশানের দিকে টেনে নিয়ে যায়,
তোর বেঁচে থাকা প্রয়োজন ছিল—আমার খুব প্রয়োজন ছিলো!

আমার ভেতরে

তোমাকে হারাবার দাহ জ্ব'লে-জ্ব'লে ওঠে এই শূন্যতার ঘরে।
বোবা উৎসব হয়ে কাঁদে শহর মাটি গ্রাম বৃক্ষের সবুজলতা,
ঘুমন্ত রাত জেগে ওঠে দুঃখী কোকিলের মতো অভিনব বিষাদে,
তুমি নেই ব'লে বাতাস থেমে যায়, থেমে যেতে থাকে
সকল কণ্ঠস্বর।

তোমাকে হারাবার স্মৃতি ভেসে-ভেসে ওঠে এই জ্যোৎস্নায়।
শ্রাবণের কোল ঘেঁষে অশুভ পাথর শিকড় গেড়ে বসে
রাত আর দিন।

উদ্বেলিত বায়ুর মতো শেষ করে যায় গোছালো
সংসারের নাভি।
চোখের কোটায় হাসে মৃদুভাব প্রদীপের জ্বালা-পোড়া
পালটে যায় গভীর বিশ্বাসের আশা,
এভাবে সব শিল্পসম্ভার ধসে যেতে থাকে এক-এক ক'রে।

তুমি নেই, অথচ তোমার কথাই মনে পড়ে আজ আমার,
নিঃশব্দে জাগরিত হয় ভেতরে পলাতক সময়ের কথোপকথন,
নির্দোষ বালির মতো নক্ষত্র হাসে বিগত উপস্থিতির মাঝে।
সুরহীন কাক ডেকে ওঠে ভোরের কুয়াশায়,
বন থেকে পাহাড় গড়ায় তৃষ্ণা।

রুদ্র ছায়ার কাছে, ভাসমান ঋতু বদলে যায় ঝরনার মতো।
আমি স্থির দাঁড়িয়ে থাকি বন্দি কয়েদির বেশে,
এ-যেন দুঃখের সমুদ্র, কষ্ট হয় বড় কষ্ট হয় আমার।

বেদনার পঙ্ক্তিমালা

তোমাকে ভালোবাসি বলে সবখানে আজ বিরোধী বাতাস বহে,
বসন্ত আসে না কোনো দেশে,
কোনোকিছুতেই আগের মতোন শিহরন নেই!

তোমাকে ভালোবাসি বলে ভুবন ছেয়ে গেছে ঘন
মেঘের আস্তানায়,
সরিষাক্ষেতের বুকে হানা দিয়েছে নির্মম রৌদ্রের ছায়া।
উবুথুবু শিশিরের দল বদ্ধাহত পথে পথে
জলাঙ্গীর টানাটানি!

তোমাকে ভালোবাসি বলে আমার সকল স্বপ্নে ও কাজে
অশৈশব দিবস ঘিরে,
হতাশার তোরণ ফেলেছে নোঙর।
বেদনার পুঁথি-হাতে বাউল—সন্ন্যাস ছেড়ে গেছে তার ঘর!

তোমাকে ভালোবাসি বলে অন্ধকার এসে হানা দেয়
বিশুদ্ধ আঙিনা জুড়ে।
লৌকিক জীবনে কেবলি হারায় স্বপ্নময়-উজ্জ্বলতার কাল,
হঠাৎ রাত্রিতে জেগে দেখি কে যেনো নিয়ে গেছে সব
বিগত কালের প্রেম,
শিল্পের উদ্যান থেকে চুরি হয়ে গেছে প্রখর চিত্রমালা।

তোমাকে ভালোবাসি বলে শহর-গ্রাম-লোকালয়ে
মিশে আছে সুখহীন বাতাসের ধ্বনি,
লোনায় ধরেছে সাজানো ভুবন সমুদ্রসংগমে,
গলিতে-পাড়ায় সমাজ সংসার ঘিরে নেমেছে অযুত মিছিল,
নদীতে মানুষে বেড়ে গেছে গভীর ব্যবধান,
আদিম বৃষ্টির বর্ষণে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে বাসযোগ্য ভূমি
এতো বিনাশের ঢেউ শুধু শূন্যতায় ভরে তোলে বুক!

তোমাকে ভালোবাসি বলে আকাশের সমস্ত তারা
রেগে মেগে গিয়েছে নিভে,
চাঁদের শরীর থেকে উধাও হয়ে গেছে আলোর ভাণ্ডার,
এতোসব হারিয়ে কী করে পারি
এই কঠিনের দহনে—তলিয়ে যেতে!

থাকা না-থাকার কথা

মৃত্যুর পরও বলবো আমি তোমার ছিলাম, যেভাবে
মাটির সাথে জলের অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা থাকে,
বায়ুর সাথে মানুষ,
নদীর সাথে সাগর,
আমিও তোমার কাছে এরকম অমর কথামালা রেখে
একদিন চোখের আড়াল হয়ে যাবো।
বৃক্ষের ভেতরে ফলবান চারা রোপণ করে,
অমৃত পুরুষ এ-সত্যকে আমি প্রকাশ করে যাবো।

তোমার প্রতিটি দুঃখের সাথে আমারও দুঃখ আছে,
সমস্ত সুখের উৎসবে আমারও সুখবোধ আছে,
যেন আমার বাগানে ফুটে আছে এক নির্ঝরে গোলাপ
সেই ফুল তুমি!
যেন তোমার খোঁপার চুলের অন্তরে এক পূর্ণ চাঁদ
সে তো আমি!
এই মায়াময় বন্ধন-পৃথিবী জুড়ে থাকা সুরভিত সাঁকো,
তুমি ভেঙে চুরমার করে দিতে পারো,
আমি তো পারি না বিষাদের ঢেউ নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে।

একদিন সবকিছু ফেলে আমারও চলে যেতে হবে,
শুধু চলে যাওয়াই নয়,
মৃত্যুর পরও আমি তোমার সাথেই আছি।
মৃত্যুর পরও বলে যাবো আমি তোমার ছিলাম,
যেভাবে শহীদমিনারের অস্তিত্ব জুড়ে থাকে অনেক নাম।

কষ্টের নৌকা

বুকের জমিনে যে-কৃষক একদিন ফসলের বীজ বুনেছিলো,
তার সেই স্মৃতির সাহস থেকে আজও একমুঠো ভাত,
বাঁচার প্রত্যাশা, তৃষ্ণার জলধি
কিংবা ক্ষুধার্ত শিশুদের জন্যে কোনো আলো ফুটলো না।
আজো সেই গ্রাম্য মা তার সন্তানের জন্যে,
বাগানের ফুলগুলোর জন্যে, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা—
সোনালি পতাকার জন্যে,
অধীর আগ্রহে দুই হাত তুলে মোনাজাতে থাকে।
গুলিবিদ্ধ পঙ্গু যুবক হুইলচেয়ারে বসে পুবদিকে
সূর্য উদয়ের দৃশ্য দেখে।
সে কেবলই প্রতিদিন বিরহের বাঁশি বাজতে শোনে,
অনাহারী বোনের হাহাকার শোনে,
পথের কিনারে, মোড়ে মোড়ে জনতার লাশ দ্যাখে,
শুধু দ্যাখে না সান্ত্বনার চিত্রকলা,
দ্যাখোনা তোমার উজ্জ্বলতা,
আমার ঘরে ফেরার কোনো পথ।

এতোকাল পরও কোনো অদম্য বাউলের হাত এসে
শরীরের তপ্ত ঘাম মুছে দিলো না, অরণ্য সাগর থেকে
তুলে নিলো না—দশ কোটি ম্রিয়মাণ প্রাণ,
শুধু ভাঙনের নদীতে তুমি আমি বেয়ে চলেছি কষ্টের নাও।

চিঠি

তবুও চিঠি আসে, তাজা খাম নীল খাম ভরে বিষাদের খবর আসে।
নিরন্ন স্বপ্নের মাঝে ভাড়াটে যান অনেক দহন নিয়ে আসে,
তবুও অবাক চিঠি আসে।

যে-নদী মিনতি রাখে গাঢ় সবুজের উন্মত্ততা ঢেলে,
বাবলা বন, ঘর্মাক্ত সকাল—ঝিমানো সাগরে মেশে
যে-কনকলতা ঝরায় প্রার্থনার বীজ।
আমি অসহায় কবি, কাকের কান্নার মতো নিশিদিন
ডেকেছি একজন পাষাণ রমনীর ছায়া।
সে শুধু মরুভূমির ছাই, তপ্ত তরঙ্গভরা গীতে রেখে যাচ্ছে
মানুষবিরোধী সংলাপ,
মানচিত্রের প্রাণ ভরে-সে শুধু ছিটায় রক্তাক্ত পঙ্‌ক্তিমালা!

কতোদিন এখানে আসেনি শ্রাবণের সতেজ আমেজ।
ঘরের চৌকাঠ থেকে ফিরে যায় শুদ্ধ বনের কোকিল,
আদিম রোগ নিয়ে আমি কীভাবে নিশ্চিহ্ন হই,
অসহ্য মাছির স্রোতে—গা-ছেঁড়া গুলির শব্দ,
তুচ্ছ গাড়ির সাইরেন আমাকে কোথায় নিয়ে যায়!

এখন সবখানেই বেআব্রু চিঠির মর্মরে বেদনা।
সব কিছুতেই একজন জল্লাদ রমণীর দাড়টানা স্বভাব,
কেবল আসে না—শোভিত মেঘের সাড়া
অন্যন্য সৌন্দর্য বাণী!

তবুও চিঠি আসছে,
তবুও দেখি শূন্য কবিতার হলুদ ঘষামাজা,
জীবনের পাতায় লম্পট ঘোড়ার হর্ষধ্বনি লাফায়—
কে যেন আমায় পিছনের দিকে নিয়ে যায়,
গৃহহীন করে প্রতিদিন!

আমার ঠিকানায় শুধু ছুটে আসে অমাবস্যার তুঁত,
আসে ত্রাহি—ঘামঝড়া পদভার, একটি ঘাতক খাম
একটি জ্বলন্ত চিঠি—

সরকারি পিয়নের ব্যাগের মধ্যিখানে ওম দিতে দিতে
কালিমার দ্রুতযান পার হয়ে আসে
নর্দমার দলিল নিয়ে।
তার সত্তায় দুদ্দাড় লেগে থাকে কঠোর বেজন্মা স্বাদ,
অলৌকিক চাবি,
তালা খুললেই গুচ্ছ দোযখের আগুন
চুরি করে নেবে শ্রমিকের বুক।
এই ঝড় আমার ঠিকানায় বারবারই আসে।

তবুও চিঠি আসে, তাজা খাম নীল খাম ভরে
প্রতিদিন নিয়ে আসে অবাক-করা কথা,
এইসব বাণী আমাকে সযত্নে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

কোনো-এক সূর্যের সন্ধানে

যে-পথে তোমার পদচিহ্ন পাবো, আমি সেই পথ ধরে
জীবনের শেষ বিকেলেও হেঁটে হেঁটে যাবো ।
তোমাকে পাওয়ার জন্যে প্রথম সূর্যোদয় থেকে
কুয়াশা ভেঙে অন্ধকার নদী বেয়ে,

বন-উপবন, সমগ্র অঞ্চল, বিস্ময়ের ছোঁয়া সাথি করে,
ক্লান্ত মাঝির দাঁড় টানার মতো ফেলে যাচ্ছি অবাক সময় ।
আমার থেমে যাওয়া নেই,
ভয়ার্ত রজনী দেখে পিছুটান, ঘরে ফেরা নেই,

তুমি কি অগ্নির ঝলক, কোনো প্রতারণা না অলৌকিক—
কোনো ধ্বংসের বোশেখি বাতাস!
কতোকাল ধরে বিরহের বাঁশি হাতে
অনাহারী শ্রমিক, শরীরে করুণ চাদর
তপ্ত-বেদনার্ত দিবসের গ্লানি নিয়ে
মানুষের সাথেই আছি, অথচ মানুষ নই!

তুমি করুণ বীজ না রোগাক্রান্ত-নির্বোধ মাঝি,
তোমাকে দেখার জন্যে এত্তো কিছু ঝরে পড়ে,
মুছে যায় কবির হৃদয়, প্রসন্ন লোকালয়,
আমার বুক থেকে খসে যায় লালনের ঘর ।

শেষের গল্প

জানি এর উত্তর পাবো না তবুও লিখলাম,
এমনি তো কতোই লিখেছি ভেতর থেকে জেগে ওঠা
শব্দ মহিমা-বেদনার কাহিনী,
আমার কথাগুলো এখন বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে তোমার ঘরে।
তোমার বুকের মাঝে—
ওইসব জলোচ্ছ্বাস ঢেউয়ে দোলাচ্ছে
অমীয় কালের মেঘ!

এতোসব চিৎকার শুনেও জীর্ণ করেছো গোধূলির কপোল।
ক্ষমাহীন করেছো আমার অনবদ্য স্বপ্ন,
এমন আহত যুগ গড়ার কি এমন মানে হতে পারে।
আঘাতে পরিপূর্ণ মৃত্যু ঘটাও—
নয়তো ছিঁড়ে ফ্যালো আশৈশব বন্ধন ইতিহাস
কিশোর বেলার ছবি,
এমন দৃশ্য আমি প্রাণ ভরে দেখতে চাই!

তোমাকে লিখলাম শেষ উপাখ্যান,
দুঃখভেজা অস্থির নগর থেকে।
তপ্ত দহনে—একে সমাপ্তি ভাবতে পারো,
হারানো সবুজের বায়ু, কিংবা অদ্ভুত মৌসুম ভাবতে পারো,
আমি তাকে নিবিড় উজ্জ্বলতা দিই,
উঠোনের ঘাস, সেও জানে কেন আমি মরা উপত্যকায়
আজও রেখে যাই বসন্তের খাম,
অথচ তুমি ম্লান গল্পের মোহনায় গড়ে তোলো
অস্থির জীবনযাপন।

তুমি থেমে গেছো—স্বর্ণালি মিছিল,
আদিগন্ত নির্মল আকাশ থেকে।
অন্তর থেকে সরে গেছে ধূসর সময়,
এভাবে অনেক অনেক যাবে,
যেতে যেতে আমার কাছেই রয়ে যাবে চিরকাল,
তখন কোথায় পালাবে তুমি, কে বহন করবে
পরাজয়, বিমুখী সবুজলতা!

জানি এর উত্তর পাবো না—তবুও লিখলাম!

অদ্ভুত দরোজার কাছে

আমার তো অন্য কেউ নেই—কার কাছে যাবো,
যেতে যেতে তোমার কাছেই যাই!
না না করো—প্রতিদিন ফিরে আসি,
এক ঝাঁক কষ্টের পাথর নিয়ে ।
তার পরও তোমার আঙিনায় ছুঁয়ে যায় কবির বুক,
এভাবে বিশটি বসন্ত—
এভাবে অদ্ভুত দরোজার কাছে শূন্য হয়ে গেছি আমি!

এর পরও ঘুরেফিরে তোমার কাছেই যাই ।
হয়তো মৃত্যুর পরও কবিতার খাতা,
কিংবা কবির লাশ—
দামহীন হার, ধুলায় মেশানো মাংস-দেহ,
তোমার কাছেই যাবে!

মস্কো টাওয়ারে কিছুক্ষণ

হায় চিঠি

এমন এক সময় আসবে, যখন পৃথিবীতে
কোনো ডাকঘর থাকবে না।
চিঠি লেখা ভুলে যাবে মানবজাতি,
যন্ত্রমন্ত্রে, মোবাইলে কিংবা ল্যাপটপে জানাবে
প্রেমিকা তার আদিঅন্ত কথামালা সুজনের ঠিকানায়।
রূপবান-রহিম
বাদশার মতো পুরনো হয়ে যাবে মায়ের কাছে লেখা সন্তানের
চিঠির মর্মার্থ।
দূর দেশ থেকে গোপন বাণীর সওয়ার হবে ভিন্ন বাতাসে ভর
করে, এইভাবে একদিন পৃথিবীতে চিঠির জন্ম-জন্মান্তর যাবে
মুছে। মৃত্যু ঘটে যাবে ভালোবাসার। নিঃস্ব হয়ে যাবে
ডাকঘর নির্মিতির কাল। মানুষ হবে তখন পাখির সন্তান।
কেচ্ছা হবে চিঠির বাক্স। চিঠির রূপান্তর হবে রূপকথা।
কী ছিল চিঠির
ইতিহাস, কে কবে কার কাছে প্রথম লিখেছিল
এক পয়সার
দুরন্ত খামে সুখে-দুঃখের নানা প্রজাতির সমীরণ। কে কবে
অনন্ত পথের ধূলিতে-কাঁধে পাটের বস্তা ঝুলিয়ে ছুটেছিল
গ্রাম থেকে নগরের পথে-পথে। কে কবে প্রথম রানার
সেজে হয়েছিল সভ্যতার অমলিন বাহক—
এসবই ধারণ করবে—ঘটিবাটি
কিংবা নদীর উৎপত্তির মতো অজানা উপাখ্যান।

একদিন কেউ চিঠি লিখতেই জানবে না। পৃথিবীর রূপ হবে
জঞ্জালের আখড়া।
জিপিও নামে বিশাল—
দালানের বুক খালি হয়ে যাবে। তার অন্তর ছিঁড়ে কেবল
হায় হায় ধ্বনি বাজতে থাকবে।
মেঝেতে বসে কেউ আর বন্টন করবে না লাল-নীল-সবুজরঙের
পোস্টকার্ড। কান্নাহাসির মন-মাতানো পোস্টকার্ড।
পিতামাতার কষ্টের অশ্রু মুছে দেবার অসামান্য পোস্টকার্ড।

মাথা নত হয়ে আসে

সহযোদ্ধাদের দেখে আমার মাথা নত হয়ে আসে।
জয়নাল এখনও সেই আগের মতোই
খুব মাটির মানুষ।
সহজ-সরলের জীবন্ত প্রতীক।
গ্রামের পথে-পথে এখনও যোদ্ধার পায়ে জোটেনি পাদুকা,
এ-দৃশ্য আমায় বড় বেশি সাহস যোগায়,
অনেক বেশি কাঁদায়।
জয়নাল একাত্তরেই শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।
এখনও পূর্ণাঙ্গ এক গর্বিত দিনমজুর বন্ধু আমার।
দিন আনে দিন খায়। ছেঁড়া শার্ট ওকে ছাড়েনি।
অথচ, যুদ্ধের বাগানে যারা ফুল ছড়িয়েছিল, সেই
গেরিলা সারারাত কাঁধে ভারী অস্ত্র নিয়ে যখন
চষে বেড়াত যুদ্ধের ময়দান। মনে হত এই রাখাল
শত্রুর সব দেয়ালই চুরমার করে দিতে পারে।
চাঁদমারির পাশে আহসান আর জয়নাল কালভার্টে
গ্রেনেড আক্রমণে সেই জয়গানই গেয়েছিল।
দু'নদীর মোহনায় পাকসেনাদের গানবোট আক্রমণে
ওরা সেই দ্রোহ রেখেছিল।

রাজাকার, আলবদরের ঘাঁটি খুঁজে বেড়াত শাহাবুদ্দিন
পরেশ আর কৃষক মনজুর,
ওদের কেউ-কেউ চটের থলেতে গ্রেনেড নিয়ে বিতরণ
করত ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে।
যোদ্ধাদের নৌকো চালিয়ে শত্রুর সীমানায় নিয়ে যেত
হায়দার মাঝি, তার ভাই ইয়ার মাঝি।
যে মা, যে সাহসী বোন যোদ্ধাদের ভাত রান্না করতে করতে
ক্লান্ত হয়েছিল,

তাঁদের দেখে দেখে আমার মাথা নত হয়ে আসে।
সহযোদ্ধাদের দেখে দেখে আমার মাথা নত হয়ে আসে।

বর্ষা পাঁচালি

বহুকাল পর আষাঢ়ের ঘুম ভাঙল। পুরনো এক গল্প নিয়ে
বর্ষা আজ ভোরে স্বপ্নবানে আমাকে ডুবিয়ে রেখেছিল।
যখন জেগে উঠি,
দেখছি, সেই বৃষ্টি, আকাশ রয়েছে মুখ গুমড়ো করে সারাদিন।
বাদলের দাপটে ঘরবন্দি বিকেলে। এঁটেল মাটিতে
পিচ্ছিল পথ। আমি
ভাবছি—এ আমি কোন বর্ষাকে দেখছি? দেখছি—
গ্রাম্য কিশোরীর খোঁপায় তরতাজা কদম ফুল গুঁজে দেয়ার উদ্দাম ভোর—
আউঁশ জমিতে নতুন ধানের শিল্পময় চাহনি।
আলতা পায় কৃষক বউয়ের হাঁটাহাঁটি।
কাঁচা সড়কের বুক দিয়ে কলসি কাঁখে নিয়ে যে-মেয়ে একদা
ছুটে চলত ভেজাপল্লীর মুক্ত ঘরানায়। সে দাঁড়িয়ে সম্মুখে।
ভাবলাম—এই বুঝি সে গেয়ে উঠবে বর্ষায় ভেজাপথের পাঁচালি।
এবার বুঝি ঠিকই সেই আগেকার হিজল টুপটাপ ঝরে পড়বে
বাড়ির পাশের খালে। পাকা ডুমুর চিবোবে কাক আর শালিক।
তরতর করে নতুন জলের মাঝে ছিটকে পড়বে ন্যাংটো শিশু।
বহুকাল দেখা হয়নি মেঘের গর্জনে মাছের ছুটোছুটি।
দেখা হয়নি গভীর রাতে জোছনাভরা আকাশে কালো মেঘের
ঘুরে বেড়ানো।
দেখা হয়নি বৃষ্টির জলের তোড়ে মাঠ-ঘাট ভিজে ওঠা।
শোনা হয়নি বৃষ্টিজাগা রাতে ঝুমুর ঝুমুর শব্দভার।
দেখা হয়নি নদীপাড়ে হাডুডু খেলা আর কাঁঠাল নিয়ে—
দিনমজুরের বাড়ি ফেরা।

মনে হয় বহুকাল পর বর্ষা আজ হাসছে। চারদিকে সবুজের
অভাবনীয় উচ্ছল বয়ে চলা।
খাল-বিল ভরে উঠছে আকাশ থেকে নেমে-আসা জলের সরোবর।
মনে হচ্ছে, এই তো আমার হারিয়ে-যাওয়া শ্রাবণের ফিরে আসা।
বহুকাল পর বর্ষা আমায় স্বপ্ন দেখিয়ে গেল।
আবহমান চিরচেনা রূপায়নের স্বপ্ন দেখিয়ে গেল।

কী ছিল সেকালে

কী ছিল সেই গ্রামের সরল পথের ছায়ায়, এতকাল পর তা
মনেই আসে না।
বাঁশঝাড়ের মায়াবী চোখ, কাশবনের শাদা শাদা উড়ন্ত বায়ু
এসে ভিড় করত স্মৃতির কাতারে।
হাওর পেরিয়ে কাদা আর
হেমন্ত বিকেলে নেচে নেচে আসত স্কুলছুটির পর দুরন্ত
আনন্দ। কৃষকের হাতে-হাতে—
ধান কাটার বাঁকা কাঁচির চেয়ে থাকা।
ফসলের গন্ধে উতলা হত শান্তপথ।
একঝাঁক পাঠ্যপুস্তক, পকেটে নিব কলমের কালির দাগ।
স্পঞ্জের স্যান্ডেল,
হাফশার্টের কলার পকেটে খুচরো মুদ্রার ঝনঝন শব্দ। তা
কতটুকু থাকল।
এতকাল পর তা আর মনেই আসে না।

কী ছিল সেই জীবনের প্রতিটি সুখময় মুহূর্তের স্বপ্নভুড়।
তা আজ মনেই পড়ে না।
সন্ধ্যায় হারিকেনের আলোয় পাঠ্যবইয়ে ডুবে থাকা।
গাছে বসে ফল চিবুনোর আনন্দের ভেতর হঠাৎ
বৃষ্টি ঝরতে থাকা।
বৃষ্টিতে ভিজে কতবার বকুল খালাম্মার সাথে গল্প হয়েছে
তা মনেই আসে না।
ধারাপাত—
মুখস্থ করতে করতে মার বুকে বহুবার ঘুমিয়ে পড়েছি।
বোনের আদর নিয়ে
প্রতিভোরে জেগে ওঠা—
ভাইদের ধমকের তোড়ে রাত জেগে
পড়ার টেবিলে হামাগুড়ি,
অজানা ভবিষ্যতের পাহাড় গুনতে গুনতে অনেক
প্রহর যেত কেটে—
তা আজ মনেই পড়ে না।

বাংলা ভাষা

আরও কিছুকাল তোমার বর্ণের ছোঁয়ায় নিজকে
রঙিন করতে চাই।
আরও কিছু কবিতায় তোমার বর্ণিল অক্ষরের
সাজানো আকাশ নেমে আসবে,
সেই স্বপ্নে সেই বন্দনায় এখনও বেঁচে আছি।
তোমার অন্তরে ভর করে পৃথিবীকে আরও—
কিছুকাল দেখতে চাই।
তোমার স্পর্শ পাওয়ার জন্য আর কিছু বসন্তের
বিকেল, আরও কিছু পাহাড়ের বয়ে চলা দেখার
ইচ্ছে হয়।
তোমার বুকে চড়ে আরও কিছুকাল অন্তর জুড়াব,
এই ইচ্ছা এই উৎস নিয়ে
এখনও আমি হেঁটে চলি মায়াবী বর্ষায় কিংবা
নিশুতি প্রহর।
আরও কিছুকাল পাতাঝরার শব্দ, বৈশাখী হাওয়ার
আলাপ শুনতে শুনতে পৌছে যাব
বালিঝড়, পাখির
কান্না অথবা বাংলা অক্ষরের তাকিয়ে থাকার দিকে—
সেই গল্পটুকু হবে, সেই তাম্রলিপি ধারণ করে পৌছে
যাব নবান্নের ঘরে—
এই বোধ এনে যারা মায়ের বুক করেছে মহীয়ান,
বায়ান্নের সেই বীর রফিক, সেই লড়াইয়ের চাঁদমুখ
সালাম-রফিক-জব্বারের নিশ্বাস—
আরও কিছুকাল
গ্রহণ করার জন্যে,
সেই রক্তদান, সেই ধন্য ধুলায় মিশে যাবার জন্যে
এখনও আমি বর্ণমালার পথে-পথে দাঁড়িয়ে আছি।

বক্তাবলী জেনোসাইড

সাঁইত্রিশ বছর পরও তোমাকে খুঁজছি, ফারুক—হে বন্ধু আমার।
সাঁইত্রিশ বছর পরও শাহ্ আলমের মা ছেলেকে ডাকে।
সাঁইত্রিশ বছর ধরে তোমার একশত সাতচল্লিশটি
মুখ আমি দেখি না।
যারা আলো জ্বালিয়েছিল এই মাটিতে—বক্তাবলীর ঘরে—
ঘরে, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী আর শীতলক্ষ্যার পাড়ে, জমিতে।

সেদিনের শান্ত কুয়াশার ভোরে বর্বর পাকবাহিনীর
মেশিনগানের তাণ্ডবে ছাই-হয়ে-যাওয়া গ্রামগুলোর
মুখে হাসি দেখি না।
ডিগ্রির চর—কী ভয়াবহ রক্তাক্ত উপত্যকার নাম।
মুক্তারকান্দি অসংখ্য মায়ের বুক খালি হওয়া প্রান্তর।
রাজাপুর যুদ্ধমাঠের শত্রুর বুলেটে ঝাঁজরা হয়ে পড়া ঠিকানা।
মধ্যনগর সালাম খন্দকারের পরিবার নিঃস্ব হওয়া—
কষ্টের বাগান। কৃষকের ভিটা পুড়ে ছারখার-হওয়া ভস্মভূমি। স্বর্ণভূমি।

শহীদ মনির, তুমি নেই, অথচ তোমার বিপ্লবী মুখ,
যে-হাতে পাক-হায়েনার সামনে তুলে ধরেছিলে স্বাধীন
বাংলাদেশের পতাকা। হায়েনার হাতে এসএলআর
তাক করা দেখেও লক্ষ্মীনগরের বীর নূর মোহাম্মদ
বলেছিল—জয় বাংলা, বলেছিল এটা জয় বাংলার দেশ।
তোমরা কারা?
তার মুক্তিকামী কণ্ঠের ধ্বনি এখনও আমার কানে বাজে।
এমনি অসংখ্য যোদ্ধা, যারা একাত্তরের উনত্রিশে
নভেম্বর এই গাঁয়ের ভেতর বর্বর পাকবাহিনীকে
রুখে দাঁড়াবার গুলি ছুঁড়েছিল। যে-মা, যে-বোন
মুক্তিযোদ্ধা-গেরিলাদের ভাত রান্না করেছিল,
যে-রাখাল ভাই বাংকার খুঁড়েছিল, হাতে
রাইফেল নিয়ে সারারাত পাহারা দিতে দিতে যারা সূর্য এনেছিল।
শত্রুকে করেছিল প্রতিরোধ—বাধ্য করেছিল আত্মসমর্পণ করতে।
সাঁইত্রিশ বছর পরও আমি তাদের অন্তরের সব কথা টের পাই।
পোড়া গৃহের ছাই দুঃখিনী ভিটার অশ্রুপাত শুনতে পাই।
তাদের প্রাণের স্পন্দন শুনতে পাই।
সাঁইত্রিশ বছর পর—ওরা আমার কাছে বারবার ফিরে
আসছে। যারা নয় মাস লড়াই করে বক্তাবলীকে
রেখেছিল মুক্ত এলাকা। এনেছিল মায়ের বুকে স্বাধীন
বাংলাদেশ। এনেছিল লাল-সবুজের রক্তাক্ত পতাকা।

মাছরাঙা

মাছরাঙা যুদ্ধে যাবে। নদীর বিরুদ্ধে জলের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করতে করতে ওরা ফিরিয়ে আনবে জল,
ফিরিয়ে আনবে মাছ।
জল ও মাছেরা দূর দিগন্তে গিয়েছে বেড়াতে।
পদ্মা-মেঘনার বুক যেন বালির পাহাড়
জলেরা নেই।
মৎস্যকুল নেই।
খাদ্যের দাবিতে মাছরাঙা যুদ্ধে যাবে।

পাতারা

একদিন সবাই ঘুম থেকে জেগেই দেখবে
গাছের পাতারা আর ঝরে পড়ছে না।
চিরকাল ওরা গাছের বুকেই থাকার দাবিতে
ধর্মঘট করছে। জীবনরক্ষার জন্যে,
বৃক্ষের কাছেই থাকবার আশায়
ধর্মঘটে আছে। পদচাপের গল্প শুনতে শুনতে
পৃথিবীর সব বৃক্ষের পাতারা বড় ক্লান্ত।
ওরা ঝরে পড়লে একটুকু কাঁদবে
সেই সন্তান তো
নেই। পাতারা বিয়ে করতে জানে না, তাই ওদের
ছেলে নেই, দরদি কন্যা নেই, পিতা-মাতা নেই।

মস্কো টাওয়ারে কিছুক্ষণ

মাটি থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে মস্কো টাওয়ারের ক্যান্টিনে বসে
আমি বাংলাদেশের দিকে অবিরাম তাকিয়েছিলাম।
জমাটবাঁধা মেঘের
বহর উড়ে যাচ্ছে আমার নাক-কান ছুঁয়ে। ঘন মেঘের
ভেলায় মাঝেমধ্যে
নিচের দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সূর্যের আলো
এসে বারবার
রঙধনুকে চুমো দিয়ে চলে যাচ্ছিল। নিচের দিকে তাকাতেই—
মস্কো শহরের সব গাড়িকে মনে হচ্ছিল এক-একটি
ম্যাচবাতির বাক্স,
তিরতির করে ওরা নড়ছে। আমার সফরসঙ্গী
বন্ধুরাও বেশ
মজা করে আকাশের
মেঘ দেখে দেখে আনন্দে বিভোর। মনে হচ্ছিল
আমরা মস্কো শহরের
উপর দিয়ে কোথাও উড়ে যাচ্ছি। দূরের আকাশে
অসংখ্য ছোট ছোট
জঙ্গি বিমান। আমি একবার সেদিকে মুখ ফিরিয়ে
বললাম, যদি বাংলাদেশে
যাও—সেখানকার পাখির শব্দ, নদীর কলতান, ধান
কাউনের একটু নিশ্বাস,
নিয়ে এসো। আমার মার দেয়া কিছু পান্তা, মুড়ি-
কলমি শাকের ঘ্রাণ—
পদ্মার ইলিশ আর গ্রাম্যপথের ভালোলাগা
নিয়ে এসো।

খুলির হাট

ডিআইটি ঘড়ির টিক টিক শব্দের ভেতর
কান পেতে ওরা রুটির
অপেক্ষায় রাত জেগে আছে। ঝলমলে
জোছনার তাঁবুতে সংসার।
আইল্যাণ্ডে সিটি কর্পোরেশনের তৈরি
মেকি-বিনোদনী
পাতাবাহার, পাশে জীবন্মৃত পল্টন ময়দানের
মরা ঘাস-নড়বড়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয়
স্টেডিয়ামের খসে পড়া ইট
এখন ওদের সঙ্গী।
নিশিতে এই যে না-খাওয়া পদ্মাপাড়ের
ক্ষুধার্ত মানুষ,
ঝোপঝাড়ে বিরহকাতর, বিনষ্ট সভ্যতার
দৃষ্টান্ত মানুষ।
ওদের নিরন্ন চোখমুখ সুউচ্চ ভবনকে কী
ভাষায় বরণ করে নেবে?
কুৎসিত বায়ুঘোরে ডুবে থাকা এই নগরীর
বিরহবৃত্তান্ত মানুষ,
কখনও কি কেউ এইসব নদীভাঙা
মঙ্গাক্রান্তদের সব-হারানো গল্প জানে?

ভিটেমাটি নেই।
পদ্মার ছোবলে ঘরহারা মানুষ। কবে
কোন গ্রাম থেকে ছুটে-আসা হরমুজ খাঁ।
তার বউ জরিনা।
ছেলে করিম মিয়া।
রিকশাচালক। তেরো বছরের মেয়ে ঝরনা।
পাটকাপড়ে দেহ মুড়ে আছে নিবিড় ঘুমে।

পথ-বিষয়ক

কোনো পথই থাকে না। একে-একে সব পথ মরে
যায় একদিন।
পথ মরে গেলে কেউ কাঁদে না।
পথ হয়ে পড়ছে ঘুমের বিছানা।
পথেরা একে-একে বিলীন হয়।
আর রোগাটে বাতাস হয় ভারী,
এভাবেই পথ মানুষের ঠিকানা হয়। ঘরবাড়ি হয়।

বীরত্বগাথা

সারস চলছ, চলতে চলতে যাও,
ঘুমন্ত পাড়াগাঁ, জাগাও জাগ্রত করো।
কাহার সাহস, ভেঙেছে আমার নাও,
সম্প্রীতিঘাতক, বেহায়া কুলাঙ্গার ধরো।

উপোসি ডাহুক, দেখি না কোথায় গেল,
শ্যামল চান্দের আলোটা এখন নাই।
অন্তর-জুড়ানো লালনও এলোমেলো
দুরন্ত দোয়েল ডাকে না, শূন্যতা পাই।

যারা পেয়েছে সব ভরেছে তারা গোলা,
কুলির কপোলে মুটের ছায়ার ভর
কাটেনি। নিরস বিহান সরেনি, ঝোলা
ছিল শূন্যতায়—এখনও সেই স্বর।

সারস চলছ, চলতে চলতে বিশ্ব—
কাঁপাও, বাঁচাও যাহারা হয়েছে নিঃস্ব।

পিলসুজ

পিলসুজ জ্বেলে রাখি সারাক্ষণ।
এইটুকু আলো যদি কখনও
নিভে যায়,
তখন কী করে দেখব পৃথিবীর ঝলসানো
মুখ। সারি সারি মহাদেশের
শীতল-রাঙা মুখ!

ভালোবাসার বিকেল

বকুলপাতারাও এখানে সুখে ছিল। কী ভীষণ শাদা শাদা
বকুলফুলের ময়াল—তাতেই ছিল প্রাণ। একদা ওদের সুবাসে
এখানে ক্ষণে-ক্ষণে নেমে
আসত শান্তির পরী।
আসত ভালোবাসার বিকেল।
এখন কোনো শাদাই শাদা নয়। খুনির হাতেও গোলাপ ওঠে,
গোলাপের মন তখন কি ভালো থাকতে পারে? পারে কি?

কাঠঠোকরাও একদিন এখানে ঠুক্কুর ঠুক্কুর
গজল শোনাত।
পাখির গজল তো এ-মাটির সংস্কৃতিরই ভাষা।
একদিন পাখির ডাকও ছিল কৃষকের আত্মার জন্যে জীবন।
ছিল গুণটানা মাঝির বুড়িগঙ্গার পাড়ে বসে ইলিশভাতের
উৎসব।
বালির চরে হঠাৎ কাশবন সৃষ্টি হওয়ার সময়গুলোও
সুখে ছিল।

২.
জামবৃক্ষও এখন সুখে নেই। তা না হলে ওরা কাঁপবে
কেন? কিসের হল্লায় কাঁপে ওদের শরীর। মন। বুক।
বেলপুষ্প সেও সুখে নেই। তা না হলে বড় চাওয়ার
সুন্দর আগামীরা কেন
সুন্দর হতে পারে না।

জোনাকির হর্ষস্বরে রাতভর তাজা অক্সিজেন বুকে নিয়ে
নারকেলবীথি, শিশুগাছ তাকিয়ে আছে একটি দুঃখহীন
সকালের দিকে।
ওরা দেখল, চারদিকে বিনাশের খেলায় মত্ত সবাই।
হরিণচোখা কি অহংকারহীন বকুলপাতা, সে যখন
সন্ত্রাসীর হাতে গন্ধরাজের তোড়া দেখতে পায়—তখন
তার মন কী বলে? তখন তার ঐতিহ্য কিসের বেদনায়
তলিয়ে যায়। হারিয়ে যায়। তলিয়ে যায়। হারিয়ে যায়।

কারফিউ

সান্ধ্য আইনের খেয়ায় দিনেই সব অন্ধকার।
লাখ জন, যারা
দুঃখী এই শহরকে রাঙায় অনুক্ষণ ঢোলের বাজনায়–
মনজয়ী রূপে,
তারা নেই। ভাতের টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে
যে-ঠেলাওয়ালা
আসত প্রতিটা সকালের উন্মন বাতাসে ভর
করে-তারা নেই।
যে-রিকশাওয়ালা গাইত 'ওগো বৃষ্টি
আমার চোখের পাতা
ছুঁইয়ো না' সে নেই। শুধু বন্দুক-হাতে দণ্ডায়মান
কিছু লোক।
শর্টগানের নল দিয়ে খোঁচায় মানুষ।
পথের ধুলোয় রাখে কষ্ট।
সান্ধ্য-আইনের বরাতে ওরা কলের চাকা
ঘোরানো নারীকে—
লাঠিপেটা করে মতিঝিল, শিল্পভবনের
সামনের সড়কে। এ কী
বীভৎস রূপ ঈশ্বর আমাকে দেখালেন
সেই ক্ষণে। মায়েরা আমার
দুহাত করজোড় করে বলছিল–আমরা তো
দিনমজুর। কাজ
করে খাই। গার্মেন্টসে না গেলে খাব কী?
তারপরও বারুদে
জ্বলে ওই শ্রমিকদেহ। পায়ে-হাতে শরীরের
বেবাক জমিন
জুড়ে শিকল। আহা সান্ধ্য আইন, দিনের আলোতেই
তুমি রাজধানীতে
নিয়ে এলে বিচ্ছিরি অমাবস্যা। এ যে
গণপ্রাণ বধ করে, পিটিয়ে—
জেলে দেয় নিরন্ন নাগরিক। ওরা গ্রেফতার-নির্যাতনে কী এমন
উসুল নিতে চায়?

সান্ধ্য আইনের খোড়লে ভাসছে আবারও
পাঁজরের হাড়—
সাজানো উদ্যান, জীর্ণ-শীর্ণ বস্তি, ঘুমিয়ে-থাকা নগর।

গল্প নয়, সুনীল সময়

যে সুন্দর মেঘমালা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এই হাত ডেকেছিল পুরনো কেল্লার
সুশীল ছায়ার মুখ,
নতুন জীবনের খেয়া—অনন্য বসন্ত...
তার সবটুকু নিয়ে গেছে কিছু বদরের
নোংরা লিফলেট,
তার সবটাই গিলেছে পুরনো শকুনের
কুৎসিত চোখ-বেহায়া অশরীরী ছাকলবাকল।

যে-কাঁটার দেয়াল ভেঙে
আমি আর বকুল খালাম্মা, জয়নাল
হায়দার মাঝি, পরশ, শাহাবুদ্দিন
বুড়িগঙ্গায় শত্রুর গানবোটে
চালিয়েছিলাম দুর্বিনীত ব্রাশ আর গ্রেনেড...
আজ কোথায় সেই স্বপ্নের ফসল,
কোথায় মায়াময় নিমগ্ন পল্লীর
ঝাঁপিয়ে পড়ার কষ্টভোর—অমানিশা জয়লাভের নেশা...
কোথায় সেইসব নদীপাড়ের পুঁথির আসর।

শাদা মনের মানুষ

এখানে কতজন বড়াই করতে পারে, তারা সত্যের
মাঝে আছে। সত্য তো কোন লাউলতা নয়, হাত
বাড়ালেই এসে যাবে হাঁড়ির ভেতর। এ তো নয়
ভোরের দইওয়ালার গামলার চিড়ামুড়ি—চাইলেই

জল মিশিয়ে ঘোল বানিয়ে ভরে দেয়া যায় পেটের
মধ্যিখানে। এ তো নয় মিষ্টির দোকানের রসমালাই,
চাইলেই যেনতেনভাবে গলাধঃকরণ করা যাবে। এ
তো নয় ইট-বালি, সুরকি যা দিয়ে রাতারাতি তৈরি

করা যাবে আকাশছোঁয়া বাড়ি। এ কি কোনো পাখি?
যে চাইলেই উড়তে থাকবে অজানা দিগন্তের দিকে
নগ্নদেহ খুলে দিয়ে? সত্য বেড়াতে গিয়েছে মানুষের
ভিড় থেকে মানুষেরই অন্তরে। সে-মানুষ কোথায়?

সে আছে শাদা মানুষের ভেতর আরেক শাদা রঙে।
সে আছে সবুজের সমারোহে অন্য এক সবুজ বনে।

বাড়িগুলো জোছনার মতো নয়

দূর আকাশের বুক ছুঁয়ে কেবল দীর্ঘতম ইটের বাড়ি উঠছে ।
বাড়িগুলো জোছনার মতো নয় । নানা রঙের বাড়ি ।
লাল বাড়ি, নীল বাড়ি, সন্ত্রাসীর বাড়ি, বনখেকোর বাড়ি,
পুঁজিপতির বাড়ি আর ঘাম-ফেলা শ্রমিকের বাড়ি এক নয় ।
রংধনুর চেহারায় সাজানো এইসব বাড়ির মতো মানুষের মন
দীর্ঘতম নয় । বড়সড় নয় ।
মানুষের মন তো উঠছে না উপরের দিকে ।
কেবল নিচে নেমে যায়, ছোট হয়ে যায় ।

চাঁদ ছুঁতে চায় শহরের কোনো কোনো দালান ।
মানুষের মন তার মতো জোছনামুখর নয় ।

এই বরষায়

১.

এই বরষায়
আমি পুরোটা সময় কাটাবো
জল সরোবর গ্রামের আঙ্গিনায়।
মায়ের আঁচলে মুখ রেখে।
যেখানে ঘুঘুর ছানা কচুরিপানার নীল রঙের ভেলায়
খুঁজে ফেরে ঋদ্ধ–
শ্রাবণের ভালোবাসা।
খুঁজে ফেরে দুর্বিনীত দোয়েলের ডাক।
কৃষকের ঘরে যেখানে কাঁঠাল আর মুড়ির উৎসব।
আমি এই বৃষ্টির ঘুমভাঙা ঋতুর ভেতরে
ডুবে ডুবে চেখে নেব ইক্ষুজমির
সবটুকু বরষার প্রেম আর নিত্যসুখ।

২.

তুমি বরষার মুখে নিজের রাঙা ঠোঁট গুঁজে তুলে আনো
অনিন্দ্য সুন্দরের নারীসুখ। তার স্তনভূমে হাত রেখে
আবিষ্ট করো চিরায়ত ঐশ্বর্য।
তার সাথে রাতারাত শুয়ে থেকে গ্রহণ করো শ্রাবণের
অবিনশ্বর কালের গর্জন,
এই দৃশ্য দেখুক প্রেমহীন শহরের কাঠঠোকরা,
এই দৃশ্য বুঝে নিক শহরের ইতিহাসবিমুখ সাংবাদিক কিংবা
রাজাকার তোষণকারী ব্যর্থ সব বুদ্ধিজীবী।
এই সত্য অনুধাবন করুক কিছুই না জেনে যারা সবকিছু
জানির কুৎসিত গজল গায়।

তাঁর তর্জনীর গর্জনে

মধুমতির সতেজ জল শোনো। শোনো পল্টনের অমলিন
ঘাসের বিহান।
মরণের খুবলে খাওয়া এই যে জ্বলজ্বলে কালিমার
স্রোত, ভুলে যাও।
জান কি?
তোমাদের সত্তার মর্মরে এখনও দিব্যি ভেসে আসছে
এক কীর্তিমান জ্যোৎস্নার আহ্বান। ভাইসব ভয় নেই।
আবার সরবে–
উচ্চারণ করো তাঁর অমর তত্ত্ব—কালজয়ী কাব্য শিহরন।
'রক্ত যখন দিয়েছি—রক্ত আরো দেব—এদেশের মানুষকে
মুক্ত করে ছাড়ব ইনশায়াল্লাহ।' কণ্ঠে-কণ্ঠে-বেগবান
কোরাসে ধারণ করো অসির এই স্বরূপ—এই লোকজ ঠিকানা।
যে-ইশারা ছুঁয়েছিল স্বাধীনতার উচ্চকিত পথে-পথে, যুদ্ধে—
সমুদ্রজয়ের ক্যানভাস।
তাঁর মহাযুদ্ধের ডাক শুনতে শুনতে তাবৎ গণপ্রাণ—উড়িয়েছিল মুক্তির পাল।
তাঁর তর্জনীর উত্তাল গর্জনে কেঁপে উঠেছিল জল্লাদের আসর।
তাঁর হুংকারে—পৃথিবীতে যে উত্থিত হয়েছিল এক নবজাতি,
তার ভালোবাসার তুড়িতে পৃথিবীতে যে সৃষ্টি হয়েছিল গর্বিত
বাঙালি—বাংলাদেশ।
সেই মহাকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান আবারও ডাকছে তোমায়—
তা কি শুনতে পাও, হে আম্রকানন।

শোনো তাণ্ডবখচিত বিবর্ণ কালের সন্তান,
শোনো নিঃস্ব বাতাসে নুয়ে-পড়া শীর্ণ ঘুঘুর লেজনাড়া প্রহর,
যে-কোকিল একাত্তরের পৃথিবীকে মুক্ত বায়ুর বাগানে
দিয়েছিল ঠাঁই।
হে মানুষ, গর্বিত কালের মানুষ—তোমাকে আবারও ডাকছে
সেই মহামানব। যাঁর বর্ণিল সংগ্রামে, স্বাধীনতার ঘোষণায়
ক্ষুধার্ত-অপমানিত জগৎ ফিরে পেয়েছিল ঘরে ফেরার
দুর্বিনীত তরবারি।

যাঁর হাতে হাত রেখে তোমরা গড়েছিলে চিরন্তন স্বাধীন-

সবুজাভ বসতভিটা।
সে-ই তো আমার চিরকালের মহাজাগরণ-মূর্তমান রাখাল,
সে-ই তো একদা শুনিয়েছিল দীপ্ত গহনের উর্ণভ বয়ে চলা।
আজ সেই নির্ণয়ে হোক আবার চারপাশ আলোকিত করার
বলবান শিহরন।
হোক কাতর রাতের দুঃখ মুছে দেওয়ার বলবান শিহরন।

নবান্নের জন্য

কোথাও বাজে না এখন শস্য কাটার মরমি সংগীতের সুর।
যাঁরা গাইতেন সেই অন্তরছেঁড়া মৃত্তিকার মশলাপাতির সুখ।
তারা কি জীবিত কেউ, নাকি মরা তুষের উচ্ছিষ্টে বিলীন।
নাকি ভুলে-যাওয়া নদী-স্রোতের ক্রন্দন। নাকি গুহাযুগের
ক্ষয়িষ্ণু নাগরিক। কোথায় আজ সেইসব চাষাভুসার শিশির
ভেজা কাল, সরষে ফুল নেই। নবান্নের কুসুমিত স্পর্শ নেই, তিলের
খাজা নেই। যারা একদা জঙ্গলের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে গাঢ় মেঘ
ঢেকে এসেছিল সভ্যতার আয়নায়। গড়েছিল মানবের সভ্যতা।
যারা আমাদের নিয়ে এসেছে এইখানে, ভাস্কর্য প্রেমের যুগে।
সেইসব গায়েনের মুখে আজকাল শস্য বোনার গান আর
বাজে না। যারা যন্ত্রহীন বাদ্যহীন গাইতেন অন্ধকার মুছে
ফেলার পালাপান। তারা আজ বিপন্ন পৃথিবীর কালো ছায়ায়
মগ্ন। যে-মানুষ বন্যের ফলমূল খেয়ে খেয়ে আনতে শিখেছে
সুশীল সভ্যতা। তার টেপরেকর্ডারে বেজে উঠছে ক্ষণে- ক্ষণে
হন্তারক তীর, মৃত্যুর বীভৎসতা, কার্তুজের গর্জন, আণবিক বয়ান।

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান

তোমার অপেক্ষায় ছিল বিষণ্ন এই জাতি,
অবশেষে এলে, জ্বালিয়ে মুক্তির বাতি।
বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের পাশেই হলো
তোমার ঠাঁই,
অপেক্ষায় ছিল রক্তমাখা পতাকা, হে বীর,
তোমার ক্ষয় নাই।

যে-জীবন পথে-পথে

[সমুদ্র গুপ্ত স্মরণে]

তোমার হাতে ছিল সবকিছু ভেঙেচুরে দেওয়ার হাতিয়ার,
নিপীড়িতের হাতিয়ার।
বারবার দেখলাম, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেখলাম—
সাম্রাজ্যবাদ আর শ্রেণীশত্রুর
নিধনযজ্ঞে কখনো বা কৃষ্টির মিছিলে—
দেখলাম অবিরাম
ছুটছ তুমি অসভ্য পাথর ভাঙার পথে-পথে।
শোষণের ঘাড় মুড়ে ফেলতে তোমার হাত
ছিল আজন্ম উচ্চকিত।
এত বিনাশের কালেও তোমার দর্শন টলেনি।
গণমানুষের বাসযোগ্য ভূমির
জন্যে একটুখানি হাসিখুশি শহর, ফসলভরা গ্রাম—
সবার জন্যে রুটিভাত—
সংগ্রামের ভালোবাসায় সিক্ত করতে
সবুজ পতাকাকেও প্রতি ভোরে তুমি শেখাতে ধারাপাত।

সব ভেঙেচুরে দেওয়ার অস্ত্র ছিল তোমার হাতে,
ঠিকানা ছিল সাধারণের ডেরা আর
বঞ্চিতদের
আঙিনা। তোমার জীবন ছিল জনতার জীবন, পথের জীবন।

এইখানে এখন

কতকগুলো বাঁকা নুড়ির বিলাপ শুনতে শুনতে আজকাল
সময় কেটে যায়।
বড় চেষ্টা করেও এসব তাড়াতে পারি না। বঙ্গভবনের
দরোজা থেকে
পারি না তাড়াতে কুৎসিত ছায়া। বার বার ঈশ্বরের কাছে
প্রার্থনা করি,
নির্লজ্জ অমাবস্যা থেকে মুক্তি চাই। মানবতার মুক্তি
চাই। প্রান্তরের
লাউবন, খুনসুটি ঝড়ে আক্রান্ত বন্দরের বিকেল, সুন্দরবনের
সব জীবের,
অনাবিল পথের মুক্তি চাই। গার্মেন্টস মেয়ের প্রতি
বেহায়া কুকুরের
উচ্ছৃন্নতার অবসান চাই। হুমায়ুন আজাদের হত্যাকারীর
বিচার চাই
কেউ শুনছে না এই নিবেদন। তার পরও আমার মাথায়—
ভর করে থাকে ওসমানি উদ্যানে অনাদরে পড়ে থাকা
দুঃখিনী কামান।
কিছু বিষধর সাপ চরে বেড়ায় এইখানে সারাক্ষণ, সারারাত।

বেআব্রু ছায়ার ভেতর আজকাল আমাকে ঘুম পাড়িয়ে
রাখে সভ্যতাবিরোধী কিছু-কিছু
ন্যাকা সভ্যতাপ্রেমী। ওরা সব পারে। ওরা নব্য ঘাতক।
ওরা মাতৃভূমির চিরহন্তারক।
ওরা রাজাকার তোষণকারী, বদরের দর্শনে কাটায় কাল।
ওরা জল্লাদের টাকায় প্রত্যহ শিশুর খাদ্য কিনে
ঘরে ফিরে যায়। ওরা যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বন্ধু ফারুকের
বুক বিদীর্ণ করা
শত্রুর লেজনাড়া কুকুর। ওরা একালের হিটলার, ওরা
মীরজাফরের চেয়েও
নিকৃষ্ট হারামি, ওরা অসুর। সভ্যতাবিরোধী কীট। ওদের চিনে
রাখুন ভাইসব,
ওদের এই আঙিনায় নিষিদ্ধ করুন। বর্জন করুন।
মাতৃভূমিকে জঞ্জালমুক্ত করুন।

ফিরে আসা

বালিভূমে ধিকিধিকি গড়াগড়ি যায় আষাঢ়ের বৃষ্টিভেজা
নারীর আঁচল।
অনেক প্রহর তৃণঘাস হয়ে চেয়ে থাকে তার মুখ—
নীল আকাশের জোছনার ঢেউয়ের স্তনের ফোয়ারার
পাশে খুবলে নেয় পর্যটকের চাহনি।
মনে হয় এতকাল পর তার আলোকিত স্বপ্নের ঘুম
ভাঙল—রোমান্টিক বিকেলে।
সেই যে ঝড়ের তিলক গায় তুমি একা-একা হেঁটে চলে
গেলে বসন্ত কাঁপিয়ে।
তারপর কতটা তছনছের গল্প
ছুঁয়েছে পৃথিবীর অজানা মানচিত্র জুড়ে—
তার তো কিছুই রাখনি খবর।
অজানা বালাই পিঁপড়েরা গোগ্রাসে খেয়ে গেছে কত
সাজানো নাগরিকের সংসার, তা তো দেখনি।
তুমি ছিলে বড় কষ্টের বড় নিঃসঙ্গ নৃত্যের ছায়ার ভেতর

যারা ভালোবেসেছিল রঙিন স্বপ্নকে

আমার যত রঙিন ইচ্ছে, তার সবই দিয়ে দেব তোমাদের,
যারা আমার প্রিয়তম গাছ, রঙিন ক্যালেন্ডার, মাজারের ধূপবাতি,
যারা ল্যাংটার মেলার যত পাগল জনতাকে ভালোবেসেছিলে।
যাদের দুঃখ দেখে, দুর্যোগের বায়ুর ভেতর ভাসতে ভাসতে নেমে
পড়েছিলে ধূমায়িত যুদ্ধের ময়দানে।
হাত বাড়িয়ে যারা লোকালয়
থেকে সরাতে চেয়েছিলে আবর্জনার বাহার আর কষ্টের বিকেল।

আমার যত সাজানো পথ, সবই তোমাদের দিয়ে দেব,
যারা ঘরছাড়া মানুষের বেদনায় ছাওয়া মর্মরিত রাত্রিতে শুয়েছিলে
পার্কের মাটিরাঙা ঘাসের সিথানে।
বলেছিলে বসন্ত আসুক এই শহরের সব অলিগলিতে। বস্তির ঘরে।
বলেছিলে প্রাণখোলা জীবনের জন্য আজ যুদ্ধ হোক।
বলেছিলে সব দুর্নীতিবাজ উপড়ে ফেলে জীবনের খেয়া চলুক নিশুতি
জ্যোৎস্নায় ফোয়ারায়।
বলেছিলে সব জঙ্গি, সাম্প্রদায়িক ভূতেরা নিপাত যাক।
বলেছিলে, বসন্ত আসুক সব কৃষাণীর আঁচলের পরতে পরতে,
বলেছিলে, জীবন আসুক স্টেশনে পড়ে-থাকা মৃতপ্রায় নাগরিকের
বেঁচে থাকার খবর নিয়ে।
বলেছিলে, জীবন হয়ে উঠুক জীবনের জন্য, মানবতার জন্য।

তুঁতপোকাদের উপাখ্যান

কারো কারো দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট দৃষ্টির ভারে তারা হাঁটে রুগ্‌ন ব্যাঙের মতো খুঁড়ে খুঁড়ে। মনে হয় কচ্ছপ যায় পুরনো বনে নতুন জীবন ফিরিয়ে আনতে। এক-একটা নষ্ট চোখওয়ালা যখন দুর্নীতির চোখে তাকায়, তখন মনে হয় আজরাইল নেমে এসেছে এইখানে। অপরাধীর সঠিক দৃষ্টি লুকিয়ে থাকে আরেক কুৎসিত জগতে। বাহিরে তার যে-চেহারা—এর সঙ্গে লোকালয়ের বাজনার কোনো মিল নেই। মনে হয় মানুষের ভালোবাসার দৃষ্টিরা বেড়াতে গিয়েছে লোভাতুর, ভ্রষ্টা, নিচুমানের কোনো নোংরা কূপের কোঠরে।

মানুষের দৃষ্টিরা তুঁতপোকায় চড়ে বিষের থলেতে নিয়েছে ঠাঁই। এই অভিশাপের পৃষ্ঠতায় ওরা নষ্ট জামা গায় ঘুরে বেড়ায় মানুষেরই ভেতর। রঙিন কোট জড়িয়ে ওরা বোঝাতে চায়, দুর্গন্ধে ভেসে যাওয়া দেহকে আড়ালের আর কোনো ভরসা নেই। তাই নষ্ট চোখ শাদা আলো দেখে ভয়ে কুঁচকে যায়। অযথা গোখরো লেজ নেড়ে পৃথিবীর শান্তিকে পাঠাতে চায় বনবাসে। নির্বাসনে।

সাত খণ্ডের গল্প

১.
রাজার বাড়িতে চোর ঢুকেছে। উর্দি কুর্দি বুটেসুটে,
পাড়ায় পাড়ায় একাত্তরের ট্যাংক যেন কাটেকুটে,
স্টেশনে ছিন্নমূলের বসত তাও যায়। কার খাদ্য
কে খায়। কে বাজায় চকরাবকরা পোশাকের বাদ্য।
২.
কারখানার চিমনির আলোয় যে-মুখ দেখেছি
একদা সংস্কৃতির আড্ডায়, সেই পাটাতনেই
এখনও দাঁড়িয়ে দেখছি নানা রঙের নানা ঢঙের
পিছলাপিছলি-বিছলাবিছলি-ধস্তাধস্তি-খোঁড়াখুঁড়ি।
৩.
বন্ধুরা অনেকেই তৈলমর্দনে—গিভ অ্যান্ড টেকে
রাজ্য কাঁপিয়ে উঠে যাচ্ছে তালগাছের চূড়ায়,
ওরা আর কত যাবে, যাক-না—যা গেছে বেঁকে—
যারা গেছে দুর্গন্ধময়-দুর্নীতি-কালোনীতির খুড়ায়।
৪.
বুক পেতে দাও। যা কিছু পাও। এই যে নাও—
ভাসাও সুন্দরের দিকে। দূর করো যত নষ্ট ফিকে।
৫.
টেকনাফ মনে রেখো। সেই যে একদিন তোমার
বালুকারাশির ভেতর চাঁদের জ্যোৎস্নায় রেখেছিলাম
প্রেমময় হাত। ঝিকিমিকি বালুকাবেলায়। হায়-
সবই তো আছে—শুধু নেই চন্দ্রঘেরা সেই হাত।
৬.
নেতারা সবাই জেলে। রাজপথ ফাঁকা। তারা
যে-মাঠের ঘাসেতে বসতেন, যে-রেস্তোরাঁয়
বসে চলত সারাক্ষণ গাঁও-গেরামের গল্পমালা,
সবই যেন কাঁদছে। পথের ধুলারও মন ভালো নেই।
৭.
নদীর ওলানের সাথে তোমার স্তনের খুব মিলঝিল
আছে। বর্ষা চলে গেলে প্রতিবার নদীর বুক পলিতে
উঁচু হয়। তোমারটা চিরকালই উচ্চময় গম্বুজের
মতো আকাশের দিকে দিব্যি খাড়া হয়ে আছে।

একদিন অন্ধকার

একদিন অন্ধকার খুব রেগেমেগে বড়সড় অন্ধকার হবে।
মানুষের তৈরি অমাবস্যার তোপে পড়ে কোনো এক সময়
ঘুমন্ত অন্ধকার জেগে উঠবে এইখানে,
ওরা আর বেড়াতে যাবে না দিনের আড়ালে। লোকালয়
ছেয়ে যাবে বিচ্ছিরি তোড়ে—অনন্তকাল—নির্দয় অন্ধকার।

ঝিম-মেরে-থাকা রাত্রির সকাল একদিন আর আসবে না।
ভোরের নিষ্পাপ পাতাকুঞ্জ কখনো আর ফিরে পাবে না
আলোর শিহরন।
সুখময় পৃথিবীর হৃদয় রাঙাতে—পাবে না ক্ষণকাল, তখন
টুপটাপ ঝরে পড়বে সকল প্রেম।

একদিন অন্ধকার বিষাক্ত পিঁপড়ে হবে, খুব করে কেটে
নেবে সাজানো সভ্যতা, কেড়ে নেবে পৃথিবীর সব সুন্দর।

ঘুঙুরের শব্দঘোর

ডাকপিয়নের থলে তোমার ঝোলার দিকে
সারাক্ষণ চেয়ে-চেয়ে থাকি।
মন-জয়-করা কোনো-এক পত্র যদি এসে যায়
বিষণ্ণ বিকেলে।
ক্লান্তঘোর স্নান করে যদি কোনো অনাবিল গল্পমালায়
ভরপুর-প্রেমময়, সুখকর করে তোলে এই করুণ সন্ধ্যা।

ডাকপিয়নের ঝোলার দিকে চেয়ে-চেয়ে অজস্র
কাল গেছে,
অবিরাম দৃষ্টিরা দূর বহুদূর কোনো-এক থলের
মুঠির ভেতরে আবিষ্ট হয়ে থাকে।
যদি দরোজায় কড়া নাড়ে কিছু ঘুঙুরের শব্দ।

শিলালিপিদের জন্যে

সজীব জ্যোৎস্নায় ভিজে-ভিজে পুকুরের শ্যাওলা
দেখে-দেখে চলে গেছে অমলিন সময় ।
শাপলার ডানায় উড়তে উড়তে
বকুলদের বাড়ির আঙিনায় ভরে যেত প্রজাপতি ।
পুকুরঘাট আর সিঁড়িগুলোর ইট বালি ওরা জানে
এইখানে কতবার এসেছিল ভালোবাসার বিকেল ।
অনন্য সময় পার করে দেয়ার
গল্প এই বুকে জমে আছে এইখানে এই গ্রাম্য শিলালিপির অন্তরে
গুটিগুটি অক্ষরে সাজানো তোমার কথামালা—
যেন বেলফুল আজও চোখে ভাসে ।

অনেকদিন আগে

ভাপাপুলি হাতে বহুকাল শীতের সকালে
তুমি পূর্ণ করেছ কবির চাওয়া
অন্ধকার ভেদ করে
কুসংস্কারের ভাঁড় ঠেলে ঠেলে
কতবার এসেছিলে আমার জানালার পাশে।
সেইসব রাত কিংবা চাঁদের আলোতে তোমার
জেগে থাকা গল্পের ভেতর
এখনও কি রোদের ঝলক আঁকে বকুল মিস্ট্রেস।

নরকের ছায়া

চারপাশে অনেক বিলাপ। হু হু কান্নার শব্দঘোরে
নির্জন সময় বয়ে যায়।
কারা যেন গোঙাতে গোঙাতে
কুৎসিত বিহানের খেয়ায় ভেসে-ভেসে নরক সময় করে পার।
বুকে বড় বেদনার সুর ঘুরঘুর করে।

সুন্দরী সন্দীপে সেই রাত

আমার বিছানা থেকে খানিকটা দূরে লাশের বহর।
হাজারো মানুষের—
পচাগলা লাশ। খুব বিয়োগান্ত, অসহনীয় এই দৃশ্য।
সারি সারি এত মৃতের মুখ না দেখে
আমি কী করে এই নিশিতে
ঘুমাব। লাশের বাগানে কি কখনো ঘুমানো যায়?
বারবার ঘুমাতে গিয়ে—প্রতিবার
বহুগুণ জেগে আছি।

সন্দীপ এখন দলিত-মথিত-পর্যুদস্ত। সামুদ্রিক ঝড়
দানবীয় রূপে ওর বুক করে গেছে খালি।
চষে গেছে সভ্যতার প্রাণ।
স্বজনের মৃতদেহকে আঁকড়ে আছে
অগণিত মৃত গ্রামবাসী।
পিতার বুকে মাথা ঠেকিয়ে আছে আদরের ছেলে।
বঙ্গোপসাগরের খ্যাপা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে—
মায়ের বুকে মেয়ের নিথর দেহ।
অজস্র জেলের জাল ভাসছে—
সমুদ্রের জলের উপর। জেলে নেই। ভাঙা মাস্তুলের
শরীর চেপে ধরে আছেন এক চৌকিদার। তাঁর কেউ
বেঁচে নেই। মাঝি নেই, বিধ্বস্ত ট্রলারের
খণ্ড খণ্ড কাঠ, বৈঠা
সবাই মিলেমিশে এক হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।
কৃষক-কৃষাণী নেই। ভিটায় থরে-থরে শূন্যতা।
নীরব শূন্যতায় সাগরকন্যার মর্মন্তুদ আহাজারির
স্বর ক্ষণে-ক্ষণে ভেসে আসছে।
গোয়ালবাসী নেই। পাখিরা সেই। নীড় নেই।
ওদের বহর নেই।
সব জীবনই গেছে ক্ষয়ে, ঝড়ের রাতে। ভীষণ তাণ্ডবে
পৃথিবীর অপার সুন্দরী সন্দীপে এখন পরাজিত যোদ্ধা।
তার বৃক্ষরাজি নেই।
শিশুদের কলকাকলি নেই। ওরা নেই। ওদের রঙিন
শার্ট নেই। বোবা হয়ে আছে গ্রামের পর গ্রাম।

এই হেমন্তে

শীতল বাতাসে হেমন্ত মেলে দিয়েছে তার পুরনো দুরন্ত কালের পাখা।
বৃক্ষরা হেলেদুলে—
আমার ঘরের ভেতর জমিয়ে তুলছে খুব শান্তিময় নিশ্বাস। খ্যাপা
বর্ষার ডুবোডুবো–
তলানি থেকে ভেসে ওঠে কোমল হেমন্ত—তার বুক খুলে দিয়েছে
সকল সুখের—
দিগন্তে। তার বয়ে চলায় চারপাশ জুড়ে নেমে আসছে স্বর্গের কুহুতান।
তন্ময় তানের
সুর প্রাণ জুড়িয়ে যায় তাপিত পৃথিবীর নীল জ্যোৎস্নায়। বিরহে ভারে
নুয়ে-পড়া তানপুরার দুয়ার
গেছে খুলে। এই সেই হেমন্ত সন্ন্যাস—বহুকাল সে ঘুমিয়ে পড়েছিল
গ্রিন হাউজের
বিষাক্ত বহতায়। তার বর্ণময় মুখ, সুন্দরী ছায়ার দুন্দুভি-ঢোলের বাদন
নিয়ে কী সুরেলা–
কী বিস্ময়কর স্বর্গীয় আবাহন রেখে যায় আজ। কতকাল তোমার
বৃষ্টিভেজা হৃদয়ে—
শাদা বকের ওড়াউড়ি দেখা হয়নি। শেষরাতে তোমার আহ্বানে শীত
ঋতু এসে—
কতকাল পর উঁকিঝুঁকি খেলে যায়। হিজল গাছ, নতুন পাতায় সেজে-
ওঠা লাউলতা—
আর ভালোবাসার বিকেলের জন্য অপেক্ষমাণ সারি সারি দুঃখেরা
আজ বড় সুখী।
তোমার কোমল বাতাসের বুক চেপে আবার জেগে উঠেছে ঘুমিয়ে-
পড়া শস্যকাল।
তোমার জন্যে কতকাল এইখানে পাখিরা গায়নি দুপুর-পাগল-করা
বয়াতি সঙ্গিত।
অবশেষে তোমার মায়াময়ী ঘুম ভাঙল। তুমি এলে, যেন সাগরের
বুক থেকে সব
কোমল শ্যাওলা কাঁধে নিয়ে। তোমার নৃত্যঝড়ের তোড়ে পৃথিবী
তার কষ্টের পাতা উলটে ফেলে ভুলে যাচ্ছে—
রুষ্ট হাহাকার। ধানকাটা কাঁচির আলসেমি ভেঙে, খড়ের ঘ্রাণের
বিছানে নেচে-নেচে তুমি এলে হে হেমন্ত।

রাঙা সিঁড়ি

ছেউরিয়া যাই, না কি কেউ
ডেকে নিয়ে যায় আমায়।
তবু যাই। বারবার যাই।
পেছনে পড়ে রয় ষাটনল—
লেংটার মেলা। পড়ে রয়
সোনাকান্দা কেল্লার
খসে-পড়া রাঙা সিঁড়ি।
পড়ে রয় পদ্মার পাড়ে
জগদীশচন্দ্র বসুর বাগান—
বাড়ি। পেছনে পড়ে রয়
কদমরসুল দরগা, পানাম—
মেঘনার আলুথালু জনপদ।
এইভাবে লালবাগ,
ঘুমন্ত মোগল রাজত্ব।
পেছনে ডাকে নিঃশেষিত
দুর্মর হাজীগঞ্জ কেল্লা।
একাত্তরের যুদ্ধে বুড়িগঙ্গার
ওপাড়ে খসে-পড়া সাহসী
বিমানের পাখা। এইভাবে
ডাকে সদরঘাটে সাজানো—
নৌকার বহর—শ্যামবাজারে
হাসিমুখী কুলির ভোর।

ছেউরিয়া থেকে ষাটনল।
যাই। বারবার যাই।
মাঝখানে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধের মুখ,
সাটুরিয়ায় কালু শাহ'র আস্তানা।
শহীদমিনারের ছায়ার
ভেতর জব্বার-রফিক,
পাশে জেগে আছেন তেল শাহ।
জয়নুলের সংগ্রহ ভাতের থালা—
পানদানি চুনের থলে—প্রাচীন
হুক্কো-মাতলা ঘুমায় সোনারগাঁয়।

যখন বটমূলে পৌষমেলা ভেঙে দেয়া হয়

রমনার বটমূলে পৌষমেলা যখন বুটের আঘাতে ভেঙে যায়,
বৃক্ষেরা তখন ছিল স্তব্ধ-নির্বাক। ভাষাহীন মানব-প্রকৃতি, কষ্টে
হায় হায় করে উঠেছিল সবুজ পার্কের জমিনে। তাদের অন্তর
থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল—এ কেমন অসুর এল এইখানে আজ।
ভাপাপুলির উৎসব যারা সহ্য করতে পারে না, যারা লাঠির
তাণ্ডবে রুদ্ধ করল ইউসুফ আলী খানের হৃদয়-জয়-করা
সরোদ বাদন।
যারা পাষাণী থাবায় ফিরোজ খানের সেতারের সুর গ্রাস
করল এই শান্ত ভোরে,
আমি এই প্রেমময় শীতের সকালে হারানো সেই সুরকে
লাল পতাকায় জড়িয়ে দিয়ে বলেছি,
নির্মমতা কখনো গানের বাণীকে
নির্জীব করতে পারে না। বন্দুকের নল আর লাঠির শাসন
ঠিকানা নয়, জগতের কামনা নয়।

যারা পৌষমেলার জীবন—খেজুররসে ভরা মাটির কলসকে
লাথি মেরে ভেঙেছে—তাদের আমি জালিম বলছি।
যারা পাটিশাপটা'র ঐতিহ্যঘেরা এই ভোরে লণ্ডভণ্ড করেছে
খোঁপার ফুল, দোতারার ঝংকার,
যারা রবি ঠাকুরের 'আর নাই সে নাই যে দেরি' সঙ্গীতকে
শুনতে চায়নি, যারা 'একি মায়া লুকাও কায়া জীর্ণ শীতে
সাজে'র উদ্ভাষণ বোঝে না—
তারা তো এই জনপদের সংস্কৃতির জল্লাদ।
তাদের আমি কৃষ্টির ঘাতক বলছি। ভোরের বাতাস এই
পেষণের একান্ত সাক্ষী হয়ে থাকল। বটমূলের প্রতিটি ঘাস,
হাজারো পিপিলিকা মাটির কণা সাক্ষী হয় থাকল।
কী বিস্ময়, কী অসহনীয় বর্বরতা দেখাল ওরা,
ভাওয়াইয়া শিল্পী সফিউল রাজাকে ওরা গাইতে দিল না
'কয়সার আলো চাউল পারিয়ে সোনা মোর বানিয়ে
করো আটা'।

ভোরের ছন্দময় পৌষ উৎসব এইখানে
উচ্ছন্নতায় মাতম করছে—ওরা কারা?
কারা এই সভ্যতাখেকো ডাইনোসর।
যারা বাউল শিল্পীর মুখে রুদ্ধ করল পিঠার গান। বিপন্ন
করল মুছিগুড়ের শিরনি আর বাতাসা'র উন্মত্ত সময়।
ওরা কারা?

কবি জেগে ওঠো

[কবি শামসুর রাহমানকে হাসপাতালের বিছানায় দেখে]

হাসপাতালের রোগশয্যায় তুমি একা নও,
সারাজাতি তোমার সঙ্গে রয়েছে এইখানে।
প্রাণভিক্ষা চাইছে তোমার
তুমি না থাকলে, পৃথিবীর বুক থেকে
একটি বিশাল আলোকমালা যাবে নিভে।
সুসভ্য বিশ্বের গুণ টানার বহর থেকে—
দৃশ্যহীন হয়ে যাবে,
এক সর্বশ্রেষ্ঠ মাঝি।
বিশ্ব কাব্যসভা তছনছ হয়ে যাবে,
কবি তুমি যদি ঝলমল ফতুয়া জড়িয়ে
না থাকো দুর্বিনীত মানুষের জলসায়।
আজরাইল, আমি তোমার কাছে আমার
প্রাণের চেয়েও
বিপুল প্রিয় এই সন্ন্যাসের প্রাণভিক্ষা চাই।
তুমি পিছনে ফিরে যাও।
যে-ঈশ্বর, যে-আল্লাহ্, যে-ভগবান—
তোমাকে কবিতার শ্রেষ্ঠ কারিগরের দিকে—
করেছে সওয়ার।
আমি তার কাছে এই সূর্যের প্রাণভিক্ষা চাই।
তুমি এসো না, এইখানে এসো না জান কবচের দূত।
তুমি ফিরে যাও।

তুমি সৃষ্টিকর্তাকে বলো,
এই পৃথিবী তার সাবলীল যোদ্ধার দীর্ঘায়ু আগামীকাল চায়।
বলো, সে চলে গেলে এইখানে মুক্তিযুদ্ধ, ভাষার সংগ্রাম,
স্বাধীনতা, অসহায় পথচারী, নিঃস্ব, দৃষ্টিহীন, খাদ্যহীন
মানবের জন্যে কে লিখবে মুক্তির সাহসী শব্দমালা?
সে না থাকলে 'বন্দি শিবির থেকে' কে আর করবে
হায়েনা-কাঁপানো গর্জন?
কে লিখবে, 'স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অবিনাশী গান?'
কে দাবিয়ে দেবে 'আসাদের শার্ট'?
স্বৈরাচারের কাঁপন ধরাতে 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'
কে করবে উচ্চকিত উচ্চারণ?

আমি পৃথিবীর সব মানুষের কাছে হাতজোড় করে বলছি,
ভাইসব আপনারা ম্রিয়মাণ পৃথিবীর কবি শামসুর রাহমানের
রোগমুক্তির প্রার্থনা করুন ।

ঈশ্বর, তুমি আমাদের বেদনার চাওয়াটুকু কবুল করো ।
আমি প্রাণভিক্ষা চাইছি বাঙালির চিরকালের এই স্বজনের ।
যার ছায়ায় এইখানে বেড়ে উঠেছে ভালোবাসার স্বর্গ ।
সে চলে গেলে ফের এইখানে ফণা তুলবে ধর্ম, বর্ণচোরা—
অসম্প্রীতির কুৎসিত নাগিণী ।
পদ্মায় স্রোতের ঘোর যাবে থেমে,
টেম্পস নদীর তীর থেকে হারিয়ে যাবে চিরায়ত প্রজাপতি ।
নেভার কিনারে হার্মিটাস জাদুঘরে মোনালিসার ক্যানভাস
চিৎকার করে বলতে থাকবে 'মাতাল ঋত্বিক'-এর গল্প ।
ক্রেমলিন থেকে মহামতি লেনিন উঠে আসবেন বিশ্বরাজপথে ।
হাসপাতালের রোগশয্যায় তুমি একা নও চিরকালের অদম্য কবি ।
তোমার শিয়রে পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের হাহাকার
শুনতে পাচ্ছি । ঈশ্বর—তুমি—
তাদের কান্নার জল মুছে দাও ।

চাঁদমারির বস্তি যখন ভেঙে ফেলা হয়

মায়াবী ছায়ায় বেশিদিন টিকতে পারল না ওরা।
কিছু দৈত্য এসে ছিনতাই করে নিয়ে গেল
ওদের ভাতের থালা। বসতবাড়ি।
এই যে দস্যিপনা, এই যে লোকালয় ছুঁয়ে বেলেল্লাপনা-
হুলফোটানো বেলা—
কত আর গ্রহণ করা যায়। তা তো জানে না—
এইকালের শাসক।
জানে না বঙ্গভবনের তালগাছ।
জানে না যৌথবাহিনীর ট্যাংক,
জানে না লুটপাট-করা রাজনৈতিক দলের ম্যাডাম,
জানে না স্বাধীনতাবিরোধী জল্লাদ জামাতের
দোসর কবি,
জানে না সাধারণ সাংবাদিকের কাঁধে কাঁঠাল ভেঙে
খাওয়া দুশ্চরিত্রের অপঃ সাংবাদিক, পুঁজিপতি
জানে না ন্যাকা শিল্পপতি।
জানে না তুখোর সাম্প্রদায়িক হয়েও বিপুল
অসাম্প্রদায়িকতার ঢোল বাজানো
কবি, গল্পকার কিংবা জাতিঘাতি শিল্পপতি।

কিছু কুৎসিত দৈত্য এসে আজ ভোরে এইখানে
ভেঙে দিল রিকশাওয়ালা-শ্রমিক আর
বস্তিবাসির আস্তানা।
তারপর—
ঘটিবাটি, ছনের বেড়া, শিশুর ময়লা জামা, আর
খেলার পুতুল, সিলভারের পাতিল ঠেলাগাড়িতে
তুলে ওরা চলল ফরিদপুর, রংপুর আর
আপন আপন ঠিকানায়।
কি এমন অন্যায় করেছিল ওরা—যার জন্যে
ঢেড়ার ছাউনিতে চলল বুলডোজার,
চলল লাঠিপেটা, চলল বিছানা উপড়ে ফেলা।

সেই শ্রাবণ সেই সাহস

বিলের জলেতে জলকেলি খেলার জীবন, সে
ছিল ভালো। বহু—
বর্ষার উন্মাদ জলস্রোত নিয়ে আসত—
জীবন রাঙানো
প্রকৃতির অপরূপ। মায়াবী ঘুঘুরা
উড়ে যেত সুন্দরী
শাপলা বাগানের সিঁড়ি বেয়ে।
শাদা বকের মিছিল শরীর হেলিয়ে দেখে
নিত পৃথিবীর বুক—
স্বর্গের দৃষ্টি মেলে ওরা উড়ে যেত
এক বিল থেকে
আরেক জলাশয়ে। ঘুরে বেড়াত
মাছরাঙার বহর।
শ্রাবণের বৃষ্টি—বহুকাল ধরে আমায় ছোট্ট
শিশুটি করে রেখেছে।
কোনো-এক চলন বিলের
শীতল বাতাসের
গন্ধ ধারণ করে—এখনও দাঁড়িয়ে
আছি, একই তালে।
এখনও মরমি কৃষাণীর কাঁচির
ক্যাচক্যাচ শব্দে
ধান কাটার শব্দ শুনতে পাই। এ তো
আজন্ম জাদুকরা
কৈশোরের ঘুমভাঙা প্রহরের ধারাপাত—
নামতা পড়া গ্রন্থ।

বিলের জলেতে সাহসী মাছেদের সাথে গল্প
করার জীবন ছিল ভালো।

কষ্টগুলো আছে

মুখগুলো কাঁপা কাঁপা দেখি, প্রতিভোরেই দেখি।
মনে হয় কী যেন তার হারিয়ে গেছে, নেই।
চোখ যেন পরাজিত আয়না। দৃষ্টি না ফুরাতেই
কারা যেন নিয়ে গেছে সামান্য এগিয়ে যাওয়ার
দৃষ্টি। দৃষ্টিও চুরি হয়ে যায়—তা তো বলে দিচ্ছে
তোমাদের মনের ভাষাটুকু, টকটকে প্রতিবাদে।
কষ্টের রাত বয়ে গেলে আবার কষ্টের দিনই
ফিরে আসে। রাতকষ্ট দিনকষ্ট পুরোটা কালই
কষ্ট, সেই কবে থেকে দুর্মর কষ্টের বাহারে
ঢেকেঢুকে আছি। চুরমার হয়ে গেছি, নেই
কী যেন নেই। কী কী নেই, তা কষ্টই জানে।

মুখগুলো মরা-মরা দেখি, প্রতিটি বেলায় দেখি,
মনে হয় অনেক কিছুই নেই। কষ্টগুলো আছে।

হায়েনা

কিসের নামতা শেখায় ওরা, তা কি জানো?
সাম্প্রদায়িকতা চায়—ওদের কষে আঘাত হানো।
রাজাকারি গন্ধ কিন্তু কোনোকালেই উবে যায় না,
জাতি ভুলবে না একথা, ওরা যে ঘাতক হায়েনা।

যতই টাকা বানাও, একদিন বিচার তোদের হবেই,
যতই ব্যাংক গড়ো-না কেন, ফাঁসি ওদের হবেই।
স্বাধীনতা বিক্রি হবে না টাকার কাছে কোনোদিন,
জামায়াত-শিবির, সাম্প্রদায়িককে হেঁকে থুথু দিন।

চিরকাল পায়ের নিচে এই ঘাতক রাখবে, দেবে লাথি,
একাত্তরে ওরা বাঙালি মেরেছে, দেখাও সেই রক্তঘাতী।
করো ওদের বহিষ্কার, কুত্তাদের মাথা নুইয়ে রাখো,
প্রয়োজনে ওদের বিরুদ্ধে ধরো অস্ত্র, সাথিদের ডাকো।

কবিতা ২০০৭

পৃথিবীর সব বিষাদ এসে নোঙর করেছে এইখানে আজ।
এর কোনো রঙ নেই। কোনো ভাষা নেই। নেই দৃশ্যমান
কোনো চাহনির স্রোত।
ক্ষণে-ক্ষণে সাবাড় করছে সাজানো গলিপথ, বস্তির ঠিকানা
গ্রাম্য হাটবাজার।
গঙ্গার চিরচেনা বয়ে চলায় কী এক হাঙরের প্রচ্ছায়া গিলে
নিচ্ছে পৌরাণিক জীবন।
নিমেষেই দাঁতালো ভাঙাখোঁড়া শব্দের বিচ্ছিরি গোগ্রাস—
নিস্তেজ করে দিচ্ছে বিহঙ্গের বসবাস।
কেউ কিছুই বলছে না।
অমিত রাত্রির বুক চিরে নেমে আসছে বুটের দাপটি নোংরা
হুংকার, তার পরও কেউ কিছু বলছে না।

রাজনীতি ভাঙছে, ঘর পুড়ছে, উজাড় হচ্ছে জামবীথি-লাবণ্য
সরুপথ-রাখালের মুক্ত আকাশ।
বিশ্বাসী নেতা অবিশ্বাসীর খোঁয়াড়ে নিচ্ছেন ঠাঁই। এ কেমন
বিনাশী কালের ভেতর
চলেছি আমরা। যা চাইনি, তাই এসে ভিড় করছে সমগ্র
সত্তাজুড়ে।
তার পরও সন্ধ্যার ধূপবাতির মহড়ায় জাগছে না আরাধনা,
কারো মুখে কোনো শব্দ নেই।
মর্মরথ দেখে কারো বুক একবারও কেঁপে ওঠা নেই।
রাজপথ কাঁদছে, কারো চোখে ভাসছে না পুরাকীর্তি
হারানোর প্রতিবাদী জল।

এইখানে আজ—
কিসের এমন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার প্রস্তুতি। কী এমন বীভৎস
তাণ্ডব অপেক্ষা করছে শান্ত মায়াবী জনারণ্যের মাঝে।
তা হলে কি আমার সাজানো এই প্রান্তর ছেয়ে যাবে
করুণ মরুময় উদরের ছন্নছাড়া আস্তানায়।

একটা রুটি এক টাকার চা

প্লাস্টিকের
বিছানায়
শুয়ে ছেঁড়া
কাঁথা গায়
এক বুড়ো,
লুঙ্গি সেলাই
করছেন
অবিরাম।
ঠিকানা
জানা নেই।
কবে তার
নদী ভাঙে,
কখন সে চলে
এসেছে শহরের
এই বিষময়
আঙিনায়।
কমলাপুর স্টেশন।
তুমি খুব
মানবদরদি,
ঘরহীন মানুষ
ঘুমাচ্ছে
তোমার বুকে।
একটা রুটি,
এক টাকার চা,
পাঁচ টাকার
বিনিময়ে
রাত
ঘুমানো।
ভোরে ট্রেনের
হুইসেল,
তারপর—
মাটির
সন্তান,
মাটিতেই মিশে যাওয়া। মাটিতেই ঘর, মাটির ভেতর ঘুমিয়ে পড়া।

বুক পেতে দিয়েছিলে
[শফিকুল আজিজ মুকুল স্মরণে]

বুক পেতে দিয়েছিলে পৃথিবীর ছায়ায় ছায়ায়
বেড়ে ওঠা সমগ্র দিগন্তে।
মানুষের নিশ্বাসে সন্তাপে, তাবৎ ধুলোর
কষ্টে-চাহনিতে, বিরান মাঠের
শস্যের বেড়ায় রেখেছিলে দরদি অন্তর।
কোথায় নেই তোমার ছুঁয়ে
যাওয়া আকাশসমান বায়ুর শিহরন?
যেদিকে রাখছি এই শোকাক্রান্ত
চোখ, সেখানেই তোমার সমুদ্র-জয়-করা
বুদ্ধিদীপ্ত-ক্লান্তিহীন জীবনের
টের পাই। সবখানেই তোমার মানবিক-নিমগ্ন
দিনরাত্রি, শ্রান্তিহীন-সরব
পদভার জেগে ওঠে। পদ্মা-যমুনা-বুড়িগঙ্গা
সব নদী সমগ্র কোলাহল
এখনও চেয়ে আছে তোমার প্রাণান্ত—
ভালোবাসার একটুখানি বিকেল
কিংবা কয়েকটি অনবদ্য মুহূর্ত পাওয়ার নেশায়।
এখনও চারপাশে
অবিরাম তোমার সাহসী হাত এসে—
কী বিস্ময়ে কী অহংকারে রেখে
যায়—দুর্বিনীত সময়ের চারুবাদ্য।
এখনও এইখানে প্রতিটি প্রহর তোমার
ছন্দময় জাদুকরি বয়ে চলার দিকে
কী দারুণ অপেক্ষায়। এখনও এইখানে
অসহায়-দুর্গতির পেষণ। তাড়া-খাওয়া
কাতর মানবিক সময় চায়—
তোমার পথে-পথে কিছু-কিছু স্বস্তি লতা।
তুমি তো মুক্ত পৃথিবীর কলকাকলিময় শান্তির সন্ন্যাস।

বুক পেতে দিয়েছিলে নগর-পল্লীর বেদনাকাতর মানুষ—পৃথিবীর
সুন্দর সভ্যতার জন্যে। এখনও সবখানে তোমায় টের পাই।

এই বন্দিখানা একদিন থাকবে না

জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের নিন্দাভাষ্য

আপনি যেদিন কারাগারে প্রবেশ করলেন। বাংলাদেশ সেদিন
থেকেই আপনার গ্রেফতারের সরব-প্রতিবাদে
জেলখানায় নিয়েছে ঠাঁই।
আপনি কারাগারে গেলেন, মানুষের সুবিচার গেল কারাগারে।
দিনমজুরের ভাতের হাঁড়ি নিমিষেই গেল বন্দিশালায়।
শহর-বন্দর, মাঠের ফসল—প্রতিটি গ্রামের নিশ্বাস গেল জেলে।
প্রকৃতির সব জীবন—সভ্যপাতার মিছিল গেল কঠোর নির্বাসনে।
সাগরের প্রতিফোঁটা জল, মাতৃভূমির প্রাণ—অসহায় মানুষের
ঠিকানা হলো বুটের তলায়।
ওরা ভাবল না—আপনাকে বন্দি করা মানে স্বাধীনতার
প্রহরীকে বন্দি করা। সব নাগরিকের অন্তর-এ মাটির
পাহারাদারকে বন্দি করা।
ওরা ভাবল না, আপনাকে গ্রেফতার করা মানে
স্বাধীন বাঙালি জাতির পতাকার যোদ্ধার বন্দি হয়ে যাওয়া।
লাল সবুজ রঙের ওড়াউড়ি বন্দি হয়ে যাওয়া।

ওরা এত কুৎসিত—এ-মাটির বুকভরা সাহসকে
ওরা চিনল না।
ওরা এত নির্বোধ—বাঙালির প্রাণভ্রমর, মুক্তির প্রতীককে
ওরা চিনল না।
ওরা এত অন্ধকার, এত সর্বনাশা—মুক্তিযুদ্ধের
বাতিঘরকে ওরা জানে না।
এত দুঃশাসন, এত আবর্জনা—ওদের আমি অভিশাপ দিচ্ছি
এই ভেবে—ওরা দুর্নীতি বন্ধের লেবাসে হাজার গুণ দুর্নীতি
করছে সারাক্ষণ। আদালতের সংবিধান ঘুম পাড়িয়ে রেখে
এখানে এখন গায়ের জোরে
অবিচারকে বিচারের নামে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে হরহামেশা।
এইখানে এখন আপনার ছায়ার জন্যে পাখিরাও চিৎকার
করে ওঠে।
হে নেতা, আপনাকে নির্বাসনে নিয়ে
ওরা জাতির আকাশে নিয়ে এল কালোমেঘের কাল।
এ বড়ই অসহনীয়—খুব বেশি কষ্টে আছে
বাঙালি মাছে-ভাতে।
হায় নেতা—আপনি নেই—এই দুঃখের ভারে ঘুমাতে পারে না

বাংলাদেশ। আপনার
কারাবন্দির পর গোলার চাল হয়ে গেল নিঃশেষ।
জাতির গোলায় এখন মর্যাদা নেই, তেল নেই, কৃষকের মুখে
নেই সেই শান্তির গজল। এইখানে এখন
চাল আমদানি করতে হয় শ্রমিকের ঘামঝড়া
চাকা-ঘোরানো রক্তাক্ত বর্ণের টাকায়।
আপনাকে গ্রেফতার করে যারা ঘরে-ঘরে ক্ষুধার পর্বত গড়ে
তুলছে—চালকেনার
লাইনে দাঁড়িয়ে তারা আপনার গ্রেফতারের ধিক্কার জানাচ্ছে।

আপনাকে যেদিন জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হলো,
সে-রাতে আকাশে জাগেনি তারার মেলা।
সুগন্ধা ঘুমায়নি। অনিদ্রায় ছিল সে-রাতে এই দেশ।
অসহায় মানুষের ঢল নেমেছিল ঢাকার পথে-পথে।
ঢাকার ধুলোবালিও হায় হায় করে কেঁদে উঠেছিল।
বনাঞ্চল জুড়ে জীবজন্তুরা করেনি আহার।
বাজেনি রাখালের বাঁশি।
আপনার শূন্যতায়–
গণতন্ত্র পিষে মারা হলো বুটের তলায়।
এ তো বাংলাদেশ নয়।
যে-স্বৈরাচার আপনাকে লোকালয় থেকে নিয়ে গেছে বন্দিত্ব-
গহনে, নির্বাসিত গুহায়,
ওরা জানে না—এই মুখ এই প্রান্তরের
মায়াময় শেকড়।

জানি, আপনার অসুস্থতাকে নিয়ে ওরা ক্ষমার অযোগ্য পাপে
ডুবে আছে। গণতান্ত্রিক মানুষ একদিন এই পাপের
উসুল আদায় করে নেবে।
জানি, নির্জন কারাগারে প্রতিদিন আপনার দুচোখ তাকিয়ে
রয় অভাবী জনতার দিকে।
টুঙ্গিপাড়ার দিকে—যেখানে সুনিবিড় ঘুমিয়ে আছেন
জাতির জনক।
আপনার কারাগার এখন পনেরো কোটি মানুষের কারাগার
হয়ে আছে।
এই বন্দিখানা একদিন জনতার মিছিলের তোড়ে তছনছ
হয়ে যাবে। ছারখার হয়ে যাবে! নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কেউ জানে না

কবে কোন ঝড়ের রাতে লোকটা এসেছিল এইখানে।
বর্ষার প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তার কতকাল গেছে
কষ্টের রাত চিবিয়ে না-খাওয়া ভোরের রোদে।
ট্রেনের পোড়া ডিজেলের ধোঁয়া
খুবলে নিয়েছে তার দেহ-মন, কেড়ে নিয়েছে
আপনজন ঘর।
এইসব দুঃখঘেরা স্টেশনের দিকে আজকাল আমি
তাকাতে পারি না।
ছেঁড়া কাঁথার ভেতর কতকাল নুয়ে আছে স্বপ্নের সভ্যতা
তা কেউ জানে না।
আমার মতো কেউ কেনোদিন তাকায়নি এই স্টেশনের
খোলা গৃহ-ভাঙা সংসারের দিকে।
কেউ দেখেনি এই প্ল্যাটফর্মের নিবিড় দুঃখের কাল।

পনেরো আগস্টের কবিতা

ঐসব ঘাসের আমি ফাঁসি চাই, সেদিন যেসব ঘাস তোমার ঘাতককে ওদের ওপর
দিয়ে বত্রিশ নম্বর বাড়িতে যেতে সহায়তা করেছিল।
না না, আমি তোমার ঘাতকের কল্লা চাই না। ওদের নাক-কান, চোখ, বুকের
পশম যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে পড়বে তখন বুঝে নেব—
তোমাকে হত্যা করে ওদের পৃথিবী অন্ধকারে লুকিয়ে গেছে। ওদের বংশধর
লজ্জায়-অপমানে-দুঃখে গ্লানিতে পচে পচে পিচঢালা-
পথের ধূলিতে যাচ্ছে মিশে। আর এইসব বন্য শূকরের কাল মনে করে আকাশের
তারা ওদের বসতভিটায় থু থু ফেলে গালমন্দ করছে।
না না, আমি বত্রিশ নম্বর বাড়ির দেয়াল-ছিদ্র-করা বুলেটের কোনো বিচার চাই
না। তোমার বুক যারা ঝাঁজরা করে পৃথিবীকে কাঁদাল,
জেলখানার বিষাক্ত মাছি, খুব ছোট পোকা, লেজ-নাড়া টিকটিকিই তোমার
ঘাতকের অন্তরে সারাক্ষণ হুল বসিয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালাচ্ছে—
আমরা তা কতটুকু জানি। তোমার ঘাতকদের কেউ-কেউ বিশ্বের পথে-পথে
পালিয়ে বেড়ায়—ওদের লানত আমরা কতটুকু জানি।

ঐসব জোনাকি পোকার আমি ফাঁসি চাই, যারা শত্রুর পদচ্ছাপ দেখেও তোমার
আঙিনায় জ্বালিয়ে দেয়নি আলোর ফোয়ারা, বলেনি—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে
রক্ষা করো, বলেনি এ-মাটির পতাকাকে রক্ষা করো।

জলমহালের দুঃখ

জলমহাল ঘুমিয়ে থাকো। কালোজলের বিলাপ
শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ো।
মাছরাঙা উপোসে আছে, কতটুকু উপোসে আছে
দেখো, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে যাও।
রাতের অন্ধকারে হাত
রেখে জেনে নাও——কোন সে দানব চুরি করে নেয়.
তোমার প্রকৃতি——সম্পন্ন জীবনের পাঁচালি——বনান্তর।

জলমহাল ঘুমাও, ঘুমের ভেতর উচ্ছন্ন থাবার নখ,
গিরিগিটি মহাজনের হাঙরমুখ আবিষ্কার করো।

মুজিব-লেনিন স্মরণে স্কাইনোভা

ক্রেমলিনের উঠোনে রাশিয়ান এক মা দাঁড়িয়ে। নাম স্কাইনোভা।
মহামতি লেনিনকে পাহারারত সৈনিকদের ডিউটি-বদলের দৃশ্য
দেখছিলেন। পাশেই বিভিন্ন দেশ থেকে আসা কয়েকশত পর্যটক
গল্পেসল্পে মগ্ন বিশাল বহরে। লেনিনকে দেখার জন্যে কাকভোর
থেকে অপেক্ষায়। পাশেই রাশিয়ার সংসদ ভবনে লেনিন শুয়ে।
ভবনের চারপাশ ঘিরে আছে সশস্ত্র টেগড়া সৈনিক। সামরিক
কায়দায় তারা ডিউটি বদল করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে—
স্কাইনোভা প্রশ্ন করেন, কোন দেশ থেকে এসেছ? বাংলাদেশ।
মাই গড! তুমি শেখ মুজিবের দেশের মানুষ? খুব ভালো। তোমরা
কেমন জাতি, বিশ্বের যে-মহান নেতা তোমার দেশ স্বাধীন করল,
তোমরা তাঁকেই মেরে ফেললে! তোমরা কেমন মানুষ! কী করে
এত বড় স্থপতিকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিলে? ওহ্, বড়
অন্যায়। এ হয় না। তারপর রাশিয়ান রমণী থেমে যান। তাঁর মুখ
থেকে আর কোনো উচ্চারণই হলো না। স্কাইনোভা ধীরে ধীরে
হাঁটছেন। আমি হাঁটছি। আমার বন্ধু শাহজাহান সরদার হাঁটছেন।
আমরা ছয়জন বাঙালি সাংবাদিক হাঁটছি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি
ক্রেমলিন সামরিক জাদুঘরের দিকে। এখানেই শান্তির দূত লেনিন
অপেক্ষা করছেন নানা রঙের নানান দেশের মানুষের জন্যে। যাঁরা
তাঁকেই দেখার আশায় একটু একটু করে এগিয়ে আসছেন। এক
সময় আমরা ক্রেমলিন ভবনের দরোজার পাশে এসে দাঁড়াই।
পেছনে তখনও কয়েকশত মানুষের লাইন। এ-সময় স্কাইনোভা
আমাদের নিয়ে ঢুকলেন ক্রেমলিন ভবনের ভেতর। ঘুরে-ঘুরে
বিভিন্ন পথ ফেলে কয়েকটি কক্ষ পেছনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি।
দয়ালু স্কাইনোভা। তিনি আমাকে ক্রেমলিন ভবনে কোথায় কী
আছে, তা একে-একে স্মরণ করিয়ে দেন। এসে গেছি। তিনি বললেন।
গভীর নীরবতা পালন করবে এইখানে। কোনো শব্দ নয়। কথা নয়।
কমরেডকে দেখে কোনো উক্তি করা যাবে না। দেখার সময়গুলো
বোবার মতোই কাটাতে হবে। স্কাইনোভার কথা শুনছি, হঠাৎ
পাহারাদার এক সৈনিক এসে হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দেন আমাকে।
আমার সামনে সবাই বাঙালি। পেছনে স্কাইনোভা। সবাই ভেতরে
ঢুকলেন। তারপর অন্য এক কক্ষ। ডান দিকে তাকাতেই দশ-
এগারো ফুট লম্বা কাচঘর। কক্ষের ভেতর দাঁড়ানোর পর চোখ যায়
বামে, এ যে লেলিনের মুখ শাদা বস্ত্রের ওপর মাথা। বিশ্বের
নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানব শুয়ে আছেন এইখানে। বারা
বার তাঁকে দেখছি। দুচোখ মেলে প্রাণভরে লেনিনকে দেখছি।

পায়ে কালো শু। কালো কোট। কালো প্যান্ট। শাদা শার্ট। কালো টাই। প্রতিকৃতি দেখে যে-লেনিন আমার কিশোরবেলাকে রঙিন করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন, সে-ই তো সামনে। দুহাত মেলে দিয়ে দুপা সামনে বাড়িয়ে খুব আরামে ঘুমোচ্ছেন ভ ই লেনিন। হাতের নখগুলো ছায়া-ছায়া সবুজের পদার্থে স্বাভাবিক রং করেছে ম্লান। ফেঞ্চকাট দাড়ি। ঘনকালো চুল। দুটো চোখ আস্তে করে বুজে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন মহামতি। এভাবে তাঁর দেহকে আবৃত্তি করতে করতে কক্ষ থেকে যখন বের হয়ে যাচ্ছি—আবার তাঁর পুরো শরীর দেখে নিই বারবার—বহুবার, বারবার তাঁকে দেখতে দেখতে কাচের ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে আসি। তারপর দীর্ঘক্ষণ আমি আর কিছুই ভাবিনি। শুধু লেনিনের মুখ, দেহ, চোখ ক্ষণে-ক্ষণে মনে এনে তাঁকে বুকের ভেতর জমা করে রাখি। স্কাইনোভা তারপর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যান ক্রেমলিন ভবনের পাশে পড়ে থাকা মস্কোর ঘন্টার কাছে। যেতে-যেতে স্কাইনোভার মুখ আবার খুলল। শেখ মুজিব আর লেনিন একই পৃথিবীর একই সংগ্রামের নায়ক। লেনিন আমাদের দিয়েছেন রাশিয়া আর শ্রমিক-জনতার মুক্ত পৃথিবী। তোমাদের মুজিবও বহুকাল সংগ্রাম করে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন করেছেন বাংলাদেশ। এইসব মৃত্যুহীন প্রাণ। তাঁদের গড়া পৃথিবীতেই মানবতা উড্ডীন রবে বহুকাল। অজস্র প্রহর জুড়ে মানুষ তাঁদের নামে জেগে থাকবে শান্তির বিশ্ব গড়বার নেশায়। অসাম্প্রদায়িক-সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার জন্যে।

একটি প্রাইভেট কোম্পানি কবিতা

কোনো কোনো পথ আছে শুধুই আমার। কোনো কোনো নদী
আমার সঙ্গেই হেঁটে যায়—
বেতবন কেটে কেটে।
যতদূর যাই—কিছু হিজল, ঘুঘুর ডাক, তালের গন্ধ এসে
ভিড় জমায় এইখানে।
কিছু-কিছু মেঘ শুধুই আমার। যতদূর যাই, ওরাও
আকাশ ভেঙে নেমে
আসে। কোনো কোনো অভিমান, তা শুধুই আমার।

দুরা ভাষা এবং সোমা দেবী

নেপালের সোমা দেবী যে-ভাষায় কথা বলেন–
তার নাম 'দুরা'।
দেবী মরে গেলে 'দুরা'ও যাবে মরে। পৃথিবী
থেকে বিদায় নেবে একটি ভাষা। একটি জাতির
প্রাণ যাবে নিভে।
পৃথিবী হারিয়ে ফেলবে এক মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব।
দুরা তার সব হারিয়ে এখন সোমা দেবীকে নিয়েই
টিকে আছে। তাঁর
পরিবারের অন্য কেউ এ-ভাষায় কথা
বলতে পারেন না।
নেপালের অন্য কোনো মানুষও
এখন জানে না এ ভাষা।
বিরাশি বছরের সোমা এ-ভাষার গান, পুঁথি, রস
লোকজ সংস্কৃতির একমাত্র শিকড়।
তিনি এখন একটি ভাষার, জাতির একক ঠিকানা।
রোগশয্যায় বাঁচার লড়াইয়ে আছে সোমা দেবী।
পৃথিবী থেকে সাড়ে সাতশত দুরা
সাড়ে সাতশত ভাষা কি যায়নি
ঝরে! গেছে, তা গেছে।
সাড়ে সাতশো জাতিও গেছে।
একটি ভাষা যায়, এক জাতিও যায়।

পশ্চিম নেপালের পাহাড়ি বাড়িতে একা সোমা
দেবী। মৃত্যু এখন তাঁকে খুব টানাটানি করছে।
তাঁকে বাঁচাতে,
চিকিৎসা বৃদ্ধি করেছে নেপাল সরকার।
পরিকল্পনা হয়েছে, পাহাড়ে নয়– রাজধানী শহরেই
তার চিকিৎসা হবে।
সোমা দেবী বাঁচলে দুরা ভাষাও বাঁচে।
দেবী না থাকলে দুরা ভাষাও থাকে না। একটি
জাতিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

[পুনশ্চ: নেপালের একটি ভাষার নাম 'দুরা'। এ-ভাষায় কথা বলেন, পৃথিবীতে এখন একমাত্র সোমা দেবীই বেঁচে আছেন। ভাষাটি রক্ষা করতে নেপাল সরকার সোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়েছে।]

ভাষা শহীদদের জন্যে

১.

মায়ের ভাষা রক্ষায়
যারা দিয়েছিল জান,
তাদের মান রাখতে ভাই
গাও-না কিছু গান।

২.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
হয়েছে তা ঠিক,
বিশ্বমাঝে ভাষা-শহীদদের নাম,
ছড়িয়ে দেওয়া এখনই তো কাম,
দিন শহীদদের নাম ছড়িয়ে
পৃথিবীর সবদিকে।

সিঁদুর-বিষয়ক

যে-হাত নারীর সিঁথি থেকে মুছে ফেলেছে সিঁদুর,
সেই হাত একদিন পচে যাবে।
সেই হাত সভ্যতার অভিশাপে একদা ক্ষয়ে-ক্ষয়ে
বর্বরতার উসুল ভোগ করবে।
যে-কাল এই বেআব্রু ঘটনার জন্ম দিয়েছে,
কী করে আমি নিঃস্ব বাতাস গ্রহণ করি?
সেখানে কি সভ্যতার বসবাস থাকতে পারে?

যে-হাত নারীর সিঁদুর নিশ্চিহ্ন করে ক্যামেরায়
ধারণ করেছে সিঁদুরবিহীন ছবি,
সেই ছবির নারী তো বাঙালি নারী নয়,
আমার সংস্কৃতি নয়।

সিঁদুর মুছে ফেললেই কি ধর্ম মোছা যায়?
এই মর্মবাণী বুঝে নিক ধর্মহীন সাম্প্রদায়িক
উগ্র শয়তান। সে জেনে নিক সিঁদুর তো মুছে
ফেলার কোনো বস্তু নয়।
ধ্বংস করার কিছু নয়।

যে-হাত সিঁদুর মুছে ক্যামেরায় ধারণ করেছে
নারীদের প্রতিকৃতি,
সে-হাত একদিন এই মাটির অভিশাপে পুড়ে
যাবে, পৃথিবী তার একরত্তি কণাও গ্রহণ
করবে না আর।
সেই হাত মরে যাবে। হয়ে যাবে কঠিন পাথর।

কারো কারো দিকে অবিরাম চেয়ে থাকা

বটগাছ তুমি আমাদের উপদেষ্টা হও

বটগাছকে মানবজাতির উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে।
বটগাছ উঁচু হলে তার মাঝে কোনো অহংকার কাজ করে না।
মানুষেরা যখন উঁচু হয় তখন সবকিছু তছনছ করে দেয়,
বটগাছ তছনছ বুঝে না।
মানুষ উঁচু হয়ে আণবিক বোমা বানিয়েছে। বানিয়েছে হিরোশিমা।
বটগাছ বোমা বোঝে না!
তবু হিরোশিমার ভঙ্গুর জীবন দেখে চোখের জল ফ্যালে।
মানুষ একাই সব পেতে চায় প্রয়োজনে অন্যেরটাও কেড়ে নিয়ে যায়,
বটগাছ তার মাটির সংসার থেকে বৃক্ষকে
পৃথিবীর সব মানুষকে বাঁচার সাহস দেয়।

বটগাছ সন্ত্রাস বোঝে না মানুষ হত্যা জানে না,
মানুষ মানুষকে যখন পেট্রোল মেরে পুড়িয়ে ছাই করে,
বটগাছ এইসব দেখে হাসে। আবার কখনো নীরবে নীরবে ক্রন্দন করে।

এখন পৃথিবীতে কোনো যোগ্য উপদেষ্টা নেই।
এখন পৃথিবীতে অবক্ষয় থামানোর জন্য কেউ নেই।
বটগাছ তুমি আমাদের উপদেষ্টা হও!

সময়ের কাছে যাই

মানুষ গোলাপ হারাতে হারাতে কী বিস্ময়করভাবে
সুগন্ধহীন হয়ে পড়ছে।
চারিদিকে কারা যেন বাগান থেকে চুরি করে নিয়ে যায়
ভালোবাসার উপন্যাস, কিছু মায়ের চোখের জল।
ওরা গ্রাস করে গাভীর ওলান থেকে শিশুর খাদ্য।
অসংখ্য সকাল যায় বেদনার হু হু কান্নার শব্দ শুনে।
কোনো কোনো বিকেল আমাকে অবক্ষয়ের গল্প বলতে বলতে কাতর করে রাখে-
যেন আমি আর কোনো ক্ষরণের বিপরীতে মানুষের ক্ষয়ের
প্রতিবাদ করতে উদ্যত না হই।
যেন আমি গুলিস্তানের কামান হারানোর কথা ভুলে যাই।
ভুলে থাকি যেন হাজার হাজার বধ্যভূমির নাম।
সময়গুলো চায় যেন সোনাবান, গাজীকালুর বোহেমিয়ান,
বৈঠকি জারিগানের হারানোর রজনী ফিরে আসুক বারবার।
আবার মধুর ক্যান্টিনের ঘাসে জমে উঠুক কবিতার আসর।
ঝরঝরে হাসিমুখ কাল।
পৃথিবীতে আবার প্রেমের উজ্জ্বল বহতা নামুক।
নেমে আসুক সকল সুন্দর গিলে গাওয়া হন্তারকের প্রাণবধের
অজস্র খ্যাপাটে তীর।
সময়গুলো ভালোবাসার খুব কাঙাল হয়ে গেছে।

কোনো-এক বসন্তের সকালে

বিষণ্ণ ভোরগুলো ঝোলায় পুরে
আজ আবার খ্যাপা বসন্তের
খেয়ায় ভেসে ভেসে তোমার বুনন জাগরণ ঘটুক
এইখানে।
আজ আমি আষ্টেপৃষ্ঠে সবটুকু তোমার,
আজ আমি খুব ভোরে তোমাকে
জাগিয়ে তুলবো ঘুম থেকে
গোলাপ রেখে হাতে।
চিরকাল এমনি স্মারক বোধ
খেলার স্বপ্নে স্বপ্নে তুমি এলে।
আজ আমি তোমাকে ঘাসের বন্ধনে এনে বলবো,
খোঁপায় পুষ্পেরা ফুটুক এই
সন্ন্যাসী সকালে।
জাগরণ ঘটুক ক্ষুদ্রতম মুক্তির। বিপন্ন ধুলোবালির
দুঃখ যাক।
আজ সারাদিন তুমি কেবল আমার নিশ্বাস,
আজ পিরামিড বাউল বসন্তের নবতর মুখ
দেখতে দেখতে আমরা হাঁটতে থাকবো
অজস্র কাল ধরে।
সেই চলা থেকে কস্মিনকালেও ফিরবো না আর।
আজ মাটি-মানুষের প্রকৃতি একাগ্র গণতন্ত্রে
হোক ধ্যানমগ্ন,
আজ পৃথিবীর সব জীব-জড়-অজড় সব সৃষ্টি
একটি জ্বলন্ত কুটির হোক,
লালনব্রত হোক
রাধা-কৃষ্ণ হোক
হাছন রাজা হোক
গগণ হরকরা হোক।

হয়ে যাক শিরি-ফরহাদ—
হয়ে যাক তাজমহল। সোনার বাংলা হোক।
আজ ফাল্গুনের আগুনঝরা, রক্তঝরা
সালাম বরকত শফিকের
নিশ্বাস বয়ে যাওয়ার শোকাক্রান্ত-গর্বিত-
উচ্ছ্বাসিত কাল।

আজ কোনো জাতভেদ নেই।
আজ কোনো সম্প্রদায় নেই।
আজ কোনো সাম্প্রদায়িকতা নয়।
আজ নয় কোনো ক্রস ফায়ার,
আর কোনো হত্যা নয়।
আজ বারুদের আস্ফালন ধ্বংস করার দিন।
এসে গেছে।
আজ সুকোমল আবহাওয়া বইবে এইখানে,
আসবেন সাত বীরশ্রেষ্ঠ সন্তান,
আসবেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর যুদ্ধবিমানে।
কালের দুঃসহ বেদনা মুছে দিতে আজ এইখানে বসবে
শান্তির হাট।

কারো কারো দিকে অবিরাম চেয়ে থাকা

দূরকাল থেকে তোমার অচ্ছেদ্য বরষামুখর জাদুতে বুঁদ হয়ে আছি।
এ যেন রাধার খোঁপায় বার বার জয়নুল এসে এঁকে রেখে যায় কিছু
শ্রাবণের বিকেল। শালিকের পা।
রেখে যান কাইতানের ভোরে কাঁঠাল কোষের সাথে মুড়ির উৎসব আর
মরা নদীর বেঁচে থাকার কিছু বাড়তি সময়।
কোনো-এক সন্ন্যাসের নিদ্রাহীন রাত্রির রোগাটে দৃষ্টির ভেতর
ডুবে যেতে যেতে
জেগে ওঠে আষাঢ়ের সানাই, সবুজাভ বনতল, ঘুঘু-ব্যাং-এর কোরাস
কাওয়ালি।
এ যেন দুরন্ত এক ঘাসফুলের যৌবনের দিকে ধাবমান কাল।
ক্ষিপ্র কিছু কদম বৃক্ষ আর না-থামা ঝরনার দুপুর,
এ যেন পুরনো সন্ন্যাসের ধারাপাত নিয়ে ছুটোছুটি খেলা।

সানাই-বাজানো বৃষ্টির ভোর নিয়ে তুমি যখন সামারপ্লেসের মতো
কবি আবুল হাসানের আকুল-করা গ্রাম দেখতে যাবে,
মনে হবে এইখানে এসেছিলো খ্যাপা ঋতু বর্ষার অসীম ভালোবাসা।
এসেছিলো সুরমার কিনব্রিজের পাড়ে অনেক অনেক অপেক্ষার প্রহর।
বনতল যখন সবুজাভ আর দুর্বিনীত শস্যের দিকে ধাবমান হবে—
তখন মনে হবে এইখানে এসেছিলো নিদ্রাহীন শ্রাবণের উল্লসিত রাত
এসেছিলো শুকনো বিলের বুক আর মৃত ঘাসের বুকে দরদি ভালোবাসা।
এসেছিলো মেঘভরা ভোরে কারো কারো দিকে অবিরাম চেয়ে চেয়ে থাকা

সারি সারি মলিন মুখ

এ কোন পাষণ্ড শকুনের বেসাতির নখরামোতে ছেয়ে গেল দেশ!
কোথাও শান্তির মেঘমালা নেই, মুক্ত ভোরের শাশ্বত শিশির নেই,
ঝলমল সুন্দর প্রজাপতির ওড়াউড়ি—নৃত্যরত
খলখলে পদ্মার—সুন্দরী লক্ষ্যার ঢেউ নেই।
যে-দিকে তাকাই শুধুই সারি সারি মলিন মুখ।
ছেঁড়াখোঁড়া করুণ নিঃস্ব ভূমি।
দেখি কেবলই সম্ভ্রমহারা আদমের
অবিন্যস্ত বসতভিটা,
দেখি কুৎসিত কুকুরের লালসা ছোবলে লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া
হাজারো বসন্তের বেদনার্ত উদ্যান।
দেখি কিছু বর্বরের সিঁথির সিঁদুরে রক্তাক্ত হাত খুবলে নিচ্ছে
সাজানো সভ্যতার নাড়িভুঁড়ি,
দেখি রাখালের ঘামের স্রোতে বয়ে চলা সরষেক্ষেত,
গোয়ালের বাছুর, ঘরের ছাউনি
রাজপথের ইট-পুজোর থালা,
প্রতিমার গর্বিত হৃদয়—একে একে আঘাতে আঘাতে খসে পড়ছে।
সেই জল্লাদের ঘাতকোচিত থাবায়—
যে অসুরের নাম এখনও উচ্চারিত হলে মৃত্তিকা ফেটে উঠে আসে
ত্রিশ লাখ যোদ্ধার তরবারি।
সেইসব নরপিশাচের টের পাই আজ এইখানে।

এ কোন নির্লজ্জ হায়েনা আবারও ঘিরে আছে আমার পতাকা!
যেদিকে তাকাই সেখানেই নরকের পদচ্ছাপ—দগদগে ক্ষতধারা—
বিষাদের কালো ছায়া, অসহনীয় অন্ধকার।

মাদল ও ঋতুর কথারূপ

তালপাতার গা'য়—নির্জন গুহার আদি মৃত্তিকার সরোবরে,
কারা কবে গুপ্তকালে এঁকে রেখেছিল তোমার
দীপ্তবর্ণ শাণিত রূপের অহংকার
হে আমার প্রিয়তম অ আ বর্ণ তারা।
পাহাড়ের বুকে—দূর প্রাচীন অতল প্রকৃতির সত্তায় কে তোমার
এমন আলোকিত রূপায়ণ তুলে ধরেছিল চন্দ্রবিন্দু কিংবা খণ্ড-ত।
যে অমর বাউল—পাহাড়ি কন্যা অথবা বনবাসী নাগর কোমল হাতে
ধরেছিল তোমার অস্তিত্ব তৈরির তুলি-নখর।

ঈশ্বর আমাকে সেই মানবের মুখ আজ দেখাও।
আমি প্রাণভরে আমার বর্ণ-কারিগরদের মুখ দেখতে চাই।
মানুষ আমাকে কি দেখাতে পারবে আমাদের সংস্কৃতির
প্রবক্তাদের হারানো দিবসের চিত্রলিপি?
যার লাবণ্যে সভ্যতার তুড়ি বাজিয়ে
যুগে যুগে উৎসাহিত হয়ে আমরা আসতে শিখেছি এইখানে
এই নবগ্রহে।
যে-বোধ যে-সাহসী পাখির ডানায় উড়াল দিয়ে এতোকাল
আমাদের গান,
আমাদের দোতারা
আমারদের মন্দিরা
আমাদের জলের গড়াগড়ি উৎসব মাদল বাজার সন্ধ্যা.
ধূপবাতির ফোয়ারায় নেচে নেচে ওঠা,
সব ঋতু সব রুদ্র সকল ভালোবাসার কাব্যসুর
কে এনে দিয়েছিল তোমার জাগরণের কালে। আমি সেইসব
মহাকালের নাগরিকের মুখ আজ দেখতে চাই।
প্রভু, আমরা পৃথিবীর বুকে যে-বর্ণের অন্তর ছিঁড়ে ছিঁড়ে বলছি
প্রতি মুহূর্তের দগ্ধ জীবন ও মাঝির কথা,
আমরা আজ তাদের প্রতিটি প্রভাতের শিরায় শিরায় গোলাপের
বিস্ফোরণ চাই।

একদিন ভোরে

দেখো, একদিন ভোর থেকে আমি আর তোমাদের গ্রহে নেই।
সবকিছু ঠিকঠাক রবে, যার যার ফেরার কথা ছিলো সবাই ফিরবে
আপন আপন গৃহে,
সরষে পুষ্পের বুক জুড়ে ভ্রমণের অস্তিত্ব রবে,
ঘরে ফিরবে খেয়াঘাটের মাঝি দূর বনান্তের ক্লান্ত মাছরাঙা,
শহরের বিষময় বাতাসে ভর করে ছুটতে থাকবে অজস্র স্কুলবাস।
শোকার্ত মায়েরা অনাদিকাল স্মৃতিসৌধের পাদপীঠে রবে দাঁড়িয়ে,
আগ্নেয়গিরির মুখ চিরতরে স্তব্ধ করে কেউ-কেউ স্পর্শ করবে
নতুন পৃথিবী।

অন্ধকার ভেদ করে ঋষিপাড়া জেলের বহর,
গারো নাগরিক সবাই একাকার হয়ে যাবে।
এক বেলা ভাত পেয়ে যারা হাজার বেলার হাসিতে নগর কাঁপায়,
যে-নারী গভীর রাত্রিতে নারীত্ব হারিয়ে চিৎকার করে
সংসারত্যাগী হয়,
সেও একদিন ঘরের দিকে ফিরবে।
দেখো একদিন ভোর থেকে আমি আর তোমাদের গ্রহে নেই।

এই তো আমার মন্দিরা

রাতভর জোছনার বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে কুয়াশার উঁচু নিচু স্তনভূমে হাত রেখে বললাম,
এই তো আমার ষড়ঋতুর অজস্র পুষ্পমেঘ জ্বলজ্বলে পূর্বপুরুষের স্বর্গীয়
বসবাস ।
শিশিরভেজা পরীদের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে—
তার জাদুকরি চোখে চোখ রেখে তৃষ্ণার দীর্ঘতম চুমো-স্পর্শ রেখে বললাম,
এই তো আমার কিশোরবেলার উচ্ছ্বল গ্রাম । কৃষাণীর ঘোমটা-দেয়া ছায়া ।
রাতভর চাঁদের শিক্ষণের মতো তোমার শরীরে শরীর গ্রহদের বাউল ভাষার স্বরে
বললাম,
এই তো আমার বৃদ্ধ বুড়িগঙ্গার হারিয়ে-ফেলা বিকেল ।
যার বুকে বহুবার জেলের নৌকোয় বসে বসে আমরা চিরায়ত বাংলার রূপ
দেখেছিলাম ।

সেই বসবাস

যেমন করে হাঁটতে বলবে তেমন করে হাঁটবো,
যেমন করে বলতে বলবে তেমন করে বলবো।
চিরকাল এটাই যদি হয় রাজ্য,
এভাবেই তো কীটপতঙ্গ পোকার নগর
হারিয়ে ফেলেছে ন্যায্য।

যেমন করে দিন ময়ূর নাচতে পারে রোজ,
তেমন ঘাসের গুজগুজানি কেউ করেনি খোঁজ!
আমরা সবাই তো খুঁজি,
বিবাগী নয়, হর হামেশা সকল ভোরে
নিজেরটাকেই বুঝি।

চিরকাল এভাবেই তো অন্যমুখী বনবাসী হওয়া।
নিজের অনেক সুর থাকতে—গান থাকতে—অন্য তালে গাওয়া।

সেই যে এক কাল

গুনটানা মাঝির পায়ের ধুপধাপ শব্দে জেগে ওঠা ভোর,
সেই তো ছিলো ভালো। তার শব্দঘোরের তালে তালে
নৌকোর ছইয়ে বাঁশের বাঁশির সুর উঠতো নেচে নেচে।
সেই বাঁশরিয়ার খদ্দর শার্টের ভেতর জমা থাকতো স্টেনগান।
সারারাত ধলেশ্বরী-বুড়িগঙ্গার জলকেলির সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ নেশায়
বুঁদ হয়ে ভোরের শিশিরের সাথে বাড়ি ফেরা—
শত্রুর রণযান চুরমার করে দেয়ার ভীষণ অপেক্ষা—
সেই তো ছিল ভালো।
যার সূর্য উঠেছিল কৃষাণীর নোলক পরার উৎসবে উৎসবে।
সে তো আমার অন্তরছেঁড়া লাউক্ষেত—সরষে ভূমির হাসিমুখ কাল।
সে তো কোন অদেখা আগন্তুক নয়। সে তো রাজধানীর পথে পথে
দূর গ্রামের পারুলদের ছিন্নভিন্ন করা নয়।
সে তো নগরীর আত্মা বৃক্ষদের শরীরের কুড়াল চালানো নয়।
ঘন কুয়াশার ভিড়ে অন্ধকারে খড়ের স্তূপে লুকিয়ে লুকিয়ে হায়েনার
খোঁজ করার মহড়া—সেই তো ছিল ভালো।
একসাথে পান্তাভাত—বাংকারে রাইফেল ঠেকিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে
নয় মাস। সারি সারি বন্ধুর লাশ—
বোনের স্বপ্ন হারিয়ে যাওয়া।
অনেক নিঃশেষ শেষে ঘরে ফেরা যাবতীয় দোতারার ঝংকার ফুঁসে ওঠা,
সেই তো ছিল ভালো।

মৃতের পোশাক পরা ক্রন্দসী বাউল

সাগরের বুকে কী গভীর বিষণ্ন মায়ায়
চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছো তুমি।
তোমার খোঁপার সেই সুন্দরী পুষ্পগুলো কোথায়?
নাকফুল-কৃষকের ভিটা,
জেলেদের জালগুলো
কৃষাণীর হাসিমুখ কোথায়?
সাগরকন্যা! তোমার রত্নময় ঘুঙুরের জাগরণ!
সন্ন্যাসীর একতারার গজল কোথায়?
তুমি তো বঙ্গোপসাগরের ক্রীতদাস নও।
তুমি তো মৃত পোশাক-পরা কাফনধারী কেউ নও।
তুমি তো বিষণ্নবিলাপী অদেখা কোনো গ্রহ নও।

তবু তুমি অবিরাম ঝরা পাতাদরে কষ্টস্রোতের কান্নায় বিভোর।
শব্দহীন—বড়ো সহনীয় বৃক্ষের মতো একাকী প্রতিদিন মৃত্যুর ঘোরে,
ভয়াবহ ক্ষয়-পতনের ঘোরে
ঐতিহ্য শ্বাপদ শিল্প হারানোর ঘোরে
মৃত্তিকার স্বপ্ন জীবনের সাগরে নিঃশেষ হওয়ার ঘোরে বলিয়ান।
গর্বিত বাংলার শান্তিময় জানালা তুমি। কারো ক্রীতদাস নও।
বঙ্গোপসাগর যদি কোনো-এক মায়ের নাম হয়
তুমি তার অসমাপ্ত সন্তান,
যার বুকে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে এই ভূমি।
মৃতের পোশাক পরা ক্রন্দসী বাউল
কী গভীর বিষণ্ন মায়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছো তুমি।
তোমার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষের কান্না তো নেই।

নাগদেবীর প্রত্যাবর্তন

অসুর তাণ্ডবে সভ্যতা গিলে খাবার মোহে
প্রাচীন দানব এসেছে আজ,
কালিদাসের মর্মরে ভাস্কর্যে ঘন ঘন ছোবল—
পাহাড়পুরের নন্দিনী স্থাপত্যে
কবি মুসলিম, পূর্ণিমাদের স্বপ্ন ভাঙাই যেন ওদের কাজ।

কী কী ভাঙছে? কার বুক জ্বালছে?
ওরা ভাঙতে ভাঙতে যাক—
অসীম বর্বর-নির্বোধ ইহুদীয় দানব
ওরা জানে না এইসব অস্ট্রিক হৃদয় মন
তা তো ভাঙা যাবে না।

একদিন পোড়া ছাই—
সম্প্রীতি তছনছ করা অসহনীয় আগুন
পুড়বেই হন্তারকের ঝাঁক।
এই পথ-প্রান্তর-সজ্জিত মানবসম্প্রীতি
কাঁদছে কাঁদুক,
কী বীভৎস অমানিশা-অন্ধকারের টের পাই—
পরম ধনের গোলা একাত্তর
হায়! তার কিছুই যেন আস্ত নাই।
বিষধর সর্পিনী নাগদেবী হাঁকছে
যত পারে নাচুক,
একদিন অবুজ তৃণ ঘাসও গর্জন ছড়াতে ছড়াতে
আন্দোলিত হবে পথে—
সেদিন প্রজার থুতু-উসুলী তীরে বিদ্ধ হবে তুমি
থাকো না যতোই নির্মম শক্তির রথে?
ভাঙাভাঙি হৃদয়পোড়া কত আর গ্রহণ করা যায়,
ওরা সিন্ধুতীরে, গঙ্গায়, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, টেকনাফে
এই বাংলায়—সাজানো পৃথিবীর সকল দিগন্তে—
আর্য-অনার্য, মুক্তিযুদ্ধকে—
গিলে খেতে চায়।

শূন্যতায় যেতে যেতে

মানুষের মুখ থেকে প্রতিনিয়ত হাসির ঝলক উঠে যাচ্ছে।
যারা হাসে তারা সবার আপনজন হয়ে হাসতে জানে না।
যারা সমগ্র জাতির জন্য সুন্দর উদ্যানের উর্ণনাভ গ্রহের জন্যে
হাসতে জানে, তাদের হাসি তো
নির্বাসনে আছে। ঘোরতর অন্ধকারে
আছে।

আজকাল বৃদ্ধ মানুষগুলোকে আমি হাসতে দেখি না।
বঙ্গভবনের সম্মুখে যে মোটাতাজা পার্ক তাকেও
হাসতে দেখি না
সংসদভবনের চারপাশের ঘাস, পদ্মার উত্তাল বুকও হাসতে পারে না
যারা সব মানুষের হয়ে হাসতে জানে তাদের হাসি তো আসে না।
বড় কষ্টে আমি দেখি উড়তে থাকে মাতৃভূমির পতাকা,
তার অন্তরেও হাসির রোল নেই।
এইসব চালচিত্র দেখে নদীর জল ওলানের ওপর (ঢেউ) শুয়ে
থাকা অনবদ্য মাছও হাসতে পারে না।
প্রিয়তম মানুষ মাঝিরাও এখন হাসতে
জানে না।
যারা জোছনা মুখর রাত, যুদ্ধে হারানো গৌরবদীপ্ত সন্তানের
বেদনার হাসি হাসতে জানে না,
এইসব আর কতকাল
গ্রহণ করা যায়।
এইসব হাসি তো সব মানুষের হাসি নয়।

এখনও সেই তুমি

কোনো কোনো দিন তোমাকে খুব মনে পড়ে ।
কোনো কোনো রাত তোমাকে ভাবতে ভাবতে
তোমার প্রতিকৃতির ভেতর ডুবতে ডুবতে
তোমার মুখ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে যাই ।
আজকাল সারাক্ষণ সেই পুঁথি আর বিলাপ
নিঃশেষ করে যায় । আমাকে ফতুর করে যায় ।

কাব্যশ্রমিকের দিনগুলো

মানুষের কথামালা খুঁজতে খুঁজতে
কবির মাথার চুল অজান্তেই বুড়ো,
শাদা হয়ে যায়।
একদা কবির মাথা আর তার আদুরে
চুল ধরে রাখতে পারে না—তার পরও
হিরোশিমা,
তার পরও নদীর বুক শুকিয়ে যায়।
তার পরও
হৃদয় পুষ্ট হয়। হৃদয় ভাঙেও তার চেয়ে
বেশি।
খুব বেশি মরার খরা জাগে
ক্ষয় আর তাণ্ডবে,
ভালোবাসা হারানোর যুদ্ধে,
অনাচার দুর্বিপাকে।
তার পরও কবিকেই সব কষ্টের
ঠেলাগাড়ি টেনে টেনে শুনতে হয়
অসীম জড় বয়ান।
কবিতা লিখতে কাগজের পাতায়
যার চোখের জল একবারও ঝরেনি
তার ভেতরের কবিতার মৃত্যু হয়ে গেছে।
মানুষের ভার বইতে বইতে কবি কেবলই
তার সত্তা শুধু শব্দ, তার মস্তিষ্ক কেবল গল্প
সুবর্ণ সকাল, দুঃখকষ্টের
বিমর্ষ রূপের ভেতরে ঘুরপাকে ঘুরতে হয়।
তার মর্ম ভোরের দৃষ্টি হৃষ্ট ধুপধাপ নির্মল
জামপাতার দোল খাওয়া
নাচুনি প্রার্থনা করে। কার
খাদ্য কে খায়, কে কার ঘরে দেয় আগুন,
এসব থেকে বেচারার চোখ আসে না ফিরে।
আহা তার কত রাত গেছে তারার জোছনার
দিকে চেয়ে চেয়ে, তার ইয়ত্তা কী আছে।
এক-একটি কাব্যঘর এক-একটি আলোময়
পৃথিবী।
তা কবিকেই, বারবার কবিকেই শিল্পকক্ষে
উচ্ছ্বসিত, বেগবান করতে হয়।
তার বোধ তার চোখ তার মুখ
প্রতিদিন কেবলই অনাবিল পুষ্পদল চায়।
তার ক্ষণকাল তো অনেক অসীম
মুক্তির জাগরণ চায়।

অহংকারের একাত্তর-১

মাঘের প্রচণ্ড শীত। হু হু করে শীতল বাতাস বয় চারিদিকে। সারারাত আমি আর
খলিল মামা, মঞ্জুর ব্যগ্র সাহসী যোদ্ধা শাহাবুদ্দিন—এরকম অনেক অনেক
যোদ্ধার দল পাহারায় ছিলাম বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা

ধলেশ্বরী আর ছবির মতন সব

গ্রাম। পাহারায় ছিলাম মানুষের হৃদয়, সত্তা আর তার পতাকার ওড়াউড়ির জন্য।
পাহারায় ছিলাম নদীর ওপার থেকে মহাস্রোতের ঢলে চলে আসা হাজার হাজার
শরণার্থী—দুঃখিনী বাংলার জনস্রোত। নয় মাস মৃত্যুর মুখোমুখি গ্রাম্য পথে পথে,
শহরে শত্রুর আঙিনা, খড়ের স্তূপে মাথা ঠেকিয়ে রাতের বিশ্রাম—বাংকারে
একাধারে দশ ঘণ্টা শুধু বর্বরকে বধ করার নেশা। রাইফেল লুকিয়ে রেখে শত্রুর
গানবোর্ড খোঁজার সে কী কঠিন অপেক্ষার কাল।

অহংকারের একাত্তর-২

এখন অনেক রাত। মধ্যনগরের কয়েক হাজার মানুষ ঘুমহীন। শিশুরা তাদের মায়ের কোলে দাদা-দাদির বুকে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কাল সারাদিন এখানে পাকবাহিনী মাইকে ঘোষণা করে যায়—আজ রাতে এ-গ্রামে ক্যাম্প করবে ওরা। ওদের হানা মানে শত শত লাশ, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছারখার। সব সম্পদ লুটপাট, ইয়াহিয়ার অসভ্য বাহিনীর হানা মানে সব কিছু শেষ। শুধু মাটি-পোড়া মাটিই থাকে টিক্কা খানের আক্রমণে। একথা ভেবে গ্রামের কারো খাওয়াদাওয়া ঘুম নেই। আমরা ঘরে-ঘরে বলে দিয়েছি, যে যেভাবে পারেন চলে যান—দূরান্তে যেখানে আইয়ুব ইয়াহিয়ার প্রেতাত্মা নেই। তার পরও কেউ ছাড়েনি ভিটে মাটি। সারারাত শত্রুর সাথে সে কী গোলাবারুদের মোকাবেলা! ফাগুনের অভাবিত এক রজনী এগিয়ে চলছিল এইখানে এই অমর নদীর পারে। যোদ্ধা জনতা মিলে সারারাত লড়াই করতে করতে এক সময় নেমে এলো সেই ভয়াবহ ভোর। শত শত কৃষক—তাদের সন্তান গেলো। গেলো ঘরবাড়ি—অনেক অনেক প্রাণ।

অনেকদিন আগে

বাফাপুলি হাতে বহুকাল শীতের সকালে
তুমি পূর্ণ করেছো কবির চাওয়া
অন্ধকার ভেদ করে।
কুসংস্কারের ভাঁড় ঠেলে ঠেলে
কতবার এসেছিলে আমার জানালার পাশে।
সেইসব রাত কিংবা চাঁদের আলোতে তোমার
জেগে-থাকা গল্পের ভেতর
এখনও কি রোদের ঝলক আঁকে বকুল মিস্ট্রেস?

নরকের ছায়া

চারপাশে অনেক বিলাপ। হু হু কান্নার শব্দঘোরে
নির্জন সময় বয়ে যায়।
কারা যেন গোঙাতে গোঙাতে—

কুৎসিত বিহানের খেয়ায় ভেসে ভেসে নরক সময় করে পার।
বুকে বড় বেদনার সুর ঘুর ঘুর করে।

একটি গ্রামের গল্প

পৌরাণিক পাহাড় পুড়ে গেলে যেভাবে ছাই ভস্মে পড়ে থাকে।
মৃত্তিকার অবয়ব,
সেইসব শূন্যতার কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে একটি বৃদ্ধ গ্রাম।
শুধু খাঁ-খাঁ ভিটেমাটি,
খুঁটি নেই চালা নেই চুলো নেই সাজানো সংসার নেই,
প্রাণহীন জনমানবহীন,
অসংখ্য দোয়েলের কলকাকলিতে যেখানে একদা দেবতাদের
পদপাতে
পরীদের আসর জমতো,
আজ সেই বসতভিটায় ঝিঁঝি পোকা, মাকড়সার বন এসে
খেয়ে গেছে সব পুঁথির আসর।

অসুর ধর্মবাজ, গিধড়ের তাতানো হাত ছুঁয়েছে আমাদের
অস্তিত্বঘেরা
এই অনন্য বাগান,
শুধু উঁচু নিচু মরুভূমির ঘ্রাণ, আদিমসমাজের রাঙানো ভোর
চুরি করে নিয়ে গেছে কিছু অসভ্য ডাকাত।
জীবনের ছায়াপাতও নেই,
সারিবদ্ধ মানুষের রাত জেগে জেগে যাত্রার গান শোনার তল্লাটে
নেই।

শুধু জঙ্গলপোড়া ছাইয়ের গন্ধ ভেসে আছে সারাক্ষণ
আহা সিঙ্গাগ্রাম! তোমার বুক জুড়ে কে সেই নির্মম অসুর
এসে রেখে গেল এই অন্তর-খাওয়া বিলাপ।
তুমি সয়ে যাও। সয়ে যেতে থাকো!

সেই মরমি জলসা

এখনও তোমার ঘুঙুরের শব্দ পাই। ওই শব্দ সন্ন্যাসের মোহ-কীর্তিতে
কলকাতা আজও আমাকে টানে।
মোহনীয় নৃত্যমুদ্রার সে কী ফোয়ারা,
দূরের নীল পাহাড়ও চুপিচুপি শিল্পব্যঞ্জনায় আকুল হয়েছিল,
গঙ্গাজল যায় থেমে—
হাওড়া ব্রিজের পূর্বদিকের বস্তিতে তখন অনাহারীর চিৎকার
থেমে গিয়েছিল।
নগরীর পুজোমণ্ডপের ধূপের আসর,
রাজপথে আতশবাজির উন্মত্ততায় তোমার মলের আওয়াজে
স্তব্ধ হয়ে যায়।
তার পরও তোমার দুপায়ের জাদুকরি নেশার ঘোর কাটেনি
চোখের কারুকাজ সে কি হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল বনবীথির,
রবিশংকরের সেতারের সুরের মায়াজাল বুনে দিলে তুমি
সেই বিকেলের মরমি জলসায়।
এখনও আমি সেই কাঁকন-কল্লোলের শব্দ পাই।

ফেরার সময়

কখনো কি আর ভাঙবে না তোমার বিষময় ঘুমের মহড়া হে বনবাসী ভালোবাসা।
আমাদের নির্মল ভোর, বেলিফুলে বুঁদ হয়ে পড়া দুরন্ত কিশোরবেলা সবই তো
দূর অচেনা না-জানা কোনো-এক গ্রহের নাগরিক।
স্বস্তি এখন অসার কচ্ছপ ছুঁয়ে-যাওয়া কতগুলো দুঃস্বপ্ন আর কষ্ট পাওয়ার অশরীরী
ছায়া।
দেখছো না, ধুলোর ক্রন্দন—নবীন বসন্তের
গায় জুড়ে কত বীভৎস পাতাঝরা। নোলক খসে-পড়া কাল দেখে
তোমার কি একবারও এই দিকে চোখ ফেরাবার
হয় না সাধ।
বাড়াও-না একবার তোমার শান্তির দুর্বিনীত হাত। তুমি না এলে এইখানে
আর কখনো জমবে না জারিসারি চর্যাগীতের রোমাঞ্চিত আসর। দেখছো না
চারদিকে হৃদয়-হরণ-করা কালো মেঘ কী গোগ্রাসে
গিলে খায় শান্ত নদী।
প্রতিটি সকাল আসে এইখানে হারানো প্রেমের সন্ধানে—যার বুক ভরা ছিল
সোনাবানের পুঁথি আর
জীবনানন্দের চিরজয়ী কাব্যসুর।

কখনো কি আর তোমার ভাঙবে না নিঃস্বকাতর ঘুম হে প্যারাডাইস
হে পাথর প্রণয় কাল। এত তাতানো বৈশাখ, নষ্ট
পোকার নগরে তুমি কতকাল রাখবে আমায়।
কে যেন প্রতি দমে দমে ক্ষণে ক্ষণে খুবলে নিয়ে যাচ্ছে তোমার আমার
কাদাজলের অদম্য বেলা।

ব্রিজপোর্ট ইউনিভার্সিটিতে বঙ্গবন্ধুকে দেখে

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওরা
প্রাণভরে শুনলো বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।
মাথা নত করলো সবাই কালজয়ী সংগীতের সুরের কাছে,
তারপর ব্রিজপোর্ট ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট (ভিসি) সজোরে
আবৃত্তি করতে থাকলেন বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন। তাঁর
মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার ইতিহাস,
কী করে বাঙালি অর্জন করে তাদের রক্তাক্ত স্বাধীনতা।
এসব বলতে বলতে আমেরিকার ঐতিহ্যদীপ্ত পৌরাণিক
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও সুশীল মানুষের চোখ ছলছল
করে উঠছিল।
বুক গর্বে ভরে উঠছিল তাদের বঙ্গবন্ধুর কীর্তিনামা পাঠ করে।

ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাস, সবুজ আঙিনা, পাশে বহমান
আটলান্টিকের জলধারা, নিউইয়র্ক ঘিরে থাকা স্ট্যাচু অভ লিবার্টি
সবাই যেন মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর কথামালা আবৃত্তি করছিলেন।
তাঁরা বললেন, জাতির জনকের স্বাধীনতা আনবার ইতিহাস,
বললেন, বন্দি থেকেও প্রচণ্ড স্বাধীনতাপ্রেমী ও আপোসহীন
শেখ মুজিবের নয় মাসে পাকসেনাদের হটিয়ে জয় আনবার কথা।
পাকসেনার বর্বরতার চিত্রধারা উপস্থাপন করতে গিয়ে ভিসি
বললেন, শেখ মুজিব সারাবিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের নেতা,
বললেন, তাঁর কীর্তির ওপর দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ এসেছে বাংলায়,
বললেন, পর্যুদস্ত সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প চক্রের কথা।

মঞ্চের পেছনে বিশালদেহে এক প্রতিকৃতিতে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব।
সেই গলাবন্ধ কোট, আকর্ষণীয় পাঞ্জাবি গায়ে নেতা তাকিয়ে আছেন
আমাদের দিকে। আমি বারবার শাজাহান সরদার, লিয়াকত আলী লাকি,
গোলাম কুদ্দুস, তারানা হালিম, শামীমদের দিকে তাকিয়ে দেখছি, ওদের
অন্তর, মুখ ভরে উঠেছিল আমেরিকার মাটিতে এই শীতে
বর্ষীয়ান শহরের সত্যের দিকে জেগে ওঠায়।
মিলনায়তনে কয়েক শত আমেরিকার শিক্ষক-ছাত্র, ব্রিজপোর্টের মেয়র,
হায়, কী অভাবনীয় দৃশ্যের সামনে আমি দাঁড়িয়ে এইখানে।
যারা যুদ্ধে বাঙালির বিরুদ্ধে ধরেছিল অস্ত্র,

যারা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে আমাদের স্বাধীনতার পথকে করতে
চেয়েছিল রুদ্ধ—
আজ ওরাই-সেই যুক্তরাষ্ট্রের সরলপ্রাণ মানুষেরা শেখ মুজিবের
প্রতিকৃতির পাশে চিরকৃতজ্ঞচিত্তে দাঁড়িয়ে।
প্রাণভরে ভিসি আবারও উচ্চারণ করলেন,
বিশ্বে এই এক মহান নেতা যাঁর রাজনৈতিক জীবনের চোদ্দ বসন্ত
গেছে জেলের অন্ধকারময় কক্ষে।
ওরা বঙ্গবন্ধুর ছবিকে আলিঙ্গন করে একাত্তরের জ্বালা মুছে ফেলতে
সবাই এসেছে এইখানে।
আটলান্টিক সাগরের সুকোমল তীরে যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট
এই বৃদ্ধ শহর যেন আজ আনন্দের বাহারে দুলছে।
আজ ব্রিজপোর্টে ছুটির দিন। শেখ হাসিনা-দিবস ঘোষণা করেছে
ব্রিজপোর্ট সিটি কর্পোরেশন। কোথাও কিছু চলছে না।
ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা,
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানিত অনারারি ডিগ্রি
প্রদান করলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু শিক্ষক তাঁদের
ভাষণে বাংলার ইতিহাস বলতে গিয়ে সংগ্রামী জাতি বললেন।

কানেকটিকাট শহর কী ভাগ্যবান! আজ তারা বাংলাদেশের
ত্রিশ লাখ শহীদের প্রতি, তাদের আত্মত্যাগের প্রতি নিবেদন করলো
একাত্তরে না-পারার যন্ত্রণার কথা। ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় আজ
সেজেছে মনের সুখে। চারিদিকে উৎসবের সমাহার।
সাগরের তীরে তীরে শীতল বহর ছুটে চলছে বঙ্গবন্ধুর
প্রতিকৃতি ছুঁয়ে।
ওরা মহান নেতার নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল ক্ষণে-ক্ষণে।

লেনিনগ্রাদ

পৃথিবীর জানালা শুধু নও, তুমি একাগ্রই মন-কেড়ে-নেয়া সংস্কৃতির হাট।
শিল্পভরা দুটি সজ্জিত চোখ নিয়ে তুমি কী করে এইখানে ঘুমাও লেনিনগ্রাদ।
সরিষার হলুদ রঙের সরোবরে আকুল তোমার নাগরিক সমাজদেহ।
যেদিকে দৃষ্টির বান যায়, সেখানেই ঐতিহ্যঘেরা স্থাপত্যের গর্বিত আনাগোনা
নেভার পারে যুদ্ধ জাহাজ অরোরা ক্রুশিয়ার এখনও বলবান ঢঙে পৃথিবীকে
কী সাহস বিছায়ে যায়, কী অদ্ভুত তোমার সংস্কৃতির জাগরণ! এখনও কি
গভীর ধ্যানের বিস্ফোরণ ছায়া ফেলে যয় হার্মিটাসের অজস্র জাদুঘর,
এখনও শিকড়ের খোঁজে এইখানে মানবিক কালচার মাথা উঁচু করে আছে।
লাল মলাটের গ্রন্থ আজও শুয়ে আছে এইখানে, লেনিনের মমিজুড়ে প্রত্যহ
ক্রেমলিন আকাশজোড়া ভালোবাসায় মাতম করছে সারাক্ষণ। আজও এই
মাটি ধারণ করে আছে মহামতি লেনিনের সাবলীল সংগ্রামের জ্বলন্ত স্বাক্ষর।
লেলিনগ্রাদ, তোমার বুকের মাঝখান দিয়ে ছোট ছোট দ্বীপগুলো মিলেমিশে
একদা যে-ঐতিহ্যের জানালা খুলে বিশ্ব ছুঁয়েছিল, অসংখ্য যুদ্ধক্ষত হয়েছিল
অক্ষয় শহর। তুলনাহীন তোমার সমস্ত ভবনজুড়ে বর্ণালি নকশার খেলা।
তুমি লেলিনগ্রাদ নেই। হয়ে গেছো সেন্টপিটার্সবুর্গ। পিটারের নামে এই
জনপদ এখন লেনিনের স্মৃতিচিহ্নেই দাঁড়িয়ে। মহামতির প্রতি এই অপমানে
আমি গর্বাচেভ ও পুতিনদের ফাঁসির দাবি করবো না। তারা একদিন নিজ
থেকেই বুঝতে পারবেন শহরের নাম পরিবর্তন করে, আর পাথরে তৈরি
লেনিনের ভাস্কর্য কুপিয়ে মুক্তির দূতদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া যায় না।
অসম্ভব তাণ্ডব সয়ে সয়ে এখনও তুমি কী সাহসে দাঁড়িয়ে হে লেনিনগ্রাদ।
তোমার বুক একবার যে ছুঁয়েছে তার মুখ কখনো আর ফেরেনি অন্যদিকে।

সুন্দরের মৃত্যু হলে

যে-তিমির হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
যে-দহন অন্তর পুড়ে পুড়ে খায়—
তুমি সেই দহনে আমাকে বারবার রেখে
আদিবাসী, খণ্ডবাসী—মর্মজ্বালা, কষ্ট দেখে
কেমন করে সময় কাটাও, কেমন তুমি থাকো?
বলতে হবে, দীর্ঘ প্রহর—শূন্য ছায়ার বেদনা কেন আঁকো।

যে-সুখ তোমায় বনবাস, অস্থির ঘাটে রেখেছে বেঁধে,
এ তো মৃতচর। সুন্দরের মৃত্যু হলে—কী হবে এখন কেঁদে?

দরদি যিশু

মানুষের উচ্ছন্নতায় কীটেরাও হাসে,
ঘোর অন্ধকারের বাঁশি বাজে, তার ছোবল লাগছে, তৃণ ঘাসে ।
শিশিরও নিশিতে কাঁদে—ক্ষয়ে যায় উপত্যকা, চাঁদমুখী শিশু,
আমাদের রক্ষা করবে কে? কোথায় অবক্ষয়রোধী দরদি যিশু?

শান্তি-ঘুম এখন আমাদের বড়ই চাওয়া, খোদা?
আমরা কেন ঘুমোতে পারি না—
কে টানে মধ্যযুগীয় বেলেল্লাপনায়
কেন অসুরের বয়ে চলাটাকে আমরা ঠেকাতে পারি না?

ক্ষয়ের তো একটা শেষ থাকা চাই ।
এ কেমন নিধনবাজি, সম্প্রীতি ভালোবাসায়
রুটির বাজারে,
বর্ণমালার সেই হন্তারক শোষক তুমি ।
তোমাকে চেনে না এমন জনতা এ-মাটি জুড়ে নাই ।
কত আর স্তব্ধ হবে তবলার লহরি, ধ্রুপদী কালের প্রাণ,
দাও-না বাড়িয়ে হাত বরকতের ভাই, দেবে কি প্রয়োজনে নিজ-নিজ জান?

রাখাল
(কবি ত্রিদিব দস্তিদার স্মরণে)

১.

যাওয়া মানে
মাটির সন্তান
মাটি কাঁপিয়ে
মাটির ভেতরে
অন্যঘরে, চিরকাল
শুয়ে থাকা।
যাওয়া মানে
কবিদের কাঁধে
কবির কফিন
অমর কবিতার
কঠিন চিৎকার
বুকে বেঁধে রাখা।

২.

কবির কফিন কবিদের কাঁধে
এইখানে—
এই প্রাণের মিনারে
বাংলাদেশের হৃদয় আছে শুয়ে।
দুরন্ত রাখাল—বোহেমিয়ান।
চিরায়ত কাব্যের অদম্য কারিগর—
ফুল আর কবিতার চোখের জলে হলো
একাকার—
এইখানে এই শহীদ মিনারে, লালবাগ
শ্মশানের অন্তরে।

সাহসেরা ঘুমিয়ে পড়েছে

সাহসগুলো নির্জনে কচ্ছপের আদলে ঘুমিয়ে পড়েছে।
ঘামঝরা দুপুরের উচ্ছ্বাসী রাখাল—এই কীর্তিনাশার
গজল শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেছে।
কুয়াশাভরা রাতের জোছনা এখন এখানে বড় মর্মবিদারী গান।
খড়পোষের ছাউনিতে আদমেরা স্থাপত্য ভেঙে ভেঙে
গম্বুজবাদী কাঁকড়া-টিকটিকি,
ষষ্ঠপায়ী-চতুস্পায়ী আরও অনেক
পদধারী হচ্ছে।
সাহসেরা ঘুমিয়ে পড়েছে চায়ের টেবিলে সিগারেটেরে ধোঁয়ায়।
ন্যাকামি তন্ত্রমনের আড়ালে।
সুশীল কুশীল রোগগুলো এনোফিলিসের জন্মান্তরের নেশায় মগ্ন।
তার পরও সাহসেরা ঘুমায়।
রোজ রোজ ওরা ভুল করে বসে। নদীভাঙা কৃষকের দিক থেকে
মুখ ফিরিয়ে নেয়।

শিলালিপিদের জন্যে

সজীব জোছনায় ভিজে ভিজে পুকুরের শ্যাওলা
দেখে দেখে চলে গেছে অমলিন সময়।
শাপলার ডানায় উড়তে উড়তে
বকুলদের বাড়ির আঙিনায় ভরে যেত প্রজাপতি।
পুকুরঘাট আর সিঁড়িগুলোর ইট বালি ওরা জানে
এইখানে কতবার এসেছিল ভালোবাসার বিকেল।
অনন্য সময় পার করে দেয়ার গল্প—
এই বুকে জমে আছে এইখানে এই গ্রাম্য শিলালিপির অন্তরে।
গুটি গুটি অক্ষরে সাজনো তোমার কথামালা—
যেন বেলফুল আজও চোখে ভাসে।

ঘুঙুরের শব্দঘোর

ডাকপিয়নের থলে তোমার ঝোলার দিকে
সারাক্ষণ চেয়ে চেয়ে থাকি ।
মন-জয়-করা কোনো-এক পত্র যদি এসে যায়
বিষণ্ন বিকেলে ।
ক্লান্তঘোর ম্লান করে যদি কোনো অনাবিল গল্পমালায়
ভরপুর-প্রেমময়, সুখকর করে তোলে এই করুণ সন্ধ্যা ।

ডাকপিয়নের ঝোলার দিকে চেয়ে চেয়ে অজস্র
কাল গেছে,
অবিরাম দৃষ্টিরা দূর বহুদূর কোনো-এক থলের
মুঠির ভেতরে আবিষ্ট থাকে ।
যদি দরোজায় কড়া নাড়ে কিছু ঘুঙুরের শব্দ ।

এ সময়ের পুঁথিপাঠ

নীল জলে ভরা এ্যাকুরিয়ামের আবদ্ধ খাঁচায় কয়েকটি বন্দি মাছ,
সারাক্ষণ বাঁচার প্রার্থনায় কী ভীষণ এপাশ ওপাশ করছে।
এই ভ্রাম্যমাণ চিড়িয়াখানার ভেতরে মানুষের কী এমন উপভোগ্য
সংসার প্রদর্শনী খুঁজে পায়?
এ নির্মম বন্দিদশার গল্পটা তো কারো ভেতরে স্পর্শ করে না!
কারো হৃদয়কে যায় না ছুঁয়ে।
আহা অবরোধবাসী তোমাদের জীবন বাজি রাখা কুৎসিত পণ্য উৎসব
মানুষের ঘরদোরে কী এমন ডালভাতের উপায় হয়,
তা আমি বুঝি না।
তোমাদের গলায় মৃত্যুর ঘণ্টা ঝুলিয়ে পৃথিবীতে কী এমন
সভ্যতার রক্ষা পায়,
এ খবর লেখে না কেউ। প্রতিবাদে উচ্চকিত হয় না কোন র‍্যালির স্পন্দন।
এ্যাকুরিয়ামের আবদ্ধ খাঁচায় ছটফট করা কয়েকটি মাছ
মুক্ত পৃথিবীর নেশায় বিভোর—
অমানিশার শিকল ভাঙার গজল গেয়ে চলেছে ওরা।
আহা দহনের এই পুঁথিরভাষা কেউ কি বোঝেন?

জীবনগাঁথা

১

ঘুমে নিমজ্জমান পাথরও এই সময়ে একটুখানি জেগে ওঠে,
দুর্বার ক্ষীণকায় সন্তানেরা পৃথিবীর দিকে উঁকি দিয়ে
আত্মস্থ করে নবতর সূর্যরশ্মি,
আমার ঘরের কার্নিশে বসে থাকা নীড়হীন ন্যাংটো বানর,
তীব্র ঝড়ে হারিয়ে যাওয়া কাক স্বপ্ন দেখে বসতভিটার ।
রাত জাগা সারসের চোখ মৃদু ফোঁটায় আলিঙ্গন করে
মধুময় সময়ের ভোর ।
পুরনো গ্রামের সোঁদা সোঁদা মাটির সড়ক
শান্ত স্নিগ্ধ কাউনের ঘ্রাণ,
সীসামাখা রাজধানীর বিষাক্ত ধোঁয়ার ছায়া ।
শেষ রাতে নদীতে জাল ফেলা মাঝির লোকসংগীতের সুরেও
এই সময়ে বাজতে থাকে কিছু পাওয়ার নেশা ।
আহা, পৃথিবীতে আজ হয়তো নেমে আসবে হারানো গল্প ।
আহা, পৃথিবীতে আজ হয়তো অপরূপ দেবদূতের উপস্থিতি ঘটে যাবে ।

২

বৈশাখে লেখা আমার এ কবিতা তুমি পড়বে কি পড়বে না
তা আমি জানি না । আমার জননী পড়বে ।
বৈশাখে প্রস্ফুটিত আমার শব্দমালা তুমি ছোঁবে কি ছোঁবে না
তা আমি জানি না । আমার মা ছোঁবে ।
বৈশাখে উত্থিত এই পদ্মমালার সুবাতাস তোমাদের তল্লাটে পৌঁছবে
কি পৌঁছবে না
তা আমি জানি না ।

ফতোয়াবাজদের প্রতি

পারো যদি বৃষ্টিকে থামাও,
মায়ের স্তন থেকে শিশুর দুধ—উল্কাঝড়ের নৃত্যগান
বৃক্ষের বেড়ে চলা অবরুদ্ধ করো।
সেই ফতোয়া কী জানো?
তা হলে কেন এতো অনাচার নারীর শস্য গ্রাম?
এটা সেটা টানাটানি? বেআব্রু নিয়মে কানকানি,
ঝারফুঁক আদমবাজি।
আমরা মানুষ। সব বুঝি। ভণ্ড ফতোয়াবাজ কী তাও জানি।

আষাঢ়ে গল্প নয়

নীরস তালপাতার মুণ্ডুপাতের মতো আমাদের আষাঢ়ে ঘর ভেঙে গেছে।
সে তো এখন বেড়াতে গিয়েছে সমুদ্রের লোভাতুর,
আকাশে নুয়ে-পড়া বৃষ্টির পাহাড়,
রাতভর দীর্ঘ দিবসের বাদল-সংগীতে ভিজতে থাকা,
মায়ের বুকে মাথা রেখে অবিরাম ব্যাঙের ডাক শোনা,
কলাবৃক্ষের ভেলায় ভেসে ভেসে এ-গ্রাম সে-গ্রামের কদমের
গন্ধ পকেটে জমানো—

গায়ের পোশাক খুলে কেঁচো-পিপীলিকার মতো ন্যাংটো হয়ে
সারাক্ষণ নবজলধারা স্বাদগ্রহণ—
উচ্ছ্বাসী কচুবন, শ্রাবণ পাগল-করা রিমঝিম বর্ষার বিকেল—
আখের জমিতে নেশাযুক্ত ভোর,
বয়সী কাঁঠালের জাদুকরি মফস্বল-জীবন—
এসব তো এখন আষাঢ়ে গল্প নয়।

আমাদের ভালোবাসার অবিচ্ছিন্ন দোতারা—বর্ষা এখন বড় ক্লান্ত।
কলুষিত ইঁদুরের ঠোঁটে ঠোঁটে সে-ত্রাণ বিপন্ন আগন্তুক।

দুঃস্বপ্নের গজল

নিরন্তর সময়গুলো পার হয়ে যায় নির্মল উদ্যান থেকে,
বিস্তর অর্থহীন,
অকেজো ঢোল-ডাগরের গর্জনে কেটে যায় মানুষের জীবন,
এ কি কোনো সভ্য ঋতুর বাদন।
পৃথিবীতে অঢেল বাস্তব কাজ পড়ে আছে, আদমের বহর
এক বেলা রুটির নিশ্বাস নিতে নিতে বড় ক্লান্ত।
বৃক্ষদের স্তন থেকে অমরত্ব উজাড় হয়ে গেছে বড় অদ্ভুত
এক চরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাল।
এখনও বিষ বাষ্পময় নখরের উলঙ্গ থাবা এই তল্লাটে খেয়ে যায়
জমির ফসল,
ইতিহাসের সরস বয়ান।
এখনও না-পাওয়ার বিকেলে শুকিয়ে মরে তাজা দীপ্তবান নদী,
দুঃস্বপ্নের ছায়াপাত—নরকের গাঢ় অসুরেরা
এখনও হাঁটছে অসুস্থ নগরে।
নিরন্তর সময়গুলো পার হয়ে যায় দুরু দুরু ঢেউ কেটে।
অন্ধকার ভীষণ অন্ধকারের গজলের সুর ভেসে আসে—
সমুদ্রের ফেনার আকারে।
বড় অর্থহীন এই বিলাপের কাল।

জল ও মাছ-বিষয়ক

১.

জলের ওলানে মুখ রেখে শরীর হেলিয়ে দিয়ে কী করে
মাছেরা এতোটা প্রতিবাদী হয়,
পৃথিবী জোড়া পর্যটক ছাড়পত্রহীন ব্রতচারী হয়।
এ নিয়ে দুঃসাহসী ভালোবাসার কবিতা হোক। এ নিয়ে
জলপ্রেমী মাছপ্রেমী রাজনীতি হোক।
মাছেরাও বারুদের উৎসব-কাঁটা তার ঘের জলসীমা বোঝে,
বিধ্বংসী-নিধনযজ্ঞ বোঝে।
শুধু বোঝে না জালের রাজনীতি—মরুময় বেলেল্লাপনা।

২.

মাছের নিয়ন্ত্রণে কে সেই নিয়ন্ত্রক যে মাছের
ভাষাটুকু বোঝে না,
বোঝে শুধু মাছেরও পাসপোর্ট চাই-পথরোধ চাই,
মাছেরা কি জাগবে না।
ওরাও একদিন বলবে জাতিসংঘের মতো মাছসংঘ চাই।

বাজিকর তোমার ঘুঙুর কি আর জাগবে না

এখনও তোমার নূপুর মলয় হল্লার বাজিকর ধ্বনিস্বর পাই
ফেলে-আসা কৃষকের গ্রাম—শিশিরভেজা লাঙলের বাহক
দুর্বিনীত রাখাল আমি।
শুধু ভাত রুটি
বিষময় সিসার শহর, সংসার যুদ্ধ যুদ্ধ সবকটি বেলা
কেবল মৃত্যুর গন্ধ—মাঝরাতে অশনি কুকুরের বিষণ্ন আওয়াজ
দিনমজুর নারীর কাদা ধুলোমাখা ফুটফুটে লোকটি।
মথুরা বনের আদিময়তা-হারানো নেশায় নেশায় বড় বেশি
কাতরতা মুখর।
রাজ পোশাকের ছায়ায় ছায়ায় তো কখনো ফুটে ওঠেনি
রাতের জোছনা।
মরুময় মধ্যবিত্তের শবদেহ কাঁধে ঝুলিয়ে হেঁটে চলেছি
সেই পিতামহের ভিটে থেকে।
তার পরও তোমার শালপাতা-ঘেরা মোহনীয় অমর্ত্য জনপদ
ডাকছে আমায়।
তোমার প্রকৃতি-দুর্ভেদ্য বারুদের শিস গায়ে মেখে
সেই যে বাউল হয়েছিলাম
বৃষ্টি ঝরা ভোরের রক্তজবা সুখ দেখে সেই যে হাঁটতে শুরু করেছিলাম।
তারপর থেকে শুধুই ছেঁড়াখোঁড়া নদীর মতো কান পেতে থাকা।
সেই থেকে নিস্তরঙ্গ ষড়ঋতুর ছায়ায় ছায়ায় বয়ে চলা।
যেখানে বসে পান্তাভাত,
কাদাজলে গভীর তারুণ্য হারিয়ে ফেলা।
বাজিকর। তোমার নৃত্যের ঘুঙুরগুলো কি আর কখনো
জাগবে না!

খোয়াব

আমাদের অসুখগুলো সুখের ধারাপাতে ঠাঁই হয়ে গেছে,
মানুষ তাই প্রগাঢ় কষ্টে থেকেও বলছে খুব ভালো আছি।
বিরূপ যাতনার স্পর্শে ছাই-হয়ে-যাওয়া একজন অন্যজনকে বলছে
মন্দ নয় একরকম সুখেই কেটে যাচ্ছে কাল।
ঘরপোড়া শকুন—বিনাশি উৎপাতে ক্ষয়ে যাচ্ছে সব—অনিরুদ্ধ জীবন—
তার পরও কেউ-কেউ সংঘপ্রীতির নামে দস্যুতার উন্মাত্ততায়
হায়েনার হাতে রাখে হাত!
মসনদের নেশায় কেউ-কেউ জল্লাদের ভাষায় হামাগুড়ি দেয়,
তার পেছনেও চলে অজস্র হাততালির স্বর।

আমাদের হেমন্ত শরতের জঠোর উল্কাঝড়ের নেশায় বাসা বেঁধেছে
কিছু-কিছু রূপকল্প—অবাঞ্ছিত খোয়াব,
না-পাওয়ার বস্তুই এখন আমাদের মর্মভেদী সুখ অনাকাঙ্ক্ষিত আশা,
না-চাওয়ার বাদলই আমাদের জীবনযাপনের সিঁড়ি
না-বোঝার ঘাতকীয় মুখ—অন্ধগলির পথই হচ্ছে আমাদের রঙিন পথ!

একজন কবির প্রতি

(কবি নাসিমা সুলতানা স্মরণে)

লালনের ঘরের পাশেই তোমার ঘর হলো,
তুমি এখন ঘুমাও,
নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে থাকো কবিতার নন্দিনী।
মাঝে মাঝে স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে এসো—
            লালনের মাজার
            দুঃখের সংসার
            কবিতার বাগান
            গাঁজার আসর
            রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি
তুমি তো এসবই চেয়েছিলে; আর বুক পেতে
দিয়েছিল কিছু শেয়াল-খরগোশের বেলেল্লাপনায়,
তুমি এখন ঘুমাও।
তুমি এখন ঘুমাও সরস কবিতা।

লালিত বসন্তে

যার হাতে রাখি হাত, যার নামে
প্রতি বসন্তে শুনতে থাকি নতুন পাতাদের উঁকি দেয়া
লালিত সুন্দর,
সে-হাতই না না করে চলে যায় দূরে বহু দূরে—
অজানা কোনো-এক নির্বাসিত গ্রহে।
মনে হয় এইখানে সারাক্ষণ বিষণ্ন ক্ষরায় ক্ষরায়
সব কঙ্কাল—কুঁজো হয়ে গেছে মানুষের প্রেম।

যার বুকে বুক রেখে নদীদের কান্নার সুর শুনেছিলাম
কোনো-এক উজ্জীবিত রংধনু সন্ধ্যায়,
সে-মুখ এখন শুধু পাষাণহৃদয়ে বারবার পৃথিবীর
উলটো গহনে নিয়েছে ঠাঁই।
যার হাতে রাখি এই বৃদ্ধ হাত সে-হাতই না না করে
চলে গেছে দূরে বহুদূরে—ফিরিয়ে নিয়েছে মুখ।

অনেক দিন পর

এই যে তুমি তুই বলে এক ছড়িয়ে দিলে নিত্যবারুদ ছায়া,
আকাশ ভরে জাগিয়ে দিলে কস্টবোমার রুগ্‌ন মায়ার চলা—
ছুড়ে দিলে নানা রঙের প্রশ্নগুলো ছুরির মতো বিদ্ধ করে
এই সকালে কোমল আলোর বহতাকে আঁকড়ে ধরে—
এ কি তোমার একা একাই
খুঁজতে থাকা—শিশিরভেজা রাত্রিজাগা ব্রহ্মপুত্রের ছিন্নভিন্ন
ঋতুচক্রের ঘণ্টাধ্বনি?
শিল্পাচার্যের হাঁটার পথের ধুলোবালি
এখনও তো তোমার ভেতর কেমন করে সারাবেলা ঘুমিয়ে
থাকে—কেমন করে দিনেরাতে অধিক রাতে
এখনও যে তাজমহলের ঢেউ খেলে।
সুরমা নামের স্রোতের সাথে শাহজালালের স্বপ্নের ঘোরে
এখনও যে আড়ি পেতে হারানো সব যুগের টানে,
বনমানবীর ছায়ার মতো—তুই যে আমার—ছড়িয়ে গেল
সবখানে আজ ছড়িয়ে গেল অনেক অনেক হারিয়ে ফেলার
পোড়াকালের বয়ান নিয়ে জ্বলে জ্বলে এসে গেল পৃথিবীতে
হারিয়ে যাওয়া পাতাগুলোর কান্নাধ্বনি।
কেষ্টা বেটার ঘাড়েই চাপে সকল যুগের ঘষে মরা ঝরাধারা—
অবশেষে তুমিও তো—তুই যে আমার—যুদ্ধাবানে ভাসিয়ে দিলে
মনের ভেতর ঘুরতে-থাকা অসহনীয় জ্বালায় ছায়ায়।
এমন অনেক ছিলোই তোমার আদিকালে জাগিয়ে তোলা।
কবির ঘরের বাতাসজুড়ে
যখন-তখন কোমল বনে দুলতে দুলতে হারিয়ে যাওয়া।
এখনও তো পাঁচশো লাইনে অন্তরঘেরা ছেঁড়াখোঁড়া, দিঘল
রাতের হামাগুড়ি আসছে ধেয়ে পোস্ট অফিসের বড়ো খামে
তুই যে আমার—গল্প নিয়ে
আসছে ধেয়ে রাজধানীর ওই বুকে বুকে ছড়িয়ে দিয়ে
তপ্তকালের কথামালা অন্যবায়ে ভোর কাঁপিয়ে এলো ধেয়ে।

হুমায়ুন আজাদ তোমার জন্যে

তোমার রক্তাক্ত দেহের বিলাপে কেঁপে উঠেছে
প্রতি মুহূর্তের বাংলাদেশ।
হাসপাতালের শয্যায় তুমি একা নাও,
মত্যুর সঙ্গে আজ পাঞ্জা লড়ছে পুরো স্বদেশ।
তোমার জীবন বাজি রাখার সঙ্গে,
তোমার কালজয়ী জঙ্গি বোমারু 'পাকসার জমিন সাদবাদ'-এর
মানবতাবাদী কথামালার সঙ্গে—
আর ঘাতকের নির্মম চাপাতির অনুর্বর রক্তপিপাসু
বেহায়াপনার বিরুদ্ধে—
কুলাঙ্গার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আজ আগুয়ান
বাংলার মাটি, মানুষ, জনতার অগণিত
দুর্বার মিছিল।
এই মৃত্যু-পরোয়ানায়—হাসপাতালের কষ্টময় তিমির গহনে
তুমি শুধু একা নও।
তোমার হৃদয়ের সাথে শুয়ে আছে চোদ্দ কোটি হৃদয়।
তোমার পবিত্র শানানো কলমের উজ্জ্বলতা আজ ছড়িয়ে পড়েছে
শোভিত পৃথিবীর ঘরে-ঘরে—
বিশ্ব আজ প্রার্থনার জোয়ারে কাঁদছে তোমার জীবনভিক্ষার জন্যে।
ঘাতক—তোমার নৃশংসবাজির জবাব দেবে একদিন এই ভূখণ্ডের তামাম
প্রজাপতি—ছায়াময় ক্ষুব্ধ
রাজপথ। যে আমার অহংকারের সুনিশ্বাসে স্তব্ধ করতে চেয়েছে পোড়া
উপত্যকায় নির্লজ্জ কুৎসিত অস্ত্রের ভাষায়—
ওই জল্লাদের কুকর্মের উলঙ্গ কথা লেখা হবে
শান্তির ঘাতকদের খাতার পাতায়।
হুমায়ন আজাদ শান্তির দূত—
তোমার সাহসী হাত-চোয়াল-গলদেশে যারা বিদ্ধ করেছে
নিষ্ঠুর চাপাতির নির্মমতা—
এ-অন্ধকার সইবে না কোনো পথ-প্রান্তর-মানুষের অন্তর।
এ-পাষাণী ঘোর দুঃসময় শুধু তোমার একা নয়,
এ-আঘাত ছুঁয়ে গেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য দিগন্তে
এ-আঘাত ছুঁয়ে গেছে সমগ্র বাংলাদেশ।

সুন্দরের অপেক্ষায় থাকি

সাত মহলায় থাকো। আকাশছোঁয়া চাঁদ তারার স্পর্শে রাত
কেটে যায় জোছনার শিয়রে।
প্রতিটা ভোরের শিশির এসে তোমার জাগরণের সংবাদ দেয়।
জানালার ফাঁক দিয়ে তোমার রুপোলি চুলের গন্ধ এসে মাতিয়ে
দেয় আমার ঘর। কবির সকাল।
বিবাগী বিহঙ্গের স্বপ্নচাষ, সরিষা ফুলের মাতাল শিহরন।
দূর দিগন্তে বয়ে-চলা কচ্ছপের স্পর্শ পায়,
তবুও বহুকাল তোমার গায়ে-মাখা পারফিউমের জাদুকরি টান
আমার দিনের সবকিছু তছনছ করে যায়।
রাজকীয় নদীর ঘুমিয়ে থাকার মতো
তোমার অভিমানী নিশ্বাস আমার
বাস্তুভিটায় পাগলের নেশায়
প্রতিদিন আকণ্ঠ হৃদয় একটু একটু করে খোবলে নিয়ে যায়।
তোমার নীল চোখের বেহিসেবী দৃষ্টি ছোঁয়াবার অপেক্ষায়
থাকতে থাকতে অগণিত কাল বয়ে যায়।
ঝিমধরা বাউলের ধ্যানমগ্ন অস্বাভাবিক জীবন বয়ে যায়।

সাতমহলায় পরীদের সংগীতের উৎসবে থাকো।
অবারিত ভালোবাসায় সময়ের বেহুলা তুমি
ঘাসের গান কীটপতঙ্গের জ্বালা তো
তোমার ভেতরে বাজবার কথা নয়।
অনাহারী মৃত্তিকার কাঁটাঘেরা দুঃখভার বোঝার কথা নয়।
তবুও দীর্ঘকাল জানালার ফাঁক দিয়ে আসা
সুন্দরের অপেক্ষায় থাকি।
অথচ সাতমহলার বাসিন্দা তুমি। অনেক অনেক দূরের উন্মত্ত সুখ।

সেইসব দিনযাপন

কাউনের জাউ আর গ্রাম্যমেলার বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা
এখনও আমাকে টানে।
ঘুঘুর ডাক শুনে বৃক্ষের দিকে চেয়ে থাকা—দিনভর চেয়ে থাকা
বাঁশিওয়ালা মনুমিয়ার সুর এখনও আমাকে অজস্র
চিরায়ত মেলায় ডেকে নিয়ে যায়,
শুধু কি গুনটানা মাঝির হেঁটে চলা?
টেনে টেনে অনবদ্য কিশোরবেলার রাতভর যাত্রাদলের জলসায় বিবেকের গান
শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া
আসরশেষে মাটির কলস ভরে খই উখড়ো-বাতাসা
আর রূপবান ফজলের সঙ্গে আড্ডায় মজে
ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরা।
এই হচ্ছে আমার বৈশাখে ঘুড়ি ওড়ানো কাল।
কোনো কোনো রাতে ঘরের দরোজা বন্ধ হয়ে গেলে—
বাড়ির বাংলোঘরেই ঘুমিয়ে পড়ার রাতগুলো
এখনও আমার নববর্ষ—আর পয়লা বৈশাখ।
দাদির জন্যে দূর হাট থেকে সাচিপান—কাঁচা সুপারি,
ঈদের নামাজশেষে বেলুন নিয়ে ঘরে ফেরা
দশমীর মেলায় রাত কাটিয়ে দেয়া
মার জন্যে ছানার রসগোল্লা
বোন খুশির জন্যে চুলের ফিতা
ট্যালকম পাউডার—কিছু চিরুনি—
প্লাস্টিক আর বাঁশের বাঁশি ফুঁকতে ফুঁকতে
নৌকোর ছইয়ের ভেতর লুডু খেলা।
এখনও প্রতিনিয়ত আমাকে টানে।

বটতলার ধুলোবালি

বটতলায় দাঁড়িয়ে কবিতা শোনার কথা কি তোমার মনে পড়ে?
চারপাশে সেনাটহল—টিএসসির ভিটায় মেশিনগানের নল মধুর
ক্যান্টিনের দিকে হাঁ করে আছে।
ক্যাম্পাসের ক্ষুদ্র কীটও গর্জে উঠেছিল সেদিনের জলসায়।
বটতলা বড় সাহসী আঙ্গিনা। ওর নাকের ডগায় স্টেনগানের বারুদের গন্ধ
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভিড়ের মধ্যে—
কবি গাইতে লাগলেন—এই অস্ত্রের মহড়া আমার ভয় পাবার কথা নয়;
মেশিনগানের গোলাকে ধ্বংস করে দিতে আমার এই
কবিতার বয়ানটুকুই যথেষ্ট।
কবি বললেন, আপনারা আমার কবিতার কথা শুনুন—কবিতার
চিত্রকলাকে দেখুন—একবার
তাকিয়ে থাকুন বটতলার বৃক্ষের দিকে
বটতলার কিছু ধুলোবালি গায়ে মাখুন,
দেখবেন ওদের স্টেগানের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।
মধুর ক্যান্টিনের সম্মুখস্থ ঘাসের বুক থেকে সংগ্রামের বাণী শুনুন,
জহুরুল হক হলের যেসব কক্ষে জল্লাদের পাশবিকতা
নখের চিহ্ন রয়েছে—সেখানে নীরবে দাঁড়ান।

দেখবেন, হায়েনার রক্তাক্ত হাত কেঁপে উঠবে।
বটতলার কবিতা সে তো অনিন্দ্য মুক্তি-স্বাধীনতার দিকে বয়ে চলা।
ভাষার জন্যে অজস্র রক্তাক্ত শ্লোগান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।
বটতলার সেই কবিতা শোনার কথা কি মনে পড়ে না?
কবিতা শুনতে শুনতে মিছিলে ঝাপিয়ে পড়ার কথা তোমার
কি একবারও মনে আসে না?
চারদিকে মড়ক! স্বৈরস্বরের বারুদমাখা প্রহর
তুমি বটতলার নাগরিক। বইখাতা হাতে নিয়ে মিছিলে
রেখেছিলে পা।

বরগুনা সুন্দরী

বিসর্জনের এমন রঙিন দুন্দভি নেশা কোথায় পেলে বরগুনা সুন্দরী।
খ্যাপা বাউলের চলার গতি যেন তোমার জলবিদ্রোহের ধারা
সাগরের বুকে বুক রাখার
এই অবিরাম বিসর্জনের নেশা
কোথায় পেলে বরগুনা সুন্দরী।
তোমার কি গৃহে ফেরা নেই?
তুমি কী আজন্ম বঙ্গোপসাগরের কাছে ইজারা রেখেছো
অশ্রুপুঞ্জ ঘুমের প্রহর?
তুমি কি আর কখনো ফেরাবে না মুখ এই দুঃখঘেরা
মাঝিমাল্লার দিকে! দরদী
কৃষাণীর দিকে কি একবারও ফেরাবে না অবসন্ন মুখ?

তুমি বড় ক্লান্ত। খুব শ্রান্ত তুমি হে পায়রা নদী।
তার পরও মহাসাগরের পেটের ভেতর হেঁটে চলেছো অবিরাম।
তোমার কানে-কানে উদ্দাম সংগীতে কিছু গারো নারী প্রত্যহ এসে
চুলের গন্ধ ঢেলে যায়,
আমতলির মাঝি নোয়াব আলীদের বুকের নিশ্বাস,
সমুদ্রপারের পোনা শিকারি সাহসী জীবনের ভালোবাসা নিয়ে তুমি
কোথায় চলেছো বরগুনা সুন্দরী।

অমরা বক ও নশ্বর খেয়া

বিষাদের ছায়ায় বুঁদ-হয়ে-থাকা অসহনীয় ভোরের গর্জন
প্রতিদিন নেমে আসছে এইখানে!
সাজানো সভ্যতায় মহাপতনের ঘাতকীয় শব্দ ঝড়ে
ক্ষয়ে পড়েছে মানব পৃথিবী!

চিরায়াত বসন্তের মুখ বড়ই অসহায়,
কালো মেঘের বিবরে নিয়েছে ঠাঁই!
প্রেমের বাঁশি বাজিয়ে কারা যেন ঘরদোর-উঠোনে
বিভীষিকাময় অবসাদ ছড়িয়ে যায়!

পথে পথে রক্তমাখা ধুলোর জোয়ার,
কোথায় চলেছে পার্বতীপুরের স্থাপত্য নিদর্শন,
সুবর্ণগ্রাম থেকে লালবাগের কেল্লা এ কেমন ম্রিয়মাণ,
অমরা বকের নীড়,
পিঁপড়ের নাকফুলও এখন খসে পড়ছে সবখানে!

বিপদের ছায়ায় বুঁদ-হয়ে-থাকা জীর্ণকায় ভোর
প্রতিদিন নেমে আসছে এইখানে!
জীবন এখন অধোমুখী নশ্বর খেয়ায় চলেছে ভেসে।

হার্মিটাজ এবং লিটা ম্যাডোনা

শাবাশ হার্মিটাজ! তোমার বুকে পৃথিবীর অজস্র শিল্প বন্দনার মালা
গেঁথে চলেছে লেনিনগ্রাদ ।
একশত চব্বিশটি মিউজিয়ামের উচ্চারিত রূপায়ণ বিশ্ব-সংস্কৃতির
জ্বলজ্বল ক্যানভাস,
নানা ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভারে নুইয়ে পড়ছে তোমার আঙিনা! সমগ্র ইউরোপ
এশিয়ার আদিমতা, যুদ্ধ-দুঃখ-সুখের
মেলা জমেছে তোমার বিপুল ভাস্কর্যের খোঁয়াড়ে ।
উইন্টারপ্রেসে জর্জ হল, গোল্ডেন ড্রয়িং কক্ষ, প্যাভিলিয়ন হল, দ্যা ভিঞ্চির
আঁকা লিটা ম্যাডোনা—
পাবলো পিকাসোর বিশ্বজয়ী ক্যানভাস, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি,
আর পিটার দ্যা গ্রেটের যাবতীয় স্মৃতিভার বিপুল স্বর্ণোৎসব জমে উঠেছে ।
নেতানেত্রী তার প্রেসব্রিজের ভালোবাসায় জড়িয়ে রেখেছে উইন্টার প্রেস ।
হার্মিটাজের শত শত ভাস্কর্যের মূল
নেভার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা যুদ্ধজাহাজ আরোরা ক্রশিয়ার
পিকচার গ্যালারিতে পৃথিবীর
দরদি শিল্পীদের তুলির আঁচড় আর উচ্চকিত ক্যানভাস প্যাভিলিয়নের
বন্দনা করে চলেছে লেনিনগ্রাদ ।
পিটার গেটে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির আঙিনাকে ।
ফিরে আসে না চোখ পিটারের শয়নকক্ষ দরবার হলো,
কার্ল ব্রিলভের আঁকা পৌরণিক ধ্বংসযজ্ঞ ।
ফিরে আসে না আমার দৃষ্টি ফোয়ারা রাশিয়ার বীরযোদ্ধাদের সাজানো ভাস্কর্য
থেকে ।
একশত চব্বিশটি জাদুঘর ভবনের স্বর্ণ তৈরি নকশা,
পিটার এবং পল এর ক্যাথেড্রল থেকে
সামার গার্ডেনের ঘোড়াদৌড় থেকে ফিরে আসে না আমার চোখ

শাবাশ হার্মিটাজ! তোমার বুকে জ্বলজ্বলে ঐশ্বরিক ভায়োলিনের
মূর্ছনায় প্রত্যহ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে লেলিনগ্রাদ ।
তোমার দিকে তাকিয়ে থেকে পৃথিবীকে হাজার বছর ধরে ভালোবাসা যায় ।

গ্রহদের সংসার-দর্শন

এসো ডালপালা। এসো নদীস্রোত, ভুজঙ্গপোকা। আমরা
মহাশূন্য হোটেল-যাপনে যাই।
পৃথিবী তো ক্লেদে নষ্ট ঋণে বুদবুদ—কুঁজো হয়ে গেছে।
অবিশ্বাসী চোখ ক্ষরণের জোয়ার আর বিষাক্ত পিঁপড়ের দাঁতালে
বাসযোগ্যহীন হয়ে গেছে।

এসো গ্রাম্য গায়কের দোতারা। এসো হাওড়ের মাছ
আমরা মহাকর্ষ বিকেল দেখে আসি।
পৃথিবী তো সীমান্ত সীমান্ত রোগে পঙ্গু হয়ে গেছে।
ছয়শত কোটি মানুষের হাসপতাল হয়ে গেছে পাখিদের
চোখের জলভরা সাধের পৃথিবী।
এসো শৈশবের ঝিমদরা কানামাছি—ভ্রমর উৎসব,
এসো কৈশোরের শিশিরভরা শীতের ভোর
এসো ঘাস ফেলে আসা অজস্র
নিদ্রাহীন রাত এসো
আমরা মহাশূন্যে গ্রহদের সংসার-দর্শনে যাই।

টাইমস্কয়ারে যখন গানের আসর ভেঙে যায়

টাইমস্কয়ারে যখন গান ধরেছিলো ওরা। হাওয়াই গিটারের সাথে ঢোলের লহরি
সে কী অবাক-করা বর্ণবাদবিরোধী বয়ান।
সেই রাতের কোরাস গান মার্কিন পুলিশের তাড়া-করা লাঠির প্রহারে
মুহূর্তের মধ্যেই আসর ভেঙে গেল।
হার্লেম নদীর শীতার্ত বাতাস, জলকাকালি, রাত্রির ধ্যানে আচ্ছাদিত
চাঁদের ছায়ায়
অসংখ্য পথচারীদের দৃষ্টি আছড়ে পড়ে এই অসভ্যপনায়।
পৃথিবীতে কী এমন হল যে রাজপথে গানের আসর হবে না—
অদূরে টু-ইন টাওয়ারের আলোকিত প্রহর তাও যেন কষ্টের বারুদে
ঢেকে গেল,
তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ গায়ক।
একজনের হাত থেকে খসে পড়লো সুললিত গিটার,
অন্যজনের দুহাতের আঙুল থামিয়ে দিল ঢোলের তাল
আরেকজনের মুখ থেকে হঠাৎ উবে গেল যন্ত্রণামুখর
গানের কথামালা।
আমেরিকার পুলিশ এতোই বেরসিক—
যারা পথে বসে মদ সিগারেট, এটাসেটা
বিক্রি করছিলো তাদের প্রতি লাঠিপেটা নেই
রাজপথে যারা গণিকাদের সাথে দামদস্তুরে ব্যস্ত তাদের জন্য লাঠিতাড়া নেই
অসংখ্য যুবক-যুবতী খোলা আকাশের নিচে চুমোচুমি এটাসেটায় ব্যস্ত
তাদের জন্য লাঠি তাড়া করা নেই—
কেবল তিনজন যুবক যারা গানের বিনিময়ে খাদ্যের পয়সা
জোগাতে ধরেছিল গান
ধরেছিল শাদাকালোর ভালোবাসার গান,
যারা বিদ্বেষী বর্ণবাদের কঠোর সমালোচনায় ধরেছিল গান—
তাদের গিটারের সুর,
তাদের ঢোলের শব্দলহরি
তাদের রোজগারের বাণীই স্তব্ধ করা হল।
ঘুমহীন নিউইয়র্ক নগরীর বুকে এ যেন অসহনীয় গভীর রাতের ক্রন্দন।
যারা গান শুনতে পারে না,
সুন্দরের আরাধনা শুনতে চায় না
ক্ষুধার্ত মানুষের ঢোলের শব্দ বুঝতে চায় না
সেখানে *লিবার্টি অভ স্ট্যাচুকে* দাঁড়িয়ে থাকা বড় করুণ মনে হয়
জাতিসংঘের বিশাল অট্টালিকাকে বড় অসহায় মনে হয়।
হাডসন নদীর তীরে টাইস্কয়ারে সেই রাতে এ আমি কী দেখলাম!

দুধভাত

দুধভাত এখন পুঁথির পয়ারে লোকগাথা কোরাস গান,
দুধভাত এখন প্রাচীন পুস্তকের মুখস্থ-করা পদ্মা,
দুধভাত এখন অনেক দিনের আগের বুড়োদের গল্প।
দুধভাত এখন বানিয়া দোকানের অতিশয় পুরনো তেঁতুলের সর,
দুধভাত এখন ন্যাংটোকালের ধুপধাপ পুকুরের জলে নামা।
দুধভাত এখন চাঁদের বুড়ির মতো চরকায় সুতো কাটাকাটি।
দুধভাত এখন হাজারো বছর পূর্বে কোনো-এক গ্রামে হাঁটাহাঁটি।

আবার সেই ছন্দহীন জীবন

যুদ্ধে তো হারিনি,
হেরে যাচ্ছি বিষণ্ন অবক্ষয়ের ছাকলবাকলের কাছে,
যুদ্ধে তো কখনো পেছনের বেলেল্লাপনায় রাখিনি চোখ।
এখন আমরা সকলেই অন্ধ।
আমাদের সেই যে প্রসন্নতাকে ছিন্ন করে সম্মুখে বয়ে চলা
সেই শক্তিময়তা আজ ভোঁতা হয়ে গেছে।
যুদ্ধে তো অসহনীয় বর্বরতাকে আমরা ছেড়ে দিইনি।
হেরে যাচ্ছে এই কষ্টে-পাওয়া পাখিদের শস্যভূমি।

পাথরের মানুষ

এইসব গান

একটি কারাগার থেকে বের হতে-না-হতেই
আর-একটি কারাগারে ঢুকে যাই,
কারো নাম ঘর, কারো নাম পথ,
কোনোটা আবার বাস, লঞ্চ, ট্রেন হয়।
এইভাবে প্রত্যহ আমার সম্মুখে অজস্র জেলখানা
বন্দিত্বের শিকল নিয়ে আসে—
দাসত্বের অগ্নিকণা, যাতনার বিড়ম্বনা নিয়ে আসে।
তবে কি আমার জন্মই হয়েছে এইসব মর্মবেদনার জন্যে?

প্রতিটি প্রহর এখন কষ্ট বমি করছে।
জল-স্থল, লতাপাতা, মাঘের শীত, পাখির কুহুতান,
নদীনালা, মাটি-আকাশ, শিশুর খেলাধুলা,
সবার মুখ থেকেই ঝরছে চৈত্রপল্লীর স্বর।
যেদিকে তাকাই দুর্বিসহ বহমান, অসুরের স্তবস্তুতি থেকে
আদমের ঔজ্জ্বল্যমান গহনে যাওয়ার সে কী প্রার্থনা,
নুড়িপাথরও এখন মধ্যরাতে মুক্তি চাই বলে
চিৎকার করে ওঠে।
চারিদিকে আজ এতোই ভালোবাসার অভাব,
কেউ-কেউ চাঁদের দেশে যায় কিনে আনতে প্রেম,
মনে হয় পৃথিবী আজ আক্রান্ত হয়ে গেছে অন্ধকারে,
ঘরে অন্ধকার
পথে অন্ধকার
জলে অন্ধকার
স্থলে অন্ধকার
এতো ঘোরতর অমানিশা কতটুকু গ্রহণ করা যায়!

একটি রোগ ম্লান হতে-না-হতেই আর একটি
অসুখের তীর এসে বিদ্ধ করে আমায়
কারো নাম গণতন্ত্র, কারো নাম অর্থনীতি, শিক্ষা,
সমাজনীতি হয়—
তবে কি আমার জন্ম হয়েছে এইসব যন্ত্রণার জন্যে?

গণতান্ত্রিক শহর

আমি একটা শহর খুঁজছি!
যার বুকজুড়ে সন্ত্রাস নামের কোনো রোগ শোক থাকবে না,
যার রাজপথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
আমাদের জননীরা বলতে থাকবে
এই তো আমার গণতান্ত্রিক শহর!
যে-শহরের নেশায় শহীদ নূর হোসেন বুকে পিঠে ধারণ করেছিল
অমর কবিতা,
"গণতন্ত্র মুক্তি পাক
স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক" ।
আমি সেই নিষ্পাপ শহরকে খুঁজছি ।

স্বপ্নহননের কালে

১.

তুমি তো কখনো দুঃখী বৃক্ষের বিলাপ শোননি,
কি করে বুঝবে পৃথিবী কখন একা কাঁদে।
কখনো তো ভোরের শিশিরের অসহ্য ঘায়ে দাওনি হাত,
তা হলে কীভাবে জানবে দগ্ধ কবির কী কী নিঃস্ব হয়ে যায়।
অসুরের চিত্র এঁকে এঁকে এক পা রেখেছো বিপর্যস্ত গ্রামে,
অন্য পা দুলছে গণতন্ত্র পিষণের করুন চাকায়,
এই সিঁড়ি কাকে ভাঙে—কার কতোটুকু নিশ্চিহ্ন করে,
কার মধুময় বসন্ত ছিন্নভিন্ন, উদাস করে যায়—
তার ঠিকঠাক নেই।

২.

কোনো কোনো মানুষের মুখ দেখে সারারাত আমি
একা একা জেগে রই,
কোনো কোনো মানুষের মুখ দেখে আমাকে পুরনো
পুঁথির গভীরে ডুবে যেতে হয়।
কারো কারো মুখ সমুদ্রের ফেনার আকারে আমাকে,
শুধু আমাকেই নির্বাসিত শ্যাওলায় জড়িয়ে ফ্যালে।

স্থলপদ্মের হাওয়ায় হাওয়ায়

এখনও মাটির কণা ছুঁয়ে স্বাদ নিলে হৃদয়স্পন্দনে
দুঃসংবাদগুলোর তোলপাড় শুরু হয়,
বিনাশের রেখে যাওয়া বহ্নিকুণ্ড স্মৃতির পাতায় পাতায়
মনে করিয়ে দেয় সারি সারি নীহারিকা মুখ।
এরই মাঝে তীক্ষ্ণধার বর্শার ফলা আবারও বিদ্ধ করছে
শোকাচ্ছন্ন মুখ।
পাঁজরে ছিন্নভিন্ন অসুরের দাগ মুছে যেতে-না-যেতেই
সাপের মতো ফসফরাস ; চারদিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে গিলে নিতে চায়
আদি প্রজাপতি—জীবনের গূঢ় বসন্ত।

আমাদের শিকড়ছেঁড়া বৃক্ষের গভীর কুয়াশা
মুছে যেতে-না-যেতেই
কী এক বিপর্যস্ত স্রোত দৈত্যের ডানা মেলে উড়ছে
এই উপত্যকায়,
নিঃস্ব মাকড়শার সুতো ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা,
চুমুকে চুমুকে হজম করছি ঘাতকের তীর-ছোড়া বিষ,
আমরা কি এতোই ছন্দহীন যুদ্ধহীন আরশোলা কেউ,
চিরায়ত পাহাড় ভেঙে পড়ছে—
তার পরও শীর্ণকায় পাতালে নেমে পড়ছে জীবের মিছিল,
নটীর ছায়ায় ছায়ায় ভোরগুলোর অন্তর থেকে খসে পড়ছে
আলোকিত মুখ—
তার পরও কেন চোখ বুজে পড়ে রবো ছেঁড়া আকাশে?

যুদ্ধ এবং আমার সন্তান

আমার সন্তানকে আমি কখনো শহরের দুঃখময়
পাহাড়ে রাখবো না।
এখানে মানবতা খুব বেশি ঘাতকের তীর হয়ে
রাত্রির কুয়াশা হয়ে বুক দাবড়ে কাঁদে!
সে থাকবে,
গ্রামের শান্ত নীলিমা—কৃষকের সমুদ্রসমান
অন্তরঙ্গ উৎসবে,
শিখবে হৃদয়-ছোঁয়া স্বর্গের অল্পসল্প গান।
যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায়,
সে কাউকে না-বলে হাতে লাঙলের বাঁট নিয়ে চুপচাপ
বের হয়ে যাবে।
রক্ষা করবে বীরের দাপটে জেলের জাল
কৈবল্যধাম,
জেরুজালেম, গাজা উপত্যকা।
জান দেবে সালমান রুশদির মতো
সঠিক ইতিহাসের জন্যে।
মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, অসুর প্রকৃতির
কোনো তানপুরা ছোঁবে না
আমার রক্তের প্রতিনিধির প্রাণ।

সে থাকবে,
বুড়িগঙ্গায় সার্বভৌম জলের পাহারায়।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষার জন্যে
আমি আমার সন্তানকে পাঠিয়ে দেবো
আবাল্য নিরপেক্ষ গ্রহে।
যেখানে সহসা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
শোনা যায় নেলসন মান্দেলার কণ্ঠস্বর।

গোলাপ ও শিশুকাহিনী

একটি পারমাণবিক বোমার চেয়ে
একজন শিশুর হৃদয় কম শক্তিশালী নয়;
শিশুরাই পারে
এ বিশ্বকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে।
জন্মের পরই সব শিশু সকল গোত্রের
ফুলের মতো অসাম্প্রদায়িক হয়।
পৃথিবীতে সকল ক্লেশ, যুদ্ধ, বোমার আঘাত
ঠেকাতে ওরাই যথেষ্ট।
জন্মের পরই প্রতিটি শিশুর হাতে
একটি করে গোলাপ তুলে দাও;
যেন তার আত্মা মানবিক সুরে পুষ্ট হয়,
যেন ওর চিরকাল সময় কাটে লৌকিক গ্রহে।

একটি শিশুর চিৎকার হাজারো বোমার
গর্জনের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়,
তাই প্রতিটি শিশুর জন্ম মানুষের জন্যে
খুবই সুখের, খুবই আনন্দের।

যুদ্ধ

অসহ্য কাঁকর-মাকড়, খোঁড়াখুঁড়ির যুদ্ধে আছি।
রাতে লেখার্র টেবিল থেকে কখনো কখনো দুঃসংবাদের ঠেলায়
বৃষ্টির আকারে কলম মাটিতে পড়ে যায়,
কত কিছু ঘটে পৃথিবীতে। চাওয়া না-চাওয়ার উৎসরণ।
আগাছার চরিত্রে রাজধানীতে রাস্তাঘাট নির্মম দুলুনি খায়।
অসংখ্য আততায়ীর বিষক্রিয়া সমাজদেহে মিশে গেছে।
শ্যাওলার কুঠার, বেআব্রু হাতুড়ির শব্দে
ঘুম ভাঙে না-খাওয়া মানুষের।

আমি কৃষকের সন্তান। দাবদাহের দহন দূর করতে এসে
নিজেই জ্বল মগ্নে নিয়েছি ঠাঁই।
কঠিনের ঠুকঠাক শিকড় ছিঁড়তে এসে
নিজেই কাঁটার শিকার হয়ে গেছি।

সেই চিল

ভোরের সমুদ্র, শস্য মাঠ আর শিশুর হাসিমুখ ছাড়া
আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।
নিজেকে এতো বেশি মৃত পাহাড়ের খোঁড়া ভূমি মনে হয়,
যেখানে হাত রেখে চারদিকে তাকালে শুধুই বিলাপ ভেসে আসে,
যার শেষ চূড়ায় বসত করে আমাদের সমস্ত জীবনের সন্ন্যাস।
আমাদের স্বপ্ন, হাসি-মর্মবোধ, ভালোবাসার চর্চা
সবই চুরি হয়ে গেছে।
ওই পর্বতের বিষফোঁড়ায় কারা যেন বন্দি করে রেখেছে
শান্তি আর মধুময় রাত।

আছি, এক লাবণ্যহীন ছেঁড়াখোঁড়া মরুঁর প্রান্তরে।
মনে হয় পুরো পৃথিবীটাই আজ
বেদনার জ্বলন্ত পাহাড় হয়ে গেছে।

কিছু শাদা পাখি—
কোমল নিশিতে বাগানভর্তি গোলাপ ছাড়া
আমার কোনো স্মৃতি নেই,
একরত্তি সুন্দর শালবন,
গণতান্ত্রিক শালিকের নিশ্বাস ছাড়া
আমার কোনো চাওয়া নেই।
তোমার আঁচলের মুঠি থেকে দুঃস্বপ্নের নুড়িগুলো
ছুড়ে ফেলে দাও।
ওখানে ওড়ুক মায়াবী কালের চিল।

খুব বেশি প্রেম-দ্রোহী হয়ে যাচ্ছি

আকালের বিগ্রহে প্রত্যহ গুচ্ছ গুচ্ছ প্রজাপতি ঝরছে,
আকাল ছুঁয়েছে প্রেম ; তোমার-আমার বেঁচে থাকা ।
বাতাসের গোঙরানো শব্দের মতন ঝাউবন ঢলে পড়ছে,
গ্রামের রোদেলা পথে যেতে যেতে
হঠাৎ কার যেন জীবন নুয়ে পড়ে,
ঘাম ঝরা কৃষাণীর শরীর আধুনিক সভ্যতার কোলে—
হরহামেশাই হারিয়ে যায়,
ওরা কোথায় যায়! কেনইবা যায় । ঠিকঠাক নেই ।
তার পরও যায় ।

এখন কিছুই হচ্ছে না,
সমগ্র পৃথবীজুড়ে বেলেল্লাপনা, নিষিদ্ধ গর্জন ।
নটীর বহর এই সেই দিন ঝাঁটার খোঁচায়
ছেড়েছিলো বাগান,
আবার সেই তীরের বেহায়াপনা সাম্প্রদায়িক বেশে,
স্বস্তির কতোটা কাল যাবে এইভাবে ।
পায়ের তলায় যে-হুলের বীজ পুঁতে ফেলেছি,
সেও আজ দাপটে মানবিক কর্ষণের স্বপ্ন দেখে ।
আমরা মানুষ—
কেউ-কেউ সেইসব দজ্জাল মেঘের ভিড়ে
বুক টান করে দাঁড়াই
তুচ্ছকে করি আলিঙ্গন ।
আমরা খুব বেশি প্রেম-দ্রোহী হয়ে পড়ছি ।
ভুলে যাচ্ছি উদ্বাস্তু সময়
ভুলে যাচ্ছি কঠিনের বিড়ম্বনা
ভুলে যাচ্ছি কালিমামুখর কাল ।
ভুলে
যাচ্ছি মনন্তরের গল্পমালা ।

এখন কিছুই হচ্ছে না শুধুই বিশ্বাসে ক্ষরণ,
সত্যকে ছুঁয়েছে অভিশাপ,
কেবল নোংরা—গিধড়বাজি গজলে ডুবে যাচ্ছে কাল ।

শেষ বসন্তে

ওই জানালাটা খুলো না কখনো! নির্মম বসন্ত গেছে
ওই পথ দিয়ে!
রাত্রির জ্বলন্ত চিতা ছুঁয়ে গেছে আদিগন্ত চর,
দেবদারুর কুহুতান তারই থাবায় নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।
ওখানে রেখো না হাত—
ক্ষয়ে যাবে মানবিক সাজানো বাগান
ভুলেও রেখো না চোখ বিদগ্ধ বৃশ্চিক শিকে,
নুয়ে যাবে উঁচু পাহাড়ের সিনা।
মৃত্তিকা হারিয়ে গেলে
শিশুদের কোলাহল রবে কিসে!

ওই জানালাটা কখনো ছোঁবে না। নির্মম লিলিরা গেছে
ওই পথ দিয়ে—
তার পর থেকে,
পৃথিবীতে সমস্ত পুষ্পের প্রাণ নিরন্তর হয়ে গেছে।

দুটি কবিতা

ক.

মানুষেরা কি কখনো জঙ্গলে যায়?
অথচ প্রত্যহ
মানুষের গৃহে কোনো-না-কোনোভাবে
জঙ্গল ঢুকে যাচ্ছে,
কেউ তা দ্যাখে না।

খ.

যখন যাবো না, একেবারে কোথাও যাবো না।
যখন যাবোই, তখন সর্বত্র যাবো।
আমার কাছে নিষিদ্ধ বলে কিছুই নেই,
নিষিদ্ধ শব্দটিকে আমি ঘৃণা করি,
একদম মনেপ্রাণে ঘৃণা করি।

পূর্ব গ্রহান্তরে

এই পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল আমার পিতামহ,
তারও পূর্বে কয়েক পুরুষ,
আমি এর নোংরা দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।
এর অসুখ হলে আমার অসুখ হয়,
ভূমণ্ডল রুগ্ন হয়ে পড়ে।
এই ঐতিহাসিক বৃদ্ধের শরীরে ধুলো জমলে
আমারও আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।
শৃঙ্খলিত চিন্তা মন তছনছ হয়।
আমি এর বুকে কোনো ভেজাল চরিত্র
কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না,
এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরলে
আমারও দুচোখ বেয়ে বৃষ্টি নেমে আসে।
হিমালয়ের বুক ফেটে সমুদ্রের ফেনা নির্গত হয়,
এর একটি বালির কণা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে
আমিও চুরি হয়ে যাই।
খবরদার। ভুলেও কেউ এই দগ্ধ স্বর্ণ মোহনায় রেখো না হাত।
এই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন আমার আদি
মহামানবের দল,
তাদের মুখে ছিলো চাঁদের আবরণ,
সর্বদা শান্তির পুঁথি ছিলো অন্তরে গাঁথা
শিশুদের হৃদয় ছিলো হৃদয়,
গাছের ছায়ার মতো মায়া,
পাপের বিরুদ্ধে ছিলো যুদ্ধের অবয়ব,
সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে দিতে
জীবন হয়েছে শেষ।
এই সেই পথ, আমি এর কান্না কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।
এর প্রাণ কেঁপে উঠলে আমারও ভেতর কেঁপে ওঠে,
এর একটি নিশ্বাস ঝরে পড়লে
আমারও পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়।
আমি এর যন্ত্রণা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না,
সে কাঁদতে থাকলে আমারও কান্না পায়।
ভীষণরকম কান্না পায়।

কবি সমর সেনের মৃত্যুসংবাদের পর

এখন গঙ্গায় ঠিকই রোদের তাপ এসে পুড়ে যাবে জল ।
দুই তীর স্বাচ্ছন্দ্যের শূন্যতায় কেঁদে উঠবে কোনো কোনো রাতে,
গভীর ছায়ায় এতোকাল যে-পাহারাদার হেঁটে হেঁটে পিয়ানোর
আসর জমাতো,
দূর গ্রামের বাউল এসে শুনতো অমৃত সেই বাণী,
আজ তার কোমল উঠোনে এক ঝাঁক ম্লান মাছি,
একটি বেদনার্ত সুর হাহাকার করে উঠবে ।
অথচ এই পোড়া জল কোনো-এক নিবিড় সন্ধ্যায় গড়াতে থাকবে
তেজি পদ্মায়—
কখনো রাইন, একদা স্বচ্ছ মধুরতায় বঙ্গোপসাগরে যাবে ।
কখনো তার স্রোতধারা গ্রহণ করবে
চন্দ্রমল্লিকাদের সকাল,
তখন বুঝবে—কেন পৃথিবীতে কেউ-কেউ
কবিতার কারিগর হয়ে আসে ।

ঘাসের বুক থেকে গ্রহণ করেছিলে প্রেম,
মানবিক খুঁটি দিয়ে গড়েছিলে ঘর,
নকশিকাঁথার তুলিতে তুমি যে ভালোবাসার সাঁকো
নম্র নীল চাঁদ এঁকেছিলে,
তার গোলাপকুঁড়িতে জন্ম নেবে অমোঘ সমুদ্র ।
করুণ বিকেলে নতুন দুঃখরা যখন চুষে নেবে
জমানো সুন্দর,

তুমি তখন সেই অমর জানালা থেকে
ছুড়ে দেবে সুষমার তীর ।
প্রতিবাদ করতে থাকবে অপরূপ সংসারের জন্যে,
তুমি দুষ্প্রাপ্য বৃষ্টির ফোঁটার মতো
ধেয়ে ধেয়ে আসবে তৃষ্ণার্ত গ্রহে ।
তখন অনেকেই বুঝবে—
কেন পৃথিবীতে কেউ-কেউ কবিতার কারিগর হয়ে আসে!

সত্যের বন্দনা

সত্য বলে দেখেছি,
এই মিথ্যার রাজত্বে
অধমের অমোঘ সত্যগুলো
নীরবে নিভৃতে বৃষ্টির মতো কেঁদেছে।
এতো ক্ষয়, এতো বিনাশের কালেও
কঠোর মেঘ হাঁকছে।
মনে হয় পুরো মানবতা আজ
মিথ্যার কবলে বাঁধছে।

আজ সত্য হয়ে গেছে মিথ্যার হাতের মোয়া,
ইতিহাস যাদের দিয়েছে কলঙ্ক,
তারাই ছড়াচ্ছে আবারও মিথ্যার ধোঁয়া।

সত্য তুমি এমনই শক্তিশালী বলবান,
তোমার স্পর্শে সগর্বে জেগে উঠি,
এখনও করি কুর্নিশ—
তুমি অমর ; জয় হোক তোমার,
মিথ্যাকে করো অন্তর্ধান।

একদিন কাউকে না-বলে

দেখো, একদিন কাউকে না-বলে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়বো,
আর জাগবো না,
আর আসবো না ফিরে তোমাদের অন্ধকার বাড়ির বাগানে।
আমি তো চার শত আট মাস ধরে ক্রমাগত গেয়ে এসেছি
তোমাকে পাওয়ার অসুস্থ গজল,
কেউ শোনেনি আমার বসন্ত-চুরমার-করা স্বরলিপি।
বলেনি, এই এক নদীভাঙা কৃষক—ওকে বুকে তুলে নাও!
কতোকাল গেলো ক্ষরণে ক্ষরণে,
কোথাও তো জ্যোৎস্নার অমরত্ব এসে স্পর্শ করেনি জানালার শিক,
শুধু ছেঁড়া পাতায় আঁকিবুকি!
শিরায় শিরায় দুঃখপাত দুপুর-খতম-করা ঘেউতাল!
কুমিরের শুয়ে থাকার মতো নিকষ বারুদের বিজ্ঞাপন,
ধর্ম নিয়ে ভণ্ডস্বর, হাজং মেয়ের আত্মাহুতি,
অর্থলোভী পীরবাজি অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি,
এই সব সন্ন্যাস নরকের মুখ না দেখে
আমার ঘুমিয়ে পড়া ভালো!

আমি একদিন ঠিকই কাউকে না বলে
চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়বো!
আর জাগবো না!
কী লাভ এখানে জেগে থেকে,
যেখানে চাঁদ এসে কলঙ্ক নিয়ে যায়,
লালন ফকির নেই, রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য নেই,
সেখানে আমার থাকার কোনো ইচ্ছে নেই,
একদম সাধ নেই!
দেখো, কাউকে না বলে একদিন ঠিকই আড়াল হয়ে যাবো!
আর জাগবো না।

আবুল হাসান

আমাদের দৈব উজ্জ্বলতার প্রহরে তোমার খুব প্রয়োজন ছিলো,
তোমার জন্মের কাছে, অমর কাব্যের স্রোতধারার সাথে
প্রণয় উদ্যানের ঝলমল বিশ্বাসের সাথে—যেসব
ক্লান্তপথ গভীর স্বস্তি পেয়েছিলো—
তার সাথে কিছু-কিছু কথাবার্তা ছিলো!
তুমি যে বাতাসের সম্মুখভাগে বেগবান পৃথিবীর চোখ,
অমীয় রাত্রির লোবান এঁকেছিলে,
তার অস্তিত্ব জড়িয়ে-থাকা আদিম সকাল;
বাউরি বনের থলেতে অমর বৃক্ষের চারা রোপণ করেছিলে,
সেসব স্বর্গমূল থেকে আজও নির্গত হয়
বিপর্যস্ত মানুষের সুখ।

তোমার বিশ্বস্ত প্রেমের সাথে আমাদের কিছু-কিছু
সমবেদনা ছিলো—
ওইসব তো কিছুই শুনলে না তুমি!
আমাদের কথাগুলো, প্রশ্নগুলো; তুমি কি কখনো
চুপচাপ এসে ছুঁয়ে যেতে পারো না?
তুমি তো শুধুই মানুষের জন্যে ধরেছিলে মানচিত্রের হাল,
এরকম অনেক প্রচ্ছদপটেই তুমি ধারণ করেছিলে,
কেবল পারলে না মৃত্যুকে দূরে ঠেলে দিতে!

তোমার জাগরণ

ভেবেছিলাম মানুষের চুপিচুপি দাহগুচ্ছের ক্ষয়ের কথা
আমি আর কাউকে বলবো না!
কানে তুলো চোখে গাছেদের ছায়া পুরে সবকিছু
আড়ালে ঠেলে দেবো!
যদি কোনো নারীমুখে পিষণের বিষণ্নতা আসে,
চাঁদমুখ লোকরণ্যে ভণ্ডকায় তন্ত্রমন্ত্রের স্পর্শে উঁকি দেয়,
শিশুদের মর্মন্তুদ চিৎকারে নীল ভোরগুলো হয় কুৎসিত,
মাঝির ভাটিয়ালি সুর কেউ কেড়ে নিতে উদ্যত হয়,
তা হলে বসন্তকেই ডেকে বলবো—
হে প্রকৃতির মহীয়সী সরলমুখ ত্রাণদাতা—
তুমিই আমাদের সংগীতের আরোহী, ধ্রুপদী।
তুমিই আমাদের রাষ্ট্রপুঞ্জ, রামনিধি গুহ, মাইকেল।
তুমিই আমাদের হারানো পল্লীর চিত্তসুখ,
তুমিই আমাদের সাঁওতালি—বিচ্ছেদী সংস্কৃতির মেঠো পথ।
তুমিই আমাদের গভীর চাওয়া-হারানো গণতন্ত্র।

ভেবেছিলাম মৈষালের নোঙর ভেঙে আর কখনো
উদাস বিকেলে বক্রগতি নেবো না,
যারা নিষ্ফল হাতের ছোঁয়ায় হয়ে গেছে ভিটেমাটিহীন,
যেখানে আমদানি না হলে সারাদেশের শিশুরা খাদ্যহীন থাকে,
যাদের বসন্ত আসে সারারাত ইঁদুরের ঠোকাঠুকি
বিষবাষ্প নিয়ে,
তুমি তাদের দুরূহ বিলাপ গোলাপ হারানোর কথা বলে
আমার ঘুম ভেঙে দিলে।

গোপন ট্রেন

বিষাক্ত বায়ুর একটি অসভ্য ট্রেন
ছুটে চলছে আমার ভেতরে। কালো রাত্রি
থেমে গেলে—ছায়াচ্ছন্ন স্বপ্নস্তূপ
শক্তিহীন পড়ে থাকে
কারো কারো প্রতীক্ষায়!

একপাল অবৈধ নিশ্বাস ক্রমাগত—
অক্ষয়ী বৃষ্টির মতো আমার দুয়ারে
উল্লসিত হয়।
পৃথিবীর শির ধ্বংস করার মতো কৌশল খোঁজে,
গোপন আগুনে পোড়ে লালিত অরণ্য।
আমি নির্জীব সংগীতের কাটাছেঁড়া
অক্ষরগুলোর মতো
কেবল নিঃশেষিত হতে থাকি।
উদ্যান থেকে সামুদ্রিক ক্রন্দনের মতো
পুষ্পের বংশ হয় ম্লান।

এর পরও বিরক্তিকর পিয়ানোর লহড়ি চলে—
সমাজবিরোধী ট্রেনটা গোঁত্তা মারে এই
বিষণ্ন আত্মার গহ্বরে;
ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর হয়।

মনে আছে কি

মনে আছে কি নদী পার হয়ে
ঘন দেবদারু বন ; মরুভূমি, শ্মশানপথ, এইভাবে
বিরহসমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম।
আমাদের অন্তর ছিলো তখন,
শিশুর দুঃখ
নারীর দুঃখ
খাদ্যের দুঃখ
বাঁচার দুঃখ
গৃহের দুঃখ
ঘুমের দুঃখ
ঠিক এমনি বাউল সেজে নয় মাস বনবাস,
নির্বসান নিয়ে পাহাড়ের সঙ্গী হয়েছিলাম।
আপনজনহীন,
ঘরবাড়িহীন বিষণ্ন তীরে,
বুলেটের মুখে
বোমার তাড়নায়
আগুনের লেলিহান
বেয়োনেটের খোঁচায়
রক্তের বন্যায়—

একাকার হয়েছিলাম,
চাঁদের মতো বোনকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম।
তোমার কি এসব মনে আছে?

শিকড়ের সন্ধানে

সেই বৃক্ষটির কথা আজও খুব মনে পড়ে,
যার ছায়ার গভীরে আমার কিশোরকাল
আনন্দ-উল্লাসে কেটেছিলো।
গাছটির বেগবান পাতার স্পর্শে
আমাদের রুগ্ন বাগানের যৌবন এসেছিলো,
ডালপালার সাহসী গর্জনে
মরু নদীতে জেগেছিলো জোয়ার,
মানুষের রক্তে সরস হিমোগ্লোবিন
কীযে প্রাণ দিয়েছিলো—
আমার বেঁচে থাকা,
এই নিরীহ ভূমির প্রভাবেও ঝলসে ওঠা
তারই যুদ্ধের ফসল।
আমি সেইরকম আরও একটি
উৎসবের সন্ধান করছি।
ওই গাছটির অন্তরছোঁয়া ক্রন্দনের সাথে
আমি মন ভরে কাঁদতে চাই,
তার শিকড়ের বেড়ে ওঠার মতো
আমিও জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে যেতে চাই!
সেই বৃক্ষটির কথা আজও খুব মনে পড়ে
যার বাকলে শান্তির পৃথিবী
সর্বদা স্বস্তির স্বর্গ নিয়ে আসে
আমাদের নিরন্ন চব্বিশ বছর গেছে
তার পরও কেন এইসব তাণ্ডবলীলা?
ঘোরতর অন্ধকার—যার উষ্ণ সমুদ্র থেকে ভালোবাসার
প্লাবন এসেছিলো,
রাজনীতির শস্যকাল এসেছিলো,
তার কথা মনে হলেই, হৃদয়ের জ্যোৎস্নামাখা যৌবনের কথা মনে পড়ে,
ত্যাগী বাউল, ব্যগ্র পাহাড়, ঊর্ণনাভ মানবের কথা মনে পড়ে।
হায় বৃক্ষ পৃথিবীতে আজ সবকিছু উলটো পথে চলছে,
কষ্টের জমিনে রাজাহীন রাজ্যে বেআব্রু আগুন্তুকের উৎপাত,
এই বিপর্যয়ের আবহাওয়ায়,
গাঢ় অসুস্থ পৃথিবীতে
তোমার শিকড় থেকে আবার সুন্দরের বৃষ্টি হোক।

ওখানেই থাকতে দাও

আমি তো আছি পৃথিবীর পুরাতন নদীটির বহতা নিয়ে।
কতো মারি ও মড়ক—তাণ্ডব এসে ঘুরঘুর করে যায়,
আবাল্য পরিবর্তন হয় মনুষ্য জীবনযাপনে,
দুপারে কষ্টের গোঙানিতে কারো মৃত্যু
কারো জন্ম কারো ক্ষয়
আশ্চর্য ধরনের উত্থান-পতন হয়
সেইসব কালিমামুখর শব্দ শুনতে শুনতেই
আমি পঁয়ত্রিশ বছর বেদনাচ্ছন্ন সমুদ্র টলিয়ে এসেছি।

আমার জন্ম-মৃত্যু নেই,
জেগে ওঠা কিংবা ঘুমিয়ে পড়ার আরাধনা নেই।
নিশীথের নিমগ্ন থাবা হয়ে
তোমাদের ছেঁড়াখোঁড়া বাগানের উচ্ছিষ্ট ঘাস হয়ে
আজন্ম ভোরের লাউলতা ঝাউবন,
একাকী পর্বতের ভালোবাসা চেয়ে চেয়ে
পৃথিবীর পুরাতন নদীটির কান্না শুনতে শুনতে
ক্ষয়ী পদ্মটির বিলাপ বুঝতে বুঝতে
এখানে এসে দাঁড়ালাম।

আমার কোনো হারাবার নেই। কোনো তাড়া নেই।
কুমূর্তির বিষবাষ্পে আছি। ওখানেই থাকতে দাও।

দুঃখ

প্রতিটি বসন্তকালেই আমাকে দুঃখ পেতে হয়,
প্রতিটি প্রহর কাটে নির্মমের শিকল গায়,
রাতভর শাণানো তীরের খোঁচায় খসে পড়ে
জমানো উর্বরতা ।
ক্লান্ত পথ নিয়ে আমাদের ঋতুরাজ হেঁটে হেঁটে
কঠিনের দিকে যায়,
রাখালের স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন ধুলোয় বিনাশ হয়,
তবুও সুবর্ণ পাহাড়ের চোখ থেকে ঝরে পড়ে
দুঃখীজল ।

প্রতিটি বসন্তকালেই আমাকে কষ্ট পেতে হয়,
প্রতিটি নদীর যেভাবে ক্ষয় হয় কৈশোর-যৌবন,
নিভে যায় লালিত স্রোতধারা,
আমারও সূর্য ওঠার মতো অমীয় সৌন্দর্যের
লোবান নিয়ে ঘরে ফেরার কথা ছিলো!
প্রতিটি তারার মতো মুক্ত আকাশে
জ্বলজ্বলে গ্রহ হবার কথা ছিলো ।
মানবিক ঘাসের ক্রন্দন শোনে
আবারও অনবদ্য যুদ্ধে যাবার কথা ছিলো ।

রিমার জন্যে

হাতের মেহেদি মুছে যেতে-না-যেতেই
একটি তরতাজা শিকড়ের বন্ধন ছিঁড়ে গেলো,
বর্ষা শেষ না হতেই যেভাবে
শুকিয়ে যায় দুঃখী নদীর জল,
ঠিক তেমনি ঘাতকের অসভ্য তীর
বিদ্ধ করেছে তোমায়।

তবু কেউ কেউ বলছে,
এখানে মানুষের জন্যে মানুষের দরদ
একের জন্য অন্যের ভালোবাসা,
ঘাসের সম্ভ্রম রক্ষায় অন্তরঙ্গ বেয়ে ছেয়ে পড়ে!
ভালোবাসার এই কি বিবর্তন, এই ঘন অন্ধকারে?
এই কি শহীদ পরিবারের জন্যে পুরস্কার?
এই কি সিরাজউদ্দিনের কোমল রাঙা স্বপ্ন জাগরণের
এগিয়ে চলতে থাকা?
যার স্মৃতির দগদগে ঘা লালন করে যে-সন্তান
উঁচিয়ে রেখেছে তরবারি।
বিরহ-তাণ্ডব, বিপর্যয়ের রশি যে-উদ্ভাবনের সকালে
সূর্য ছুঁয়ে ছিল,
কোনো অপহাত ছুঁতে পারেনি—তার নির্ণয়ের কাল,
বর্বরের কোলাহল তুচ্ছ করে যে-অনুরণন শুদ্ধ করেছে
আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভোর,
তোমরা সেই গুছানো বাগানের আরও একটি বৃক্ষকে
উজাড় করে দিলে,
আমাদের স্রোতশীল গর্জনের বহর থেকে
আরও একটি কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিলে।

এই কি স্বচ্ছ জীবনের জন্যে অঙ্গীকার? এই কি
মুক্ত আঙিনায় অবিরাম সগর্বে চলতে থাকা;
এই কি রিমাদের জন্যে শান্তির নিশ্বাস।

সেই ছায়াটি

বুকের ভিতর ঘুরতে থাকে একটি শোকের করুণ ছায়া,
দুলতে থাকে একটি পাখির করুণ মায়া,
সুরলহড়ি সাজিয়ে রেখে
সাদা পাহাড় ঘুমিয়ে থাকে,
সেই ছায়াটি গভীর রাতে
চষে বেড়ায় সারা শহর
অন্তরে তার বিষের আস্বাদ
সারাক্ষণই গাইতে থাকে
গণতন্ত্রের পোড়া বাড়ি ।
আদিম ভিটা শুনতে থাকে
সেই পাখিটির আহাজারি ।

মনের মাঝে জ্বলতে থাকে সবুজ গ্রহের শস্য জোয়ার,
অব্যবস্থার কঠিন স্রোতে
সবই ডোবে অন্ধকারে,
আমরা সবাই নুব্জ দেহের নিশ্বাস ফেলে,
ক্ষয়ে যাচ্ছি,
গোলাপবাগান ঝরে পড়ে
কঠোর রোদের দগ্ধ তাপে ।

সেই তারাটি আর জ্বলে না ।
সোনার সকাল আর আসে না ।
সেই বাঁশিটি সুর তোলে না,
সেই পাখিটি আর ডাকে না
অনাদরের বালুচরে ।
সেই ছায়াটি ঘুরতে থাকে,
শোকের মালা গাঁথতে থাকে—গাঁথতে থাকে
সেই ছায়াটি ঘুরতে থাকে ।

বসবাস

জন্মের পরই তেতো ঝাউবন—তিক্ত লতায়, ত্রস্ত ঘাসের
জোয়ারে বেড়ে উঠছি আমরা ।
আমাদের শিশুকাল সর্বদাই ঘুনপোকা
            লজ্জাকর ঘাতকের নিশ্বাসে—
বীভৎস [illegible]গীর দৌরাত্ম্যে ; কখনো কখনো নুয়ে পড়া
কীটের চেতনার উন্মত্ততায়,
পুঁজ গন্ধময় কষ্টে-বেদনায় যায় ।

এখানে এখন কোনোকিছুই রূপকথা—পুরনো সারস নয়,
নয় মানবিক বৃষ্টির উদ্যান,
জন্মের পরই শিশুর মগজে ঢুকছে নৈরাজ্য-বিষ,
মরণের তলোয়ার হাতে যে তুমি দাঁড়াও
            মেহনতি বোনদের পথে,
শহরতলির ওই পোড়-খাওয়া বারান্দা অনাহারী মুখ,
তৃপ্ত চোখের জল,
বৃদ্ধ পিতামাতা—একদিন সবই হিসেব করে নেবে ।

জন্মের পরই হৃদয়ে আঘাত মানচিত্রে রক্তপাত,
তুমি কে হে বসন্ত চুরি করা পৃথক স্বর,
তোমাকেও নিতে হবে বুক-খালি-করা কঠোর সকাল,
তোমারও সয়ে যেতে হবে বেদনার্ত নারীর ক্ষয় ও শোক ।

সোনারগাঁ

আহত ঘোড়ায় নুয়ে আছে প্রাচীন মরদ——সোনারগাঁ
প্রিয় পুরুষের লৌকিক গর্জন আজও মেঘলা
দুপুরের গুণ টেনে যায়,
অথচ ঈশা খাঁ নেই। কেবল চন্দ্রের সিঁড়ি বেয়ে
একঝাঁক স্মৃতির প্রাসাদ খাঁ-খাঁ করে।
প্রত্যহ সোনাই বিবি গ্লানির আস্বাদ তুলে নেয়
ভক্তদের স্বপ্নস্তূপে।
তলহীন পাতিলের মতো কারা যেন
তোমার অনুতপ্ত মুখে ঢেলে দিচ্ছে আধুনিক বিষ।

তোমার কি কাঁটার সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার কথা ছিলো?
মর্মান্তিক সংস্কার এঁটে যারা তোমার অন্তর
বুক, নাক-কান চোখ
বিস্মৃত করেছে,
তারা কি ইতিহাসের মর্ম বোঝে?
বেআব্রু কুঠারের দাগ কেটে যারা নির্মল ভিটায়
বেদনার হাত বুলিয়েছে,
তারা কি সুন্দর রাজনীতি বোঝে?

মেরুদণ্ডহীন তুমি নও। এতো খোঁড়াখুঁড়ি
তবুও তুমি আছো——
গত জীবনের পাতায় পাতায়
একচ্ছত্র আজন্মকাল।
তোমার প্রকৃত রূপ ও ব্যগ্রতা এখনও উদ্ভাসিত
জয়নুলের স্নিগ্ধ তুলির টানে।

উর্বর চর ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

শিল্পী কাজী হাসান হাবীব স্মরণে

পাহাড়ের মৃত্যু হলে কেউ কি কাঁদে? কিংবা সমুদ্র?
তুমি বিমূর্ত লালিত শির উঁচু করে
ভুলের প্রচ্ছায়া কাঁধে নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে চলো!
কি আঁকছো তুমি? ধাবমান কাল? রমণীয়
বসন্ত-বিকেল? নাকি প্যালেস্টাইনের কোনো রাত?
আমি জানি—
তোমার অদম্য তুলি খুব বেশি পুণ্যময় রোদ,
স্বর্গের উত্তাপ খুঁজে ফেরে।

এতো যে ক্যানভাসের মরদ বিস্ফোরণ
শ্রমিকের গাঁইট টানার ধুপধাপ আর্তনাদ,
কখনো কি নিজস্ব ক্ষয়ী মরুভূমির স্পর্শ,
না-পাওয়া জারুলবীথির চিত্র
আঁকতে পেরেছো তুমি?

কিছু তো হিস্যার প্রয়োজন হয়,
হাঁটিহাঁটি শেষে কে এমন শিল্পপ্রেমী হবে,
যে অন্তত একবার শবযাত্রার ধোঁয়ায় চোখ বোজে বলবে,
অমর পাখিটা নেই,
নির্বাসন ছেড়ে সে কোথায় চলেছে?

ভালো থাকা

আমি দীর্ঘকাল ধরে কোনো মানুষের মুখে শুনিনি
ভালো আছি।
ভালো থাকা কি এতোই কঠিন যুদ্ধের ফসল,
যাকে ছুঁয়ে যেতে ঢেলে দিতে হবে পৃথিবীর সমস্ত
ব্যাংকের টাকা?
ভালো থাকা কি এতোই প্রতীক্ষার কাল,
যার উচ্চারণ শুনতে হলে
অগণিত কাল দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সংকটের মুখে?
ভালো থাকা কি এতোই জীবনের বিনিময়ে কিছু,
যাকে পেতে হলে বারবার দিতে হবে রক্তগঙ্গা?

আমি দীর্ঘকাল ধরে কোনো মানুষের মুখে শুনিনি
সুখে আছি।
ভালো থাকা এ এক সমুদ্রসমান আকাশের তারা।
সুখ সে তো বেড়াতে গিয়েছে অন্য গ্রহে।
মানুষের সে কী পরিবর্তন! কষ্টের ঢেউয়ে ডুবে যাওয়া,
ভেসে ওঠার খেলায় মত্ত সবাই।
দুঃখের গ্লানিতে চড়ে বেড়াতে বেঁড়াতে
সবাই দুঃখকেই ভুলে গেছে।

যাওয়া

উঁচু পাহাড়ের বুক চিরে বহু কষ্টে
তোমার দুয়ারে যেতে হয়।
কঠিন মেঘের স্তর, বিষণ্ন রাত্রির ঝড় ভেঙে
এগোতে হয় আমাকে তোমার পথে,
তুমি বারবার কৃষ্ণাঙ্গ ভূমির মতো
অনুর্বর করেছো আমার প্রহর, তার পরও
যেতে হয়,
আমার যাওয়া হয় বিরহকাতর-গ্লানিময়
সৈনিকের বেশে,
তবুও এগোতে হয় রোদহীন সমুদ্রের ভেজা স্রোতে।
মনে হয় কতোকাল ধরে সয়ে যাচ্ছি
ঘাতকের পিষণ—অসহ্যের ক্রমাগত থাবা।

বিষাদের প্রতিচ্ছবি

আমরা এখন, সজীব পথে
সোনার দেশে, আগুন জ্বেলে
স্বাধীন ঘরে, বিষের থলে,
বাড়িয়ে আছি,

আমরা এখন, মুক্তির গানে
আঘাত করে, অন্যের সুরে
কথার ভারে, থুবড়ে গেছি।

আমরা এখন, কঠিন জলে
সাঁতার কেটে, ঘাসের বুকে
ছবির সাথে, নিজের স্বপ্ন
ভুলেই গেছি।
বিষাদ তালের, রাগের রঙে—অন্তর রেখে
আমরা এখন নকল বৃক্ষে ডুবেই আছি।

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

তোমার অন্তরে ঘাতকের থাবা দেখে—
পাথরও অবশেষে কেঁদে উঠেছিলো! রাজধানীর
পথে পথে কাঁদানে গ্যাসের
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাত্তরের কলঙ্কিত স্পর্শের পদধ্বনি.
আমার বোনের চোখের জল—আবারও কেড়ে নিলে!

একজন বাউলও ফিরে তাকালো না
ফুলগুলোর দিকে।
একঝাঁক শকুন তীব্র নখরের আঁচড়ে জল্লাদের
হাত বাড়িয়েছিলো—
আমার প্রিয় বোনের দিকে
বাংলার পতাকার দিকে।
ওরা একবারও রবীন্দ্রসংগীতের
ইতিহাস বুঝলো না,
নজরুলের জীবন ঘষার মর্মটুকু বুঝলো না।
হায়েনার বিকল্প রূপ ও লাবণ্যে উচ্ছ্বসিত—
এই দূর্যোগের তীর,

আমি কি গ্রহণ করতে পারি।
আমি এইসব দেশদ্রোহীদের বিচার চাই।
আমি এইসব স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার চাই।
আমি এইসব নরপিশাচের বিচার চাই।

একটি অপরূপ সন্ধ্যা আসে

কোনো-এক স্বপ্নহীন ভোরে
তোমার বুক থেকে একরাশ প্রেমীর নিশ্বাস
আমার অন্তরের মৃত্তিকায়
কী এক বিষণ্ন চিত্র এঁকে গেছে ।
আজ এতোকাল পরও সেই আদিমতার সুবর্ণ হাওয়া
আমার গৃহস্থালি, পথের অন্তরে,
ঘুমের প্রহরে—শিহরন রেখে যায় ।
কখনো স্থির পায় দাঁড়িয়ে থাকা
রমনার ময়দানে,
মধুর ক্যান্টিনের ভাঙা ইটের দলায়,
চুপিচুপি বলে যায় মর্মস্পর্শী গীতমালা ।

সে কি জীবনসমুদ্র ঢেউ, এখনও তোমার
ভুল থেকে ছুটে আসে বাংলা একাডেমীর
কিশোর ঘাসের ঠুংরি খেলায়,
গাঢ় বসন্তের আতরমাখা প্রজাপতি মেয়ে
শুনে যায় মারফতি বয়ান,
খোলা চুলগুলো এখনও কি আনন্দ মেঘ উড়ায়,
বটতলার রৌদ্র দুপুর ত্রস্ত পায় উঁকি দেয়
কাজের অবসরে ।
আমার সবটুকু আনাগোনা—যেন তোমার
শান্ত বিকেলের হাসি—
আজও গ্রামের নিবির পথে-পথে
বাদামক্ষেতের ন্যাংটো বালিরাশির বন্ধনে
এক অপরূপ সন্ধ্যা আসে ।

নক্ষত্রপতনের গান

দূর বন্দরের ধূপছায়া নীরব দেয়ালে বসে আছে
শোকাক্রান্ত কাক।
কোলে তার অভাবের পুঁথি, ছেঁড়াখোঁড়া জন্মভূমি।
রাত্রির বাউল এসে কখনো-সখনো
দুএকটি মুক্তির গান কানে-কানে শুনিয়ে যায়,
অন্যেরা সকলে হায় হায় করে।

আহা সে কী অস্তিত্বের প্রগাঢ় ভালোবাসা!
পৃথিবীতে এভাবেই বুঝি সব নক্ষত্রগুলো ঝরে যায়

পুঁথি বন্দনা

১.

সারাদিন জংধরা স্থাপত্যকর্মের রূপ দেখে হাঁটি,
নগ্ন কষ্টগুলো পুরনো নকশিকাঁথার বুক জুড়ে হৃদ্যতা গড়ে,
সকল নির্মাণে ছেঁড়াখোঁড়া বন্ধ্যাত্ব—না-পাবার যন্ত্রণা
দুঃখ বাড়ায় ।
মনে হয় দুর্ভিক্ষের কৃষ্ণ তরঙ্গে ছেয়ে গেছে ঘর!
হাত বাড়ালেই অতিশয় গাঢ় অর্বাচীন মুঠোয় আসে,
ঠোঁট নাড়ালেই শস্যহীন মাঠের বাতাস হু হু করে ভেতরে,
ঠোঁট খুললেই বিষাদিত ফ্যাকাশে রমণী মুখ,
সে কেবল অন্তরের জমিনে
ব্যর্থতার চাষাবাদ করে ।
পা বাড়ালেই জন্মসুর কাঁটাঘেরা ধু ধু পথ ।

২.

সারাদিন না-পাওয়ার বিলাপ শুনতে শুনতে
কেটে যায় সময়,
কেউ বলে সরল-উদার প্রাণ নদী নেই!
হাসিমুখে মানচিত্র নেই । মানুষ নেই ।
ভালোবাসাময় দর্শন নেই ।
পিতামহদের গ্রাম উদ্ধারের অস্ত্র নেই ।

এমনি করেই

কাঠের পুতুল নাচতে থাকলে
আসল পুতুল ঘামে;
এমনি করেই বুকের তলায়
বিষাদ সাগর জমে।

এমনি করেই
ক্ষয়ের মিছিল এ-মাটিতে চলে,
নকল মানুষ হাসে খেলে,
সত্যের পাহাড় গলে।

এমনি করেই
বোনের ইজ্জত ঢাকার বুকে ঝরায়,
এমনি করেই রাজনীতি সমাজনীতি
সবকিছুকেই হারায়।

হারায় জীবন হারায়,
এমনি করেই ভালোবাসার
স্বপ্নগুলো পুষ্ট হৃদয় হারায়।

হঠাৎ মেঘের আড়ালে

তুমি সমুদ্রের চোখে চোখ রেখে উঠে এসেছিলে
নাগরিক জলাশয়ে,
ভিতরে জ্বলছে খাঁ-খাঁ রোদ, নগ্ন শিল্পপথ পার হয়ে
কোনো-এক করুণ বিকেলে তোমার মায়াবী মুখ
স্পর্শ করেছিলে কাতর বাগান,
মনে হয় প্রেম নয়—শস্যের সম্পূর্ণ মাঠ!
এতোটুকু বাড়ালে যখন হাত
কেন তার নিপুণ শিকড়ে বিদ্ধ করেছো তীর,
তুমি কি জান না,
এখানে শিশির ঝরে কালোপথে
ক্ষতিগ্রস্ত মাঝির নিশ্বাসে,
মরা নদীর জল যেরকম শুয়ে থাকে মাটির শিথানে,
বুড়ো গাছ যেভাবে নুয়ে পড়ে বাতাসের ডগায় ভর করে—
তুমিও কি সে-গান গেয়েছো বিগত বসন্ত দিনে!

কীভাবে নিথর দুপুরে দিয়েছিলে হানা ; সে-চোখ
কোথায় রেখেছো নারী ।
কিসের আগ্রহে গ্রাম্য বালুচরে রেখেছিলে রঙিন চুমো ।
উঁচু পাহাড়ের বরফ-কণিকা,
সেও জেনেছে তুমি কী চাও ।
দূরের আকাশ সেও বুঝে নিয়েছে—কেন ভোর হয়
ক্লান্ত জামা গায় ।
শুধু তুমিই বুঝলে না, কেন শরতের মেঘ
ডেকে ডেকে যায়
শ্মশানঘেরা ভোর ।

তুমি সমুদ্রের গর্জন গায়ে মেখে
কাঁপা কাঁপা মৃত্তিকায় স্পর্শ করেছিলে,
কেন গাছের আড়ালে গড়েছিলে গাছ,
কেন জানালায় চোখ রেখে ডেকেছিলে
ঘুমন্ত শহর ।

নুড়ি পাথর ও প্রেম

মানুষের কিছুটা বিরহ থাকা ভালো।
শুধু কি স্বর্গের নৃত্যরস-রাঙা ভোরের চোখ,
উজ্জ্বল বসন্ত নিয়ে পৃথিবী?
আকাশও মাঝে মাঝে ছোট্ট শিশুর আদলে
হু হু করে কেঁদে ওঠে—
নুড়ি, পাথর, ঘাস যে কীভাবে হায় হায় করে,
তা কি জানে কেউ?

যারা জীবনে একবারও কাঁদতে পারেনি,
তারা আসলে সুখের মর্মকে আত্মস্থ করতে পারেনি।
বিরহ এমনি অমর পুষ্পের ঘ্রাণ,
যার প্রবাহ যাকে স্পর্শ করেনি—
সে জানে না কেন মানুষেরা প্রেম করে।

নষ্ট রাজধানী

বহুবার ছুঁয়ে ফেলেছি তোমার মগ্ন উদ্যান,
গভীর বনের মাথা নোয়া সন্ন্যাসীর মতন,
হেঁটে হেঁটে পার করে—
এসেছি গণিকার আকাশ
গণিকারা কোথায় থাকে এই মর্মাহত ভুবনে,
তা তো দ্যাখে না কেউ
ওরা কি মানুষ হয়?
বহুবার তোমার অসভ্য দৃষ্টির ওলান ছিঁড়ে
বের হয়ে এসেছি পথে।
প্রতিবার ধারণ করেছি বিষময় শস্যকণা।
মনে হয় আমি এক বিপর্যস্ত বাউল,
যাকে রোজ রোজ গ্রহণ করতে হয় অমানিশা
বেআব্রু রমণীর খোলস,
ধারণ করতে হয় নষ্ট রাজধানী—
গ্রহণ করতে হয় কঠোর বিকেলের নষ্ট ফুল।

এই সময়ের কবিতা

আমার অস্তিত্ব জুড়ে শৈবালের পূতিগন্ধময় ভূমি
কী এক মলিন মেঘ এঁকে চলেছে।
প্রতিটি সাহসী ঢেউ ; মৃত নিশ্বাস ফেলে যেসব
প্রস্তরময় ঝাউবন স্বপ্নে বেঁধেছিলো বারাঙ্গনা রমণীর খোঁপা।

তোমার বীভৎস সন্ধ্যার কান্না শুনেও
হাত নেড়ে নেড়ে চলে গিয়েছিলে
কাশেম আলির দাদার ভিটায়।

তুমি কে হে অশুভ রাত্রির খড়্গ নিশানওয়ালা?
আমাদের প্রাচীন শস্যের কারুকাজময়
নকশিকাঁথার রংচঙে পাবলো নেরুদার
শহর মেখেছো গায়?
শোনোনি কি বসন্ত-হারানো প্যালেস্টাইনি ধ্বনি,
কেন বোঝনি নিস্প্রাণ উঠোনে কলঙ্ক নৃত্য,
পূজার পূর্ণতা ভেঙে দিলে।
আমি এই পিষণের চাতুরতার
সমস্ত গ্লানির—হিসেব নেবো একদিন!

একদিন খুব ভোরে আমি তোমাদের সূর্য উদ্যানের
কোনো-এক পুষ্পের সুবাস নিয়ে,
চুপচাপ জাতিসংঘের কাঠগড়ায় দাঁড়াবো।
ঐশ্বর্যের আলোকবর্তিকার জন্যে
পকেট ভরে যুদ্ধের বিনিময়ে হলেও শান্তির বিকেল নেবো।
পৃথিবীতে আর কোনো ইথিওপিয়ার তপ্ত ঢেউ,
মাহমুদ দারবিশের নির্বাসিত কবিতা, কিংবা—
বেঞ্জামিন মোলয়েসের হৃদয়-হারানো
আকাল চাই না।
আমরা চেয়েছি,
আমাদের প্রতিটি সকাল হবে অহংকারের তরতাজা বাঁশি,
নিপিড়িতের গর্ব হবে প্রতিটি শিশুর জন্মের অঙ্গীকর।

পাথরের মানুষ

রাজগৃহ চাইতে আসিনি ।
নোনাধরা অন্তর্গৃহ থেকে বিলাপের মেঘ সরাতে এসে
যজ্ঞের ধূপবাতি জ্বেলেছি বারবার!
চিরকাল নিষ্ফলা পাথর,
চিরকাল পাথরের মানুষ খেয়ে গেছি ঋষির বাগান,
চিরকাল কুৎসিত অসুক তাড়াতে গিয়ে
ভেঙে ফেলেছি আসুর দেয়াল!

রাজগৃহ আমার কাম্য নয় ।
বুকের ভেতর জমে থাকা সামুদ্রিক বিষ, লেলিহান খড়্গ,
প্রবহমান অলৌকিক সন্ন্যাসের ইতিউতি অন্ধকার ঝেড়ে ফেলার
পূজায় মত্ত আমি ।
আমি আমার ভেতরের স্থিতিশীল ঈশ্বরের জাগরণ চেয়েছি,
রাজগৃহ চাইতে আসিনি ।

জীবনযাপন

এক ঝাঁক অদ্ভুত শকুন উড়ে যাচ্ছে
আমাদের বুক ছুঁয়ে,
ক্লান্ত পুরবাসীর রক্ত চুষে যেসব
ইজরাইলি কুকুরগুলো হেঁটে চলে গাজার শহর,
আমি যেন তারই দলনের টের পাই!

ভিয়েতনামি যুবার জমানো ফসল—
যেভাবে বিনষ্ট হয়,
আমি যেন সেই দাবদাহের আভাস পাই।
একঝাঁক নির্মম কাঁকড়ার নখের ভেতর
আমাদের বসবাস—
নিরুত্তাপ-ধূলিবালির অর্থহীন চলাফেরা,
যেন বিনাশের পদধ্বনি হেঁকে আসে!

ঋণী

জন্মের পরই ছুঁয়ে ফেলেছি কাঁটার স্তম্ভ,
সভ্যতার অশ্লীল গ্রাসে যারা আমাদের
চুমুকে করেছিল বিষাদময়;
যে-শিশু তার কিশোরবেলাতেই
হারিয়ে ফেলেছে হৃদয়-উদ্যান,
আমি তাকে দেখতে দেখতেই হারিয়ে ফেলেছি কাল,
আমি তার দুঃখের তিমিরে ঋণী হয়ে আছি।
আমি তার পাওনার কাছে কাঠগড়ার আসামি,
আমি তার সমস্ত নিশ্বাস-হারানো সকাল ফিরিয়ে দিতে চাই।

জন্মের পরই আমাকে বিদ্ধ করেছে কালো পথ, অন্ধকার,
আমি এই উজান সমুদ্র, মানুষবিরোধী সভ্যতার
অবসান চাই।

বারুদের ক্রন্দন

হেঁটে আসি হেঁটে যাই, দেখা হয়
দুঃখী কৃষাণ বধূ,
নুড়ি-বালি, ঘাস-জলমগ্ন পুকুরের পার—
মরা গ্রাম । দেখা হয়,
ন্যুব্জ ধানি জমি—চকচকে সূর্যের মতো টমেটো ভূমি
কখনোসখনো ওরাই কচি লাউয়ের কানে কানে
কিংবা আমার ছায়াকে বলে,
একটু দাঁড়াও!

কিংবা মরমি মেয়েলোক,
ময়লাযুক্ত আঁচলের ঘোমটা জড়িয়ে খুব নিচু স্বরে
বলে ফ্যালে আবার আসিও!
আবার যেন আসতে দয়া হয়,
আমরা খুব একটা ভালো নেই!

শৈশবের স্পন্দন

তুমি আমার শৈশবের রোজনামচার একজন
সুযোগ্য পাঠক হতে চেয়েছো! বলেছো
দুঃস্বপ্ন হোক, হোক ক্লেদাক্ত মেঘের স্তূপ
তাও যেন কোনো-এক তাপিত প্রহরে আঁকিবুকি করে যাই!

আমার শৈশব কোনো উল্লসিত দুপুরের নীল শস্য নয়।
খর সূর্যের রশ্মির টানাটানি—আর
মধ্যবিত্ত রুদ্ধশ্বাসে কেটে গেছে সেই পথ।
অনুর্বর সূর্যোদয় হতো প্রতিদিন,
ম্লান হতাশার শিকল পরানো ছিলো আমার অন্তরে,
স্বপ্নের ভেতর পিতাকে দেখছি

সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমিকের মতো সূর্যাস্ত পর্যন্ত রুটি রোজগারে শ্রম দিতে,
ভাইদের হাতগুলো লাঙলের বাঁট ধরতে ধরতে কাঠ হয়েছিল,
রঙিন স্বপ্নের ধার ধারেই ছিলো না কেউ।
ক্ষেতের ফসল ঘরে তুলে ধুমধামে কেটে যেতো সারাটি বছর,
আমরা ছিলাম আত্মনির্ভরশীলতার ছোটখাটো গায়েন,
সেকথা আজ কেউ বলে না।

সন্ধ্যায় বিচিত্র পুঁথিপাঠের আসর বসতো বাংলোঘরে।
ময়ালের খ্যাতনামা শ্রোতা আর পাঠক ছুটে আসতো
আমার দাদার মরদ ভিটায়।
রাজা-বাদশাহ্‌দের পুরোনো কাহিনী শুনতে শুনতে
কতোদিন যে উঠোনে কাটিয়েছি সারারাত,
তা তো আজ বিস্ময়কর শুধুই বিস্ময়কর মনে হয়।

আত্মত্যাগ

আমি আমার ভালোবাসার কথা
আর কোনোদিন উচ্চারণ করবো না।
কারণ, এদেশ থেকে
ধীরে ধীরে ভালোবাসার মর্ম মুছে যাচ্ছে।
উঠে যাচ্ছে এই লালিত শব্দের প্রাণ,
একদিন এ-কথাটির উচ্চারণও নিষেধ হয়ে যেতে
পারে বলে—
আমি একে অন্তরেই লালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এখন থেকে যদি কাউকে ভালোবাসি,
তা মনে-মনেই সেরে নেবো!
কারণ, একমাত্র এ-শব্দটির জন্যেই
আমি বেঁচে আছি।

বসন্ত সংগীত

আমার বসন্তগুলো বৃষ্টির ফোঁটার মতো
হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়,
মরুর তীক্ষ্ম ঘাসের স্বপ্নে গভীর স্পর্শ রেখে
বেদনা রেখে অন্তর যায়।

ধূপের ধোঁয়ায় নেচে নেচে লজ্জাবতী পাহাড় ভেঙে
কখনো আসে দানব হয়ে,
আমার বয়সের কলিজায় চির ধরায় উল্লাসে—
সে হাসে—কাঁদি আমি ক্ষয়ে ক্ষয়ে।

আমার বসন্তগুলো ধর্মবর্ণহীন নিষিদ্ধ শ্যাওলার
কুৎসিত বারুদমাখা নদী,
কে হাসে—কে কাঁদে কার নির্মূল হয় সংসার,
তাতে খেয়াল নেই—
অদ্ভুত বাউল যেন চলছেই নিরবধি।

পুষ্পপ্রেম

গন্ধরাজ ছুঁয়ে কতোটা শরীর বিষমুক্ত করা যায়,
কলুষিত মশা মাছিকেও দেখি
সুন্দরের জন্যে
বিদগ্ধ রাত্রির জন্যে
স্বর্ণময় দিবসের জন্যে
কীরকম ছটফট করে।
হাহাকার করে পথের ধুলার ঘাম—
মানুষের অমানবিক ছায়া।
করুণ ধোঁয়ায়ও ক্লান্ত ঋষিদের স্বপ্ন কখনো কখনো
গোলাপের স্পর্শ প্রার্থনা করে—।
শান্তিভঙ্গকারী কোনো কোনো আন্তর্জাতিক সভাও
গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পের রূপ ধারণ করে।

অরণ্যগাথার স্রোতেও—
কোনো কোনো নারীর চোখের দুই তীর বেয়ে
গরগর করে রোদমুক্ত জল।
মানুষের সে কী ভালোবাসার উৎসরণ,
অমরতার জন্যে—সেকী মোহময় আকুলতা!

হৃদয়ের উদ্যানে যদি না থাকে সুগন্ধিময় প্রলেপ,
কৃত্তিমতা তার কতোটুকু পূর্ণতা আনতে পারে!

নিরপেক্ষ সময়

এই এক কাল আসে—শোকের চাদর গায়,
পথের ধুলোকে দেখি নগ্ন বৃষ্টির ফোঁটার মতো
নেচে নেচে চুমু খায় শহীদ মিনার।
পাহাড়ের গাছ চুপচাপ দেখে নেয় রাজপথ,
বেদনাকাতর মিছিল!
সমুদ্রের জল স্তব্ধ-নিরন্তর-স্থির বরফ হয়,
শুকনো কাঠের মত জড়িয়ে জীবনহারা হয়,
পৃথিবীর বাউলপাড়ায় সন্ধ্যা নামে
কেউ কিচ্ছুটি বলে না ; বোবা হয়ে পড়ে।
এমনকি বাতাসও এদিন প্রাত্যাহিক নিয়ম-কানুন
ভুলে গিয়ে
কোনো এক গ্রহে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে—
যদি শহীদি প্রাণ—ভাষার কারিগর কষ্ট অনুভব করে
তাই তারা নিশ্চুপ শুনে নেয় সমুদ্র-গর্জন।

এই এক কাল আসে পোড়া উপত্যকায়,
যখন আমার মা'কেও দেখি
কী এক অস্থির স্মৃতির বিষণ্নতায়
ডুবে যায় সারাক্ষণ।
মানুষের হাতগুলো কর্মময় হাত হয়,
মনে হয় কোনোকিছুতেই হিংসার স্পর্শ নেই
ব্যবধান নেই।

সিঁড়ি

গতকালও নিশিরা ওই বাড়িতে ছিলো।
শহুরে ঘাতকের কী এমন হাত পড়েছিলো
ওই শান্ত সুষমাঘেরা নীড় আদিম ভবনে।
সে তো সুসজ্জিত আকাশ চায়নি।
চকচকে হিরক সন্ধ্যায় গ্রহণ করতে চায়নি
আধুনিক উজ্জ্বলতা!
এঁর পরও নকশিকাঁথার অন্তর ছুঁয়ে বেদনার বৃষ্টি এলো।

নিশিরা আজ নেই ওই কোমল পুষ্পলতার সিথানে,
ওরা চলে গেছে বিষের সিঁড়ি ভেঙে
অজানা নদীর জলে!
গতকালও ওরা ওই বাড়িতে ছিলো।

আকাল

এইসব কঠিন সুরেলা বাতাস কতো আর গ্রহণ করা যায়,
চারিদিকে পাথরের মেঘ,
পৃথিবীর অন্তর ছেয়ে গেছে যন্ত্রণার কালো ধোঁয়ায় ।
পৈশাচিক স্বর ভেসে আসে
সকালের রোদযুক্ত পথ,
বেদনার ফেনায় ভরে গেছে সমুদ্র-নাভি ।
মানুষে মানুষে হানাহানি—
অসভ্য নুড়িকণা শুয়ে থাকে
শোভিত গৃহের কোণে,
গোলাপের গুচ্ছ থেকে ধীরে ধীরে প্রেম—
মানবিক লতাগুলো খসে পড়ছে, বারবার
অন্ধ কাকাতুয়া হামেশাই উঁকি দেয়
কোমলতার বানে ।

নির্ণয়ের আকাল এসে গেছে সারাবিশ্ব জুড়ে,
শুধু ক্রন্দন, যুদ্ধ-বেদনার প্রহসন,
ধ্বংসের খবর নিয়ে কাটাতে হয় কাল ।

সুবর্ণ গ্রামের গল্প

অবশেষে ওরা অপরূপ গ্রাম ছেড়ে চলে এলো।
পিতামহের ভিটার আদর রেখে, কিশোরবেলার উচ্ছল জ্যোৎস্না
ভুলে গিয়ে
বেদনার নদী পার হয়ে নিশীথ রাতের অন্ধকারে
ছেড়ে এসেছে বসন্ত বেলা।

এইভাবে আমাদের ক্ষেত মজুরের ইতিহাস,
ম্লান ধোঁয়ার আবরণে কুয়াশাচ্ছন্ন শিশিরের
সন্তাপে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়।
কৃষকের ধানের জমিনে বেড়ে ওঠে যন্ত্রণার হাওয়া,
এইভাবে ঈশা খাঁর সোনারগাঁ,
এইভাবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা,
এইভাবে লালবাগ কেল্লা, হযরত শাহজালালের
সময়, সন্ধ্যা, কোমলতা নুয়ে পড়ে নদীর দাপটে।

অস্থির গ্রহণ ধীরে ধীরে মানবতাহীন, ক্ষয়িষ্ণু
বালিচরে বৈষম্য বিহ্বলতা ঘিরে খাচ্ছে
কালু শাহ'র মাজার।
ছোট সোনা মসজিদ থেকে উড়ির চর,
এইভাবে সোনাকান্দার কেল্লায় অশ্রুধারা শুয়ে
থাকে বিস্ময়কর লোবানে।
তার পরও এখানে স্বস্তির সকাল এলো না,
এখনও ওপারের বিপর্যস্ত গ্রামগুলো থেকে
প্রতিনিয়ত গাঢ় দুঃখের নিশ্বাস ধেয়ে আসে
অন্তরে স্পর্শ করে খর্বকায় বিভৎস হাত।
যাদের আঁচলে ভর করে একদিন খুব ভোরে
জেগে উঠেছিলাম আমরা ;
আমাদের বোনেরা যেসব বিনাশের চিত্র মুড়ে
বের হয়েছিল ক্লান্ত পথে,
সে-পথের করুণ দাগ আজও শুকায়নি,
আজও নির্মমের চাষাবাদ নিয়ে রাত্রি কাটাতে হয়
এগারো কোটি জীবন,
জীবন, আহা সে কী সুখের প্রার্থনা,
এতোকাল পরও লাশের মুখ দেখে ভোরের সূর্য ওঠে,
রাজধানীর মাটিতে নারীর ইজ্জত নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে
ঘাতকের থাবা।
এইভাবে আর কতোকাল! কতোকাল এইসব...

স্বীকারোক্তি

তুমি আমাকে যুদ্ধ শিখিয়েছিলে বলেই
আজও আমি যুদ্ধ করে বেঁচে আছি।
তোমার কথাগুলো,
স্বপ্নের তারকাখচিত পাখিগুলো
শস্যের কণায় কণায় ঘামের মিছিল করে বেড়ায়—
এই উদ্দামতার শিখরে প্রত্যহ আমি
একমাত্র সৈনিক হয়ে যাই।

বুদ্ধের ধ্যানের মতো মিশে যাই মুক্তির অন্বেষায়।
এ আমার পরম গৌরব—হে আমার শ্রেষ্ঠ মানব।
তুমি আমার মাতৃভূমির মাটির সাথে
প্রেম করতে শিখিয়েছিলে বলে
আজও আমি নদীর জলের সঙ্গে
ইতিহাসের গল্প নিয়ে থাকি।
এ আমার আত্মার কথোপকথন,
যা তুমিই প্রথম উচ্চারণ করেছিলে
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

রহস্যময় বৃত্ত

কোনো-এক বৃত্তের খোলসে আটকে গিয়েছে পৃথিবীর পথ,
যেদিকে এগোতে যাই সেদিকেই বাধা,
রুদ্ধ চাঁদ এসে শরীরের ঘাম, হিংস্র রক্তের সাথে ডলাডলি খায়।
যে-পথে পড়েছিল কুৎসিত ছায়া—লবণাক্ত দিনের প্রপাত,
সেখানেই পুনর্বার দেখতে হয় দীনতার আলিঙ্গন।
বারবার শুধু আমাকেই গ্রহণ করতে হয়
পরিত্যাক্ত জীবনের গ্লানি,
কঠিন বরফ, আর নষ্ট বাগানের ধূলি।
এভাবে কতো যে খালি হলো গ্রাম,
কত বুক শূন্য পর্বতের ধোঁয়ায়—
দুর্গত মরুর স্বপ্নে বিদ্ধ হয়ে গেলো।
তার পরও শোকের চিহ্ন—অস্বস্তির প্রহর গেল না।

আমাদের স্বপ্ন থেকে হয়তো কিছু লতা মজে গেছে,
একদা যেই নদীর ওলানে জীবনের পুষ্প ছিলো,
নারীদের প্রাণে ছিলো আগামী দিনের বসন্ত,
আজ সেখানে সহসাই বিষবাষ্প এসে ভিড় জমায়।
সম্ভাবনাময় তরুণের করুণ আর্তনাদ আমাকে বিব্রত করে।
জ্যোৎস্নার মতো বোন—তাকেও দেখি অসত্যের বনে যায়,
লাবণ্য হারিয়ে অজস্র শঙ্খনীল বউ
সংসারবিবাগী হয়।

একি দুঃসহ অন্ধকার বিবর্তনে রেখেছি পা।
বেদনাক্লিষ্ট মরুঘাস এসে ছেয়ে গেছে সারা পথ।
কেনো-এক নির্মম বৃত্তের খোলসে আটকে গিয়েছে পৃথিবী।
কোথাও মুক্ত আকাশ বাসযোগ্য— প্রহর নেই।

মানুষেরা

মানুষগুলো মানুষ হলে
ফানুসগুলো ক্ষয়ে যেতো,
সরল বনের হৃদয় থেকে
রক্তপাতের কবর হতো,
নিদ্রালোভা শিশুর চোখে ঘুম হতো,
সোনাবানুর বস্তির জীবন চলে যেতো
চিমনির ধোঁয়ার আগের মতো প্রাণ পেতো,
হাঁটার পথে দিনে-রাতে আদিম কালের
বর্বরতা ধসে যেতো,

মানুষগুলো মানুষ নয় তো,
আত্মহনন, খুনাখুনি কথায় কথায়,
নিজের ভেতর দহন লতার ছড়াছড়ি,
কৃষক-শ্রমিক জনগণের ভাগ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি,
মানুষগুলো মানুষ হলে
অত্যাচারের দুর্গগুলো ভেঙে যেতো ।
রুদ্ধদ্বারের আকাশ থেকে শোষণগুলো চলে যেত ।

একটি শব্দের জন্যে

একমাত্র মানবতা শব্দটি শুনলেই আমার
সমস্ত বেদনা মুছে যায়।
মাঝে মাঝে কোনো বক্তৃতার সভায় কিংবা
তুখোড় আড্ডায়, এ শব্দটি কেউ-কেউ
নিরপেক্ষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়
কণ্ঠ উঁচু করে
চর্চা করে ফ্যালে।
তখন দাসত্ব থেকে ওই শব্দটি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে,
হয়তো তার বন্দিত্ব তখনও অটুট থাকে
কিন্তু আমার বুক গর্বে তারুণ্য খুঁজে পায়।
অন্তত বলতে পারি—
মানুষ সুন্দর পৃথিবীর জন্যে
শাশ্বত প্রীতির অস্তিত্বের জন্যে
আজও কী করুণ আর্তনাদ করে!

আমার কী এমন দেওয়ার আছে!
পৃথিবীতে কিছু পেতে চায় তাদের সংখ্যাই বেশি,
যদি দেওয়ার মতো কিছু পাই,
তা হলে সবই ওই শব্দটির জন্যে রেখে যাবো।

বটগাছের গল্প

বটগাছ দেখলেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে যায় ।
কৃষকের মুখে এতোবেশি তৃণ ঘাসের প্রতিচ্ছবি ছিলো,
মাকড়সার ভাস্কর্যের মতো সারাটি জীবন
লাঙলের হাতল টেনে গেলেন,
একটি বারও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে
বলতে পারলেন না, "ভালো আছি" ।

তার কাঁধে ছিলো ব্রিটিশ—পশ্চিমা অসুরের বোঝা,
সারাক্ষণ চোখের সম্মুখে তাক করা ছিলো মারণাস্ত্র ।
মাঝে মঝে আমার মাকে সঙ্গে রেখে কোরাসে গেয়ে ফেলতেন,
জান নাও, তবুও আমার ফসল আমার গোলায় থাক ।
হায় বাবা ; মৃত্যুর আগে তুমি একদিনও বলতে পারলে না
এ নদী আমার,
আমি এর জলে মন ভরে সাঁতার কাটতে চাই ।
বলতে পারলেন না,
এসো আমেনা হাকিম আজ আমরা মুক্ত পথে পথে ঘুরে আসি ।

তার পরও তুমিই ছিলে একচ্ছত্র গেরস্তের অঙ্গীকার ।
বিস্ময়ের নিরালোকে কখনও কখনও শিশুর কান্নার মতো
তোমার অন্তর থেকে তরঙ্গায়িত হতো প্রেম ।
বটগাছের শাখা-প্রশাখার মতো তোমার মধ্যে
বিচরণ করেছি আমি, বোন
খুশি আর ভ্রাতার দল,

সে কি চাঁদের সহিত জড়াজড়ি করে থাকা,
ভোরের বুড়িগঙ্গা যেন—
তোমার বুকের উপর চর-দখলের কায়দায়
আমরা কতকোটিবার ঘুমিয়ে পড়েছি,
আজ আর সে-স্বর্গের স্পর্শ নেই,
বাবা তুমি নেই—
আমাদের সেই স্বস্তির শিশুকাল—স্বস্তির ঘুমও নেই ।

কঠোর বৃষ্টিপাত

এক ধরনের স্বপ্নহারা মেঘ হয়ে তুমি সমগ্র আকাশ
চষে বেড়াচ্ছো,
বুক জুড়ে ন্যুব্জ পাথরের চোরাগলি পথ ;
অন্ধ বালুচর,
অলৌকিক বেহালার সুর তুলে যখন সাজানো
সংসার ভেঙে যাও,
কিংবা মাকড়শার সুতোর ঝংকারে

হঠাৎ চুরমার করে ফ্যালো
মানবিক তাল, সাধুর আস্তানা
ঠিক তখনই মনে হয় ; আমাদের জন্ম-জন্মান্তর
শৈশবের কালিমাখা ভোর
শিশিরের আস্তরমাখা রাত, সমুদ্রগর্জন
শহরের জমজমাট বাগান,
কৃষকের লক্ষ্মী বউ, গ্রাম্য বাগান
এসব কিছুই ভালো নেই ।

মনে হয় কী এক নোনা ছাকল-বাকল ছেয়ে গেছে
সারা পথ ;

উবু থুবু নদ-নদী, মরা শালিকের পোশাক-আশাকে
পূর্ণ হয়ে গেছে ।
নকল কণ্ঠস্বরে কথা বলে তথাকথিত মানুষ,
আমরা এভাবেই অনুজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছি, এরকম হয় কেন?

শব্দ শুনতে হয়

আমার নিজস্ব কিছু-কিছু সময় আছে—
শিশিরের ঝিম-ধরা লতাগুল্মের সাথে সেই সব সময়ে
কথা বলতে হয়!
পাহাড় ঘুমিয়ে পড়া বিকেলে, কিংবা
গারো মেয়েদের হাঁটাহাঁটির শব্দ শুনতে হয়,
কোনো কোনো দিন ঝরনার জলের ছদ্মাবরণে
কান পেতে শুনে নিই
ঈশ্বরের ভালো মন্দের ঠুংরি গান।
বুকে বিদ্ধ থাকা করুণ আবহাওয়া কখনো তাড়াতে
পারি না বলে,
মাঝে মাঝে আমাকে এভাবেই প্রকাশ করতে হয়
সমকালীন মানবিক চিত্র!
নিশিতে দুহাত মেলে পদ্মার যৌবনদীপ্ত মুখ,
বিলীন-হওয়া গ্রামের করুণা বুঝতে হয়!

কিছুকাল একান্ত আমার জন্যেই থাকে,
এর সাথে অন্য কোনো নদী নেই,
পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী যে-মেয়েমানুষ,
তাকেও আমি এ-মুহূর্তে গ্রহণ করতে পারি না।
কেননা আমি তো সুনিবিড় বৃক্ষের বেদনা বুঝতে বুঝতে
এখানে এসেছি কোনো-এক কালে!

কার সেই অমোঘ সাহস,
আমাকে বাউল সভ্যতার আলিঙ্গন থেকে
দূরে সরাতে পারে।

অসুখ

তোমার অসুখ হলে মনে হয়
পৃথিবী অসুস্থ হয়ে পড়ে।
সমুদ্রগর্জন থেমে যায়,
পাহাড়ের গায় বিষণ্ণ আবরণ জেঁকে বসে
শান্ত শহরের অন্তরে—সমাজের অস্থিমজ্জায়
দিনের যাবতীয় কাজকর্মে
কী যেন নেই-নেই ভাব—অসহনীয় দারুণ বিক্ষোভ
এসে চষে বেড়ায় সাজানো মানবতায়।

তোমার অসুখ হলে সকলই বিপরীত হয়ে যায়,
উলটো পথে চলে ব্যগ্র আবহাওয়া
পত্রিকার পাতা ছেয়ে যায় শোকের খবর,
সাধুর আস্তানায় কীরকম লাবণ্যহীনতা,
অসার বিহ্বলতায়
ধানক্ষেত নুয়ে পড়ে কঠিন বরফে।
ধুরন্ধর কৃষক হায় হায় করে নেমে আসে পথে,
ঢের হতাশায় নদীর জল লোনায় লোনায়
কাতর হয়,
তৃণ ঘাস, সেও প্রার্থনায় ডুবে গিয়ে বলে,
তোমার যেন আর কখনো অসুখ না হয়।

তোমাকে ঘিরে দুটি কবিতা

১.

বৃষ্টির ফোঁটায় তোমার মুখ বেশি উজ্জ্বলতা পায়।
মেঘের চাদর এসে বিছিয়ে রাখে ছায়া ;
অসংখ্য প্রেমীয় গ্রহের হৃদয় হতে তখন তারকাখচিত
পুষ্পদল এসে গন্ধ বিলিয়ে যায় ;
নির্বিবাদে কবির ধ্যানে নেমে আসে অন্তরঙ্গ বিকেল।
তোমাকে মানায় নিশীথ রাতের টুপটাপ বর্ষণের কালে,
ভেজা সড়কের লজ্জাবতী ইট, বালি পিচ, ঘুমিয়ে পড়া
বৃক্ষের পাতাগুলো প্রার্থনায় মজে
তোমারই নিভৃত ভূমে।
বাগানের উদিত কলির মতো তোমার দৃষ্টিগুলো তখন
নদীতীরে ফেলে যায় অসহনীয় ঢেউ—
দূর-দূরান্তের তৃষ্ণার্ত পাখি এসে লুফে নেয়
সুন্দরী জীবনের লতাপাতা।

২.

চমৎকার! যে তোমাকে পাহাড়ের চুড়ো থেকে
নামিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে লন্ডভন্ড করে দেয়,
তুমি তারই নামের ওপর সারাক্ষণ ধূপবাতি জ্বেলে
পূজায় মগ্ন আছো।
যে তোমায় কক্সবাজারের কোমল সন্ধ্যা থেকে
চুষে নেয় ঈশ্বরীয় গ্রহ।
চমৎকার! তুমি সেই নদীর জলে বার বার
ডুবসাঁতারে আছ।

রোগ

একটি বেগবান যৌবনের জন্যে
সুন্দর রাস্তার জন্যে
সুবাসিত ফুলের সৌরভের জন্যে
পৃথিবীতে যেদিন এলাম,

তার পর থেকে
হৃদয়ের সকল উচ্ছ্বাস গেছে,
রক্ত, ঘাম, ভালোবাসা গেছে,
ঘরবাড়ি, স্বজন মাঠের ফসল গেছে
মন দেয়া পাখির সংকল্প রমণীও গেছে
আমার পৃথিবী এখনও আলোকময় হলো না।

একটি অনবদ্য গজলের জন্যে
শান্তিমালারাত্রি—
উদার রুদ্রের নিশ্বাসপূর্ণ দিনের জন্যে
গভীর প্রণয়াবদ্ধ জাতিসংঘের জন্যে
পৃথিবীতে যেদিন এলাম

তার পর থেকে
মানুষের ভাতের জন্যে অনেক মানুষ গেছে,
রঙিন কিশোরীর স্বপ্ন ; বঙ্গোপসাগরের ঢেউ,
বসন্তের সমারোহ—সবুজের উল্লাস গেছে।
কিন্তু হারিয়ে-যাওয়া দোয়েল এলো না।

এমন বিপন্ন ঝাউতলায়

চিরকাল একটি নরকসিক্ত দ্বীপে দাঁড় করিয়ে রেখেছো আমায়।
স্থির চোখে তাকাবো মানুষ, গাছপালা পৃথিবীর দিকে,
সেই বিকেলের ছায়াচ্ছন্ন, জারুল ; নকশিভূমি আজ আর নেই!
ভিয়েতনামের মতো আমার বিরুদ্ধে আমি,
গাজার দুঃখের আকারে তোমার বিরুদ্ধে তুমি,
হয়তো অনেকেই বিরহানলে নির্মম প্রদীপ জ্বেলে চলেছে!
ঘরের কোনায় যে ছোট্ট একটি বকুলের চারা,
তার হাত-পা বাড়লো
চোখের জল ফেলতে ফেলতে।
শিকড়বাকড়হীন গজিয়ে থাকা। এটা কি জীবন?
তোমরা আমাকে এমন বিপন্ন ঝাউতলায়
দাঁড় করিয়ে রেখেছো,
নদীর প্রবাহ বলছে,
আমি বুঝতে পারি না আমি কোথায় চলেছি,
ক্রমাগত জঞ্জালের পিঠে ভর করে এগিয়ে চলেছি
ঢেড় জঞ্জালের দিকে!
পথের ধূলিকণাও বলছে,
অবিরাম ভুলের চিত্র আঁকতে আঁকতে নেমে পড়ছি
ভুলের সমুদ্রে।
সবকিছুকেই মনে হয় কাঠের পুতুল।
রাজধানীর আকাশ-বাতাস, দালানকোঠা বিপণিবিতান
একদা ওরাও দেয়ালের আত্মঘাতী চিকা পড়ে
ছি ছি ছুড়ে মারত,
মিথ্যার লিফলেট দেখে দগ্ধ মাটিও ফুলেফেঁপে যেত!

আজ সবকিছুতেই নিষ্প্রভ, ভাষাহীন নিথর বয়ে চলা,
মনে হয় মানুষ নুন, মরিচ, ডাল-চালের পণ্যে পরিণত হয়েছে,
তোমরা আমাকে এ-কোন গ্রহে দিয়েছ ঠাঁই।

মানব-বন্ধন '৯২

সকল শোক ও হারানোর মাঝে কিছু-কিছু খবর আসে,
যার অন্তর জুড়ে বয়ে যায় পিতামহদের ঐতিহ্য ধারণের বাঁশি,
অসহ্য পোকামাকড়ের ব্যাধি তাড়াতে আমরা যখন
ক্লান্ত হয়ে পড়ি,
আমাদের মৌসুমকে যখন গ্রাস করে অশুভ মরীচিকা, নটীর বহর,
দীর্ঘকাল বসে থাকি উদ্দেশ্যহীন বর্বরের তাণ্ডবনৃত্যের বহতায়,
তখন সিগারেটের ধোঁয়ার দলায় রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস এসে
কবিতার লাইন খুঁজতে থাকে।
বড় ভয় হয়। লোকটা কী শক্তিমত্তায় সারাক্ষণ ফসলের বাগানে
নিজেকে জড়িয়ে রাখে।
হিংসাযোগ্য শাদা দাড়ির স্তূপে ঝাঁকে ঝাঁকে শিল্পকর্ম ভিড় জমায়।
তাঁর চোখদুটো এখনও কি
প্রেমময় গানের সংলাপ খুঁজে
এশিয়াকে তুলে ধরে জাতিসংঘের পাতায়।
আর আমার দিনের ভাবনায় অজস্র বেহুদা চড়ুই পাখি এসে
কিচির মিচির শব্দ করে,
রাতের অন্ধকারে হায়েনার ধ্বংসাত্মক ছুরি উদ্যত হয়।
জানা-অজানায় অসংখ্য নাগরিকের বুক চুরমার করে দেয়
আততায়ী হাত।
ইতিহাস ঐতিহ্যবিরোধী বক্তব্য শুনতে শুনতে আমাদের
কানগুলো যখন আর কাজ করতে পারে না,
ঠিক সে-সময়,
ওই ঝাঁকড়া চুলওয়ালা সন্ন্যাস মুখে মাইক্রোফোন ধারণ করে
কবিতায় বিতর্কের প্রতিবাদ জানায়।
সাম্প্রদায়িকতার চোদ্দ গুষ্টিকে উজাড় করে।
ঠিক সে-সময়, শওকত ওসমানের আপোসহীন শব্দাবলি,
শামসুর রাহমানের কালজয়ী কবিতা সম্মুখে এগোতে সাহস জাগায়
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর ধারণ-করা মূল স্রোতের কথামালা
মানচিত্রকে নিরাপত্তা এনে দেয়।
আমরা যখন বাক্যহীন, ভুল চরকায় হাত বুলাতে বুলাতে
বৃক্ষহীন হয়ে পড়ি
তখন এইসব সূর্যকায় নাবিক দুঃসময়ের জাহাজে তুলে দেয় পাল।
আজকাল আমার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বেঁচে থাকার অবলম্বনে
খুব বেশি নিষিদ্ধ রঙের প্রলেপ ফুঁসে উঠছে।
কিছু নষ্ট ঘাসের বিচরণে সমগ্র ধাবমান লতাগুল্ম

মাথা নুয়ে অস্তিত্ব হারাবার ছায়ায় মুহ্যমান,
আমার মেধা ও মগজে যখন ঘাতকের মর্মান্তিক গজলের সুর
ভেসে যায়,
আমি তখন দুহাতের আঙুলে খুব দ্রুত ইতিহাসের পাতা উলটাতে থাকি
কী আছে কী নেই, কিসের বন্যায় ঝরে যায় রক্তের ফসল,
এইভাবে কতোকাল আমরা মশকনিধনে সিংহের গর্জন করে যাবো।

আমার দুচোখ ঘাতকের মিছিল দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।
এবার পৃথিবীজোড়া ঘাতক নিধনের মিছিল চাই।
আরও ; আরও বিরানব্বই-এর মানববন্ধন চাই।

ওরা আমাকে চিনলো না

দীর্ঘকাল পর মধ্যনগরে গিয়ে আমি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছি।
যেখানে মাটির কলসের জল পান করে ফসলের মাঠে তাকিয়ে
পুরো বাংলার প্রতিকৃতি ফিরে পেতাম,
একাত্তরের কুকুরগুলোর থাবা দেখে নতুন কবিতার জন্যে
মেতে উঠতাম সাহসী যৌবনের দিকে,
তার হৃদয় জুড়ে এক ঝাঁক কালো শালিকের ওড়াউড়ি দেখে
আমার দুচোখ ভরে উঠেছে অসুখী চিত্রমালা।
এতো ক্লান্তি মানবতা-বিপর্যস্ত পদভার আমি আর কখনো দেখিনি।
পা ফেলতেই অসংখ্য কঙ্কালের ছায়া প্রচ্ছায়া
নৃত্য করতে করতে তাড়া করছিল আমায়,
নির্জন গ্রামের থুত্থুরে নির্বাক ভূমির বিলাপ আমাক টেনে
নিয়ে যায় জন্মভূমির কষ্টের সীমানায়।
যেখানে ঘুমিয়ে রয়েছে সারি সারি পদ্ম-হারানো স্মৃতিময় ভোর,
অগুনতি কৃষকের প্রাণ যেখানে যুদ্ধে গিয়েছে ঝড়ে,
শক্তিময় রাখালগুলো যে-গুল্মলতার জন্যে সাবাড় হয়েছিল
অসংখ্য তহুরার নারীত্ব যে-মড়কের তীর খুবলে নিয়েছিল
ওর ছনের ডেরায় উঁকি দিতেই বৃদ্ধ পিতা
আইনুদ্দিন দাঁত কটমট করে চোখ শাসিয়ে বললো,
আপনি কি শ্মশানের চিত্রপট দেখে খবরের কাগজে সংবাদ
লিখতে এসেছেন?
কী হবে এসব মিছেমিছি উপাখ্যান লিখে?
বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটি জ্বলন্ত যুবতীমুখ আমার দিকে
তাকিয়ে একাত্তরের গণহত্যার কাহিনী শুনতে চেয়ে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।
ওই মুখ তহুরার রেখে-যাওয়া মুখ। যে-তহুরার দেহ টানতে
টানতে ; অন্তর ছিঁড়তে ছিঁড়তে হায়েনার দল
পৃথিবীকে অবাক করেছিল।
যার জন্ম হয়েছিল বর্বরদের ধ্বংসস্তূপের মাঝে।
আমি বলতে চেয়েছিলাম আপনারা কেমন আছেন? এখনও কি
মধ্যরাতে এই গ্রামে আপনহারা চিৎকার শোনা যায়?
এখনও কি বাহার আলী তার স্ত্রীর জন্যে রাত্রি জেগে থাকে?
আমার আর কিছুই বলতে হয়নি।
ওই দুটি মুখ আমাকে তাড়া করতে করতে নিয়ে গেছে
বুড়িগঙ্গার তীরে।

নদীর পার-ঘেঁষে বালিতে মিশে-যাওয়া চাপ চাপ রক্তের
কাহিনী বলতে বলতে ওরা চেঁচিয়ে বলছিলো—
তোমরা কি আমাদের তহুরার নারীত্বকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছো?
কৃষকের মুখ থেকে মুছে, যাওয়া চিরায়ত হাসিগুলো
পেরেছো কি ফিরিয়ে দিতে?

আমি আর কিছুই বলতে পারিনি।
ক্লান্ত-নিঃশব্দ, সর্বস্বহীন মধ্যনগরের রোগাটে পথ ধরে
হাঁটতে হাঁটতে যখন খেয়া পারাপার হচ্ছিলাম,
তখন একটি মুখে বেজে উঠেছিলো
"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"।
আইনুদ্দিন উঁচিয়ে ধরেছিলো একটি পতাকা—
যার শরীরজুড়ে ত্রিশ লাখ শহীদের নাম। সালাম, বরকত, রফিক, শফিক—
আরও অসংখ্য গুচ্ছ নাম।

এতোকাল পর

এতোকাল পরও তোমার মধ্যরাত্রির পিয়ানোর সুরমালা
আমার ভেতরে খুঁজতে এসেছিলো চাঁদ।
আমি সীতা পাহাড়ের গুচ্ছ গুচ্ছ বৃক্ষদের কানে কান পেতে
শুনতে চেয়েছিলাম সুবর্ণকালের বাঁশি,
চন্দ্রঘোনার বায়ুস্তর ঘেঁষে বিলাপ করছিলো একঝাঁক
উপজাতি-মুখ,
আমি তাদের কেউ-একজন হয়ে এতোকাল যে নিরন্তর
পোড়-খাওয়া আদম আবিষ্কারে মগ্ন হয়েছিলাম,
অশরীরী নিশ্বাস এসে হঠাৎ নদীর ঢেউ কেড়ে নিয়ে গেছে—
তুমি তখনও ঝাউ বনের আড়ালে থেকে কী বিষণ্ন গতিতে
আঙুলের খেলা চালাচ্ছিলে, প্রদীপ্ত

যন্ত্রী পাগল মেয়ে।
এভাবে আকালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একসময়
রাঙামাটির আকাশজুড়ে নেমে এসেছে দুর্বিনীত মেঘ,
একসময় কয়েকটি উপজাতি মুখ হেসে উঠেছিল।
কী বিস্ময়! তুমি একবারও রঙিন পাহাড়ের দিকে
তাকালে না;

বৃষ্টি এসেছিলো।
লতাগুল্ম যেন কতকাল পর ফিরে পেয়েছে জীবন।
তুমি তখনও পিয়ানোর ন্যায় আদর করছিলে—
এক সময় নিশীথ রাত্রিশেষে আঁকাবাঁকা—উৎফুল্লচিত্তে।
তুমি দুহাত নেড়ে বললে—আমি যাই, আসি।

সব মানুষকে একবার

আমাদের দেহ জুড়ে সমুদ্র-গজল শুয়ে থাকুক আজন্মকাল।
যারা বঙ্গোপসাগরের অতল বুক ছুঁয়ে জলাগ্নির রূপায়ণ দেখেনি,
তারা হয়তো দুঃখ অবসানের তরবারি খুঁজে পাবে,
হারানো জন্ম ইতিহাস,
রক্তবীজ ঝরানোর গান শুনতে পাবে।

কৃষ্ণকলির আর্তনাদ শোনার আগ্রহে যেসব উদ্বিগ্ন সন্ন্যাস
ছেড়ে এসেছে কৈশোর-যৌবন, গৃহের মায়া,
যে-রমণী উড়ন্ত প্রজাপতির রং—চন্দনটিপের নেশায়
বিকিয়ে দিয়েছে সবগুলো বসন্ত,
সারারাত তাদের দেহের কোষে কোষে শুয়ে থাকুক
এই বিশাল জল নীহারিকা।

সব মানুষকে একবার সাগরের রক্ত পুঁজ-গর্জন-ভালোবাসার
প্রহর দেখে আসা প্রয়োজন ;
তেতো মেঘ-মরীচিকায় কুনিশ্বাস মুছে ফেলার জন্যে
তেমন সুসম্পন্ন মাজার কোথায়?
মাথা ওঠাবার জিকির তোলার আরাধনা কোথায়,
শুধু পাওয়ার নেশায় নিমজ্জমান পৃথিবীর সব স্তবস্তুতি,
আমাদের বিপন্ন হৃদয়কে ঝেড়েমুছে সাজাবার স্বাদ কোথায়।
উষ্ণ বালিপথ ; শঙ্খিল গঞ্জের বায়ুপথ
বয়ে যাক সব মানুষের জীবন,
আমাদের অন্তর জুড়ে শুয়ে থাকুক সমুদ্র-গজল আজন্মকাল।

মনে পড়ে যেতে পারে

তুমি কখনো উত্তর পাহাড়ের কোলঘেঁষে
শরীর হেলিয়ে দাঁড়াবে না।
যদি কখনো রিমঝিম বৃষ্টি হয়,
ঘাসের যৌবন বাসন্তীবিলাসে চুমোর উৎসবে মজে,
তা হলে আমার কথা মনে পড়ে যেতে পারে।
কদমের গন্ধে নীরব গলির স্তূপ যদি ভৈরবী রাগে
নীলাকাশ খোঁজে।
তখন তোমার চোখে আমার ছায়াটি জেগে উঠতে পারে।

আমি তো নির্বাসিত ডেরায় বন্দি প্রহরের চিল।
কোথায় উড়ে গেছি কেউ তা জানে না,
যখন পৃথিবীর শিরা-উপশিরায় একঝাঁক কঠোর
প্রজাপতি মেলেছে পাখা,
এই দেউলিয়া আগ্নেয়গিরির তাণ্ডবে তুমি কীভাবে
সমুদ্রের পারে ভেলুয়ার ছবি আঁকতে এলে?

বনতরু শস্য, মহুয়া বাদক আজ নিঃস্ব
ঝাঁটা-খাওয়া ধুলোর লোবানে
কেউ-কেউ সন্তর্পণে মিশে গেছে।
সভ্যতার বুক থেকে ঝাউগাছ, মেহগনির বিলাপ
ক্রমাগত ধেয়ে আসে,
এই মধ্যযুগীয় দুঃখের হিরোসিমায় তুমি কখনো
কোমল বিকেলে বের হতে যেও না,

যদি কখনো রাত্রির অন্তর বেয়ে রবীন্দ্রনাথের গান এসে
হানা দেয়,
তখন আমার কথা মনে পড়ে যেতে পারে।

বৈশাখী পঙ্‌ক্তিমালা

আঙুলের করে বয়স গুনতে গুনতে আমার পিতামহ গেছে পরপারে।
তার পিতামহও এমনি ছিলেন।
তাদের পূর্বপুরুষেরা পাঁচ কুড়িতে একশ' গুনে গুনে
অভাবী সংসার সাজিয়ে ছিলেন।
গড়েছিল এই ব্রিটিশের ধমক-খাওয়া বাড়ি।
এখন সন্ধ্যার পর সেই আগের মতন পুঁথির আসর জমে না।
তবে বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ কোনো-এক কিশোরের
কণ্ঠে বেজে ওঠে পশ্চিমা সংগীত,
ধানের জমিতে কলের লাঙলের ধুপধাপ আওয়াজ শোনা যায়।
ঘরের কোনায় যন্ত্রকৌশলে ধান থেকে চালের জন্ম হয়,
এখনও আমার দাদির হাতের আঙুলে এক দুই গোনার অভ্যাস,
গ্রাম থেকে নাতিকে চিঠি লেখে,
পয়লা বৈশাখে দাদু বাড়ি ফিরে এসো।
বছরের প্রথম দিনে বাহিরে থাকিতে নাই,
তোমার মায়ের মুখ দেখে যাবে একবার।
খেয়ে যাবে খই উখড়োর সাথে কলার মোয়া,
কাওনের পিঠা তৈরি করে রেখেছে ছেলের বউ আমার।
বিকেলে বকুলতলায় বসে মুড়ির সাথে মিঠাই খাবে এবার,
আরও যে কত কী!

আঁচলে গিঁট দিতে দিতে হিসেবনিকেশ করা
এখনও আমার মায়ের অভ্যাস,
গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তারই ছায়ায় ছায়ায়
প্রস্ফুটিত হয় বাঙালি সংস্কৃতি,
এখনও তারাই আমাদের পয়লা বৈশাখ।

ভেঙে দাও নারকীয় দেয়াল

এই দাহ এই তাণ্ডবে

অবশেষে জেনেছি সবাই চলে গেছে যার যার পথে,
শুধু আমাকেই কঠোর প্রভাতে, বিষবাষ্পঘেরা কুয়াশায়
নিতে হচ্ছে বন্ধুদের লাশ।
এতো গলিত লাশের পরও আমাকে আরও নিতে হচ্ছে
ইতিহাস-শূন্য-করা গল্প।

শোনো হে, উদাস দুপুর, শোনো বিদগ্ধ সমুদ্রের ঢেউ,
এখানে আজ বড়ই বিরোধী বাতাসে ভেসে উঠছে
পরাজিত গাঙের মাছ,
আজন্ম-বেজন্মার দল—তপ্ত বারুদে
ধসে গেছে বসন্তের গোলাপ,
স্বর্ণময় নক্ষত্রগুলো বারবার কেড়ে নেয় নটীর বহর,
আমি শুধু আজ সাজানো গৃহের কোণে লাশ দেখি।
ভালোবাসার প্রহরে দেখি খুনির হামাগুড়ি,
আমরা কোথায় চলেছি, কেউই জানে না!
কেউ বোঝে না কেন আমি মাঝরাতে সংগ্রাম-সংগ্রাম
বলে চিৎকার করে উঠি।

সবাই যার যার পথে একে একে চলে যায়,
পড়ে থাকে বিধ্বস্ত শহর-মধ্যগ্রাম
পড়ে থাকে কারখানার ঘামঝরা চিত্র, গমভরা ভূমি,
সংসার-হারানো শিশুটি একাকী দাঁড়িয়ে থাকে কলঙ্কময়
রাজধানীর সিঁড়িতে,
কুপি-হাতে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো এক মা—আদিম দরজায়,
অথচ ওরা কেউ আসে না, দুষ্প্রাপ্য শান্তি কিংবা হৃদয়ের ভোর,
অবশেষে জেনেছি,
কেউ না গেলেও আমাকেই যেতে হবে পথে,
কিংবা শান্তির নিমগ্ন সংগ্রামে।

শূন্য ছোঁয়া

দুচোখের জমিন জুড়ে অনেক কিছুই প্রস্ফুটিত থাকে আমার,
শুধু তোমার আশ্বাসটুকুই থাকে না, তোমার ভালোলাগা ।

তুমি তো স্বাধীন ভোরের একাকিত্ব শঙ্খনীল বাতাস,
বৈকালিক নদীর মতো নীরবে প্রতিশ্রুতি-রাখা সমুদ্রের দিকে ।
নির্বাক জ্যোৎস্নার শরীরে ঢেলে দেয়া পুরনো সবুজ লতা,
অনেক কিছুতেই আমি হৃদয়কে অত্যন্ত আপন করে দেখি,
তোমাকেই দেখি না, ভোরের কাছে কিংবা আমার মাঝে ।

আমাতে আমিই আছি, থাকি শোকে-দুঃখে আপনহারা মাটিতে!
বনবাস এই জীবনযাপনে হয়তো অনেক কিছুই নেই,
দুঃখটুকু আছে ছায়ার স্মারক হয়ে প্রতিবাদী ঘরের বুকে—

কতোকাল এই কালো স্রোত উদ্‌ঘাটনহীন অন্ধকার,
মূঢ় ম্লানভাবে বেড়া চলে ক্ষয়িতের দিকে, জনাকীর্ণের দিকে ।
মুখোশ-জড়ানো বন্ধভূমিতে যেন ধসে যাচ্ছি আমি গভীর আগ্রহে
বিনাশের কাক ডেকে ওঠে আমার চারচালা ঘরের দুয়ারে, ওদের
আত্মার কোনো স্থায়ী সুখ নেই ।
কোথাও হয়তো থেমে গেছি আমি, নয়তো তুমিই সবখানে
ধ্বংসের খাদ খুঁড়েছো আমার জন্যে, মৃত্যুকে দেখার আগ্রহভরে ।

আমার তো কিছুই নেই, আর কিসের যন্ত্রণায় রাখবে বলো?

বন্দি হয়ে যায়

আমি আমার কষ্টগুলোর নাম রেখেছি সুখ,
পৃথিবীতে এর বিপরীত কোনো সুখ নেই, যাকে দিয়ে
তোমাদের বুকের আগুন—অসহ্যের তপ্ত জলস্রোত
নিভিয়ে দেওয়া যায়!
কালিমার দহন থেকে উঠে আসে যে বেগবান স্বর,
আমি সেই প্রস্বস্তির দেবদারু, উলঙ্গ আগ্নেয়গিরি,
এমন কোনো সুবাতাস নেই—যা বয়ে গেলে
সকল অব্যবস্থার মাঝে,

শিশুদের কোমল জীবনে, এমনকি
ত্রিশ বসন্তের ফেলে-আসা ভুল চিত্রকল্পে জুড়ে
নেমে আসতে পারে—হারানো শুভ্রতা।
এমন কোনো ভায়োলিন নেই—সেতারের প্রাণ নেই,
যা বেজে উঠলেই সখিনার ক্ষুধার্ত শিশুরা খাদ্য পেতে পারে!

সুখ, এই দুস্প্রাপ্য নামের পলাতক চাঁদ
তোমার-আমার জন্যে নয়,
আনন্দ-উল্লাস, হাসিমুখে বিকেলের মাঠ-ঘাট-নদী দেখা
তোমার আমার জন্যে নয়,
আমি তাই দুঃখকেই আদর করি, কখনো রুটির মতো,
কখনোবা প্রিয় খাদ্যের মতো

চিবিয়ে চিবিয়ে খাই।
সুখ, সে তো ভাগবাটোয়ারা হয়ে যায় রাতে-অন্ধকারে,
যেমন তোমার ভিটেমাটি
আমার পিতৃভিটা চুরি হয়ে যায়,
সুখ—সে তো এভাবেই উধাও হয়ে যায়—বন্দি হ'য়ে যায়।

মনে রেখো

আমাকে মনে না রেখে মনে রেখো আমার দেশ,
যে-দেশে আমি জন্মেছি
এগারো হাজার পাঁচশো বত্রিশ দিন ধরে।
যে-দেশকে আমি সাগরের মত করে
সূর্যের কাছে নিয়ে যাবো,
যেন দেশ আমার বিশুদ্ধ স্বপ্নের কথা বলে।

আমাকে মনে না রেখে মনে রেখো এ-সবুজ পাঁচালি বন,
যেখানে শব্দের সাথে মিশে আছে
আমার অচেনা বাল্যকাল,
রবীন্দ্রসংগীতের প্রত্যেকটি শিরায় শিরায়
মাটির দেয়ালে লেগে থাকে কতগুলো পুরানো পোস্টারের ছাপ।

যেখানে মিশে আছে
ঘাসের চুম্বনে দিনরাত হারানো পথের
নদী ও নারীরা—
রুপোলি বীজের সন্ধানে—
তাদের মনে রেখো।

আমাকে মনে না রেখে,
মনে রেখো বিষণ্ন প্রাণের আচ্ছন্ন সচ্ছলতায় বিভোর,
সমুদ্রসংগীতে লেগে-থাকা জ্বলন্ত স্বপ্নের মতো
অত্যন্ত হৃদয়ের কাছাকাছি এ-দেশ।

মনে রেখো, মনে রেখো
দূরের আকাশে উড়ন্ত পাখিদের মায়ামৃগ চোখ
তুমি তাদেরই মনে রেখো আজন্মকাল।

প্রজাপতির কাছে

আমার রাতগুলো কীভাবে কাটে তা তুমি কিছুই দেখলে না,
আমি যে মানুষ, আমারও ভালোবাসা-নিরাময় জীবনযাপন আছে-
আজও এই মানবিক কথাটুকু বুঝলে না।
পাতাঝরা রাত কীভাবে ঘাতক হয়ে আসে, কীরকম
যন্ত্রণা হয় নিস্তব্ধ ঘরের যাবতীয় কঠোর বাতাসে,
মাথার মগজ নিয়ে পালায় জ্যোৎস্নার বরফ কাঁটার রজনী,
উদ্ভট ঢেউয়ের কাহিনী তোমরা না জানলেও
কেউ-কেউ জানে,

অসভ্য থাবার ইতিহাস জানে দুঃখী প্রজাপতি।
জানে সরল কৃষক, নৌকোর ছেঁড়া পাল ও গ্রাম্যপথ।
আমার এসব বুক-খালি-হওয়া দৃশ্যের হাহাকারে
ঝাড়ুদার, পাহারাদারের স্বপ্ন
ক্ষেতের ফসল তছনছ হয়ে যায়,
তবুও তোমার কঠোর চোখ থেকে ঝরে না পাষাণ জল,
যেন, তুমি হয়ে গেছো এক পাথরের হৃদয় যার মায়াদয়া নেই!
রাত আসে যেন রাত নয়,
ক্ষুরধার শাবল-হাতে ছুটে আসে জ্বলন্ত খুনের আসামি,
মনে হয় তুমি লন্ডভন্ড করে যাও সাধারণ শ্রমিকের ঘর,
এইসব আসা যাওয়ার কি এমন সুখ পাও তুমি,
কেন শত্রুর মতো দিন-রাত বিরহের চাষাবাদ করে যাও।

টান

ঘুরেফিরে তোমার কাছেই যাই, কী এমন
যাদুর সুতোয় একাকিত্ব হয়ে গেছে এই প্রাণ।
টানে, অদৃশ্য হাতের ছুঁয়ে-যাওয়া বিকেলের নদী।
        রিনিকি ঝিনিকি,
তার ঘষে ঘষে রাতভর জ্যোৎস্নার ঘুম ভেঙে যায়,
মগ্ন পাহাড়ের মতো স্থিরতার আঁধার ভেঙে
        টানাটানি করে!

অজানায় বায়ুর নাচনে কখন যে তোমার কাছে যাই,
কখনো যাবো না, এরকম বিশ্বাসের পরও
তোমার ভূমিতেই লাঙল চালাতে হয়,
মাকড়শার গৃহের মতো অভিন্ন সত্তায়
      জড়াজড়ি করে থাকি তোমারই বন্দরে।

তুমি তাড়িয়ে দিয়েছো বৈশাখের
জলের স্রোতের মতো, তার পরও ঘুরেফিরে তোমার কাছেই যাই,
আমি কি যাই, না কোনো-এক বাউল বাহন
আমাকে হরণ করে নেয়।

হে সুন্দর আমাকে নাও

আমার অন্তর থেকে হরণ করা যায় এমন তো আর কিছুই নেই,
সকলই তোমার আয়ত্তে রেখেছো ধরে! যেভাবে একজন রাজা
রাজ্যময় নিজের আয়ত্তে রাখে।
যেভাবে একজন গোয়াল গাভীর স্তন থেকে সমস্ত দুধ কেড়ে নেয়,
যেভাবে দুস্যুর দল কৃষকের জমি থেকে কেটে নেয় সমগ্র ফসল,
তুমি সেই হরণকারিণী পদচ্ছাপ,
যে আমার পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় বন্দি করেছো নিশীথে।
তোমার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেরকম সাহস আমার নেই!

একে একে সকলই নিয়েছো কেড়ে?
এখন শুধু বাদামের খোসার মতো মূল্যহীন কোনো এক পদার্থ আমি,
হৃদয় থেকে দখল করা যায়, সেরকম আর কিছু নেই!

সকলই তোমার গ্রাসে-চুম্বকিত লোবানের ত্রাসে
শিকার হয়েছি আমি!
যেভাবে বালুর কণা মাটিকে আঁকড়ে থাকে,
যেভাবে ফলবান বৃক্ষ বসন্তের দুয়ারে শোভা পায়,
বায়ুতে আত্মস্থ হয়ে বিমানের জয়যাত্রা চলমান থাকে,
যে-রূপে পীরের মাজারকে ঘিরে শিষ্যদের আনাগোনা চলে,
যুদ্ধের অস্তিত্বে, আধুনিক অস্ত্র জয়লাভ নিয়ে আসে,
কারখানার সাইরেন বেজে উঠলে শ্রমিকের ছুটি হয়,

আমার মুক্তি এখন তোমার নিশ্বাস,
তোমার হাতের মাঝে বন্দি হয়ে আছে,
আমি এখন নিঃস্ব, তোমার কারাগারে একজন মান্দেলার মতো
সুদীর্ঘকাল ধরে বেদনার্ত বসবাসে আছি!
আমার কি মুক্তি নেই, আমার কি নেই স্বপ্নময় চোখে একবার
স্বর্ণালী পৃথিবীকে দেখার!
আমিও তো একদিন বিশ্বটা দেখে তোমাদের শান্তি চেয়েছিলাম,
আমিও তো তোমাদের হাহাকারশূন্য দিন,
পাপশূন্য রাত্রি দিয়েছিলাম।

জীবন ও প্রকৃতি

উঁচু পাহাড়ের কান্নার মতো আমাদের দুঃখগুলো এখনও
বৃক্ষের পাতার সাথে,
গত যুদ্ধে সন্তানহারা মায়ের সাথে,
একাকার হয়ে আছে!
শুধু নেই প্রকৃত জীবনের চারাগাছ, উত্থিত জলের ধারা,
তবুও লতানো সুখের পিছনে ছুটছে তৃষ্ণার্ত প্রাণ ।
ঘনঘন মৃত্যু আর শোকাবহ সন্তানের চিত্ররথ খ্যালে—
প্রতিমার স্বচ্ছ খামে ।

এইভাবে অনেকবার উঁকি দেয় বেআব্রু হৃদের দেয়াল,
মানুষ অনেকটা সহ্য করতে পারে, ওরা বারবার
দেয়াল ভেঙে চলেছে বাঁচার আশায়,
মাপজোখ নেই! ব্যাপক ক্ষয়ের মাঝে
এই এক নবীন চোখের জল,
অনেক যাওয়ার মাঝে এই এক সূর্য পাওয়ার আশা ।
এইভাবে আমাদের সকলই গিয়েছে না পাওয়ার মাঝে ।

উঁচু পাহাড়ের মতো আমাদের জীবনযাপন,
শরীরে গেঁথে আছে আগাছার প্রসন্ন বীজ,
ভিতরে জ্বলছে শত শত কারিগর প্রাণ
এসবের কি পরিত্রাণ নেই? কেন নেই!

নিষিদ্ধ জাগরণ

এই দগ্ধ কুন্তিলের ক্রীড়নক হাসি
আমার মনের প্রকৃত চাওয়া হাসি নয়,
শোষকের জ্বালাময় হাত
আমার ভাইয়ের হাত নয়।
লোকজ স্বপ্নের হাতিয়ার নয়!
এই প্রতারণার চোখ—আমার মায়ের চোখ নয়,
পোড়খাওয়া বোনের স্বপ্ন নয়—চাওয়া তো নয়!

আমি যেই হাসির জন্যে হারিয়েছি অসীম সমুদ্র প্রাণ,
আমি যেই হাতের ইশারায় দীপ্ত করেছি পথ,
যে-চোখের উদারতায়—অকাতরে উজাড় হয়েছে গ্রাম,
সেই হাসি আজ অসুরের নগ্ন—ভীত হাসি
সেই বোন আজ বেজন্মার থাবায় লুণ্ঠিত হয়,
বারবার বেদনাক্লিষ্ট হয়,
সেই চোখ আজ দেশদ্রোহীর অন্তরে বেমালুম
হামাগুড়ি দেয়।
চুরি করে নেয় যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া!

এই দগ্ধ কুন্তিলের ফুল,
আমার হারানো বাগানের ফুল নয়।

তোমার না-থাকা

যে-রাতে তুমি ছিলে না,
সে-রাত শত্রুর মতো খুবলে নিয়েছে
সমস্ত কালের আশা,
মনে হয় পাথরের বারোটি যুগ
যুদ্ধেই ছিলাম আমি।

তুমি ছিলে না বলে আকাশে ওঠেনি চাঁদ,
তারাদের ধর্মঘট ছিলো,
গাছের পাতায় পাতায় মর্মরে বায়ু
বয়ে গেছে সারারাত
বিরোধী গর্জনে কোনো বৃক্ষ গ্রহণ করেনি জল,
কোনো ঘাটে ভেড়েনি দুঃখী নৌকো,
দিন-মজুর সুরুজ ফেরেনি ঘরের কাছে।
তুমি ছিলে না বলে সে-রাতে—
রাগ করে অনাহারী ছিলো পৃথিবীর সব লোক।
শীতলক্ষ্যা তার জোয়ারভাটায় গিয়েছিলো থেমে,
মধ্যরাতে দেখেছি রাস্তার পাশে অগোছালো ছেঁড়া তার
পড়ে আছে অভিমান করে,
কারখানার চিমনি রেগে মেগে উদাস ছিলো,
সে-রাতে কোথাও কোনো প্রদীপ দেয়নি আলো!

তোমাকে দেখবে বলে,
একজন ক্ষুধার্ত পথিক কালের পর কাল দাঁড়িয়ে আছে পথে,
উজান গাঙের মাঝি মধ্যনদীতে কাটিয়ে দিলো জীবন,
তবুও একটিবার আসলে না তুমি।

মানুষেরা

কোনো-কোনোদিন আমি মানুষকে চাঁদ বলে ফেলি,
কারুকাজময় যে-রাতের চোখে-চোখে তোমার
সাহসের স্বপ্নটুকু ভাসে,
আমি একদিন সবার অজান্তে তোমার মুখ আবৃত্তি করে
জ্যোৎস্নার সুখ হৃদয়ে রেখেছি ভরে।
অবুঝ শিশুর মতো সেই মোহময় লতার কাছে
প্রাণ নিতে-নিতে
অযথাই গোসল সেরেছি আমি, বারবার
লাজুক কিশোরীর মতো
ফ্যালফ্যাল করে দোষী করেছি গাছ,
আসলে এভাবেই আমি মানুষের মাঝে
দাগ কাটতে-কাটতে
ফসলের মাঠ গড়তে-গড়তে যাই,
আদিম গ্রামের নাভিতে জল ঢালতে-ঢালতে যাই।

কোনো-কোনোদিন এভাবেই মানুষকে কাছের করে নিই,
ঠিকঠাক করে দিই এলোমেলো দেশের দোতারা।

অন্ধ দেবতার যাত্রা

তোমাদের বাড়ি যাই কৃষকের জ্বালা নিয়ে বুকে,
দরোজায় টোকা দিই ফোঁস করে ওঠে ভিতরে গহিনে
জলভরা চোখ।
করুণ মাঝির মতো উঠোনের ঘাস,
জানালার শিক রেগে বাড়িয়ে দেয় উদাস।
নাক সিটকায় তোমাদের প্রহরী বিড়াল,
বাগানের সব ফুল গন্ধ ঢেকে রেখে বলে
এখানে এসেছো কেন।

গেটের দারোয়ান সেজে বসে রাঙা ইলিশ,
ওরাও তোমার মতো না না করে আমাকে তাড়ায়,
তবুও তোমাকে ডাকি অবিরাম।
বাড়ি নাই, বাড়ি নাই বলে দেয়ালের ইটেরা আমাকে
শাসন-পিষণ করে
তবুও আমি তোমার নাম ধরে ধরে ডাকি,
মাঝেমধ্যে পড়ে থাকি রাতভর প্রাসাদের কোণে!

তোমাদের বাড়িটা একটুও গ্রহণ করে না আমায়,
কেবল বেগবান হরিণ সেজে বিষাদের সংগীত গায়।
আমি এলেই এই বাড়িটা শত্রুর মতো হরণ করে
শিল্পের সন্ধ্যা,
কখনোবা জয়নুলের মন্বন্তরঘেরা চিত্রের আলোকে
শহরময় যুদ্ধের পরিবেশ গড়ে,

এইসব মানুষবিরোধী ছোঁয়া তোমার কি উলঙ্গ সন্ত্রাস নয়।
কী এমন বিরূপ জ্যোৎস্না থেকে তুলে নিয়েছি প্রেম,
আমি আসলেই বাতাবিলেবুর বন দেশবিরোধী হয়,
মালতীলতা সংশ্রবে এসে ঐতিহ্য গিলে খায়,
কখনোবা ভোরের কাকলি নিষিদ্ধ কাহিনী গড়ে,
তোমাদের বাড়ি যাই, সাথে থাকে অনেক দিনের কষ্ট
গোছগাছ-করা কথার মালা এখানে এলেই লন্ডভন্ড হয়ে যায়,

যেটুকু বলার থাকে,
যেসব চাঁদের ইশারা নিয়ে দরজায় আঘাত করি,
এসে দেখি তুমি নাই,
তোমাদের সমস্ত আসবাবপত্র চটে যায় শ্রমিকের প্রতি,
বলে ফ্যালে নিঃস্বকালের গল্প, আঘাত করে—
মনে হয় আমি এক কয়েদি যাকে দেশপ্রেম শিখায় ভণ্ড শোষক।
মনে হয় বিদ্রোহী মেঘের কানে-কানে
বিরহ শোনায় সারিবদ্ধ নদী, আমি কি তোমাদের বাড়ি যাই,
না নিবিড় দুঃখের চাষাবাদ করি ক্লান্ত দেহে।
আমি কি তোমার কাছে যাই, না তুমিই আমার
মানবিক প্রেম কেড়ে নিতে আসো।

আজীবন ঘাসের মতো

এতোটা ঘাতক আমি নই যে, আমি সহজেই ভুলে যাবো
শোকাক্রান্ত দিন,
নটীর সন্তান পারে,
পারে বেজন্মা আগাছার সাপ ।

আমি তো বসন্ত-হারানো বিদগ্ধ শ্রমিকের কেউ,
দেহে বাস করে জাগ্রত কৃষাণের স্রোত,
আমাকে জড়াজড়ি করে রয়
এক ধরনের প্রতিশোধের হাতিয়ার!

আমি সেই নক্ষত্র হারানো বিরহকাতর মেঘ,
যার আদিঅন্ত গিলেছে দেশদ্রোহী কাক,
আমি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মাকে কথা দেয়া
সশস্ত্র যুবক,
আমাকে ভাঙতে হবে নিষিদ্ধ দেয়াল,
আমাকে তাড়াতে হবে পতাকা খামচেধরা পুরনো শকুন!

আমি কোনো ইতিহাসবিমুখ অযোগ্য নাগরিক নই,
যে-আমি সহজেই মন থেকে মুছে দেব রক্তেভেজা কাল ।

ক্যামেরার মতো

চোখের আড়ালে থেকেও তোমাকে ঠিক ঠিক দেখতে পাই,
যেভাবে একটি তাড়িত্ পাখি দূরান্তের মেঘ ভেদ করে
দেখে নেয় নিজের বাড়ি,
আমার প্রাচীন দু'টি চোখ,
তরল জলের মতো গড়িয়ে তোমার লুকানো ছায়ার দিকেই যায়।

অন্ধকার ফাঁক করে দেখে নেয় পাপহীন রমণীর সুখ,
যতোই দূরে দূরে থাকো,
হাজার মানুষের ভিড়েও তোমার ছায়াকে আলিঙ্গন করি আমি,
মনে হয় মাটি আর ফসলের মতো একাকার হয়ে গেছি
দুইজন আমৃত্যু প্রাণ,
মনে হয় হাতিয়ার, জ্যোৎস্নায় প্রণয়ঘেরা কোনো সাহসী নদীর
জল একাকার হয়ে গেছে।

এতো নির্ণয়ের জাল তুমি কি করে ছিঁড়ে ফেলে যাও
সুখহীন পথে।

বারবার খুঁজে নিতে হয়, বহু কষ্টে তোমাকে আত্মস্থ করতে হয়,
তুমি বিরোধী কোনো গাছ যাকে বারবার আবিষ্কার করতে হয়।

যে-পথে রেখেছো পা,
মাটির স্বপ্নকে অযথাই নিগ্রহ করেছো তুমি,
বিষপিঁপড়ের মতো খালি করেছো জোনাকি দুয়ারের খিল
যতোই দূরান্তে বাড়াবে পা, ততোই কাছাকাছি হয়ে যাবে বন্ধন,
দুটি প্রাচীন চোখ ঠিক ঠিক তোমাকে সর্বত্রই দেখে নিতে পারে।
তোমার জন্যে দু'টি পাহারাদার চোখ পৃথিবীতে আজও বেঁচে আছে।

বিয়োগান্তক গ্রাম

এতো কাছে তবু মনে হয় যোজন যোজন মাইল দূরান্তে
মিশে আছো কোনো-এক পাথুরিয়া বৃক্ষের ভিতরে,
স্পর্শের সংগীতে এতোকাল যেসব ঘরহীন পাখির প্রাণ
উদ্বাস্তু করেছে পথ,
আমি সেই প্রান্তরে বিরহের শব্দমালা গেঁথে গেঁথে
বানিয়েছি নিসর্গের পথ,
রোজ রোজ এই অবলুপ্ত পথে আমি হাঁটি ।
প্রতিদিন এই গন্ধরাজ হিমালয় ছুঁয়ে ঢুকে যাই
অনন্ত গহনে!

এতোকিছু দেখি, আত্মস্থ করি নিশি আর নির্মম শহর,
কেবল তোমাকেই দেখি না করুণ দিবসের মাঝে,
এতো পাশাপাশি থাকি বন্ধনহীন বিকেলের চরে,
বালুকাময় দ্বীপের নাভিতে দেখে আসি বিয়োগান্তক গ্রাম,
অথচ মানুষ ও জীবনের কাতারে কোনো শুভ্রতা নেই ।
মৃত্যুর প্রহরে কেটে যায় দহন ও বেদনার সময়,
এতো আপন-আপন বন্ধন, গভীর স্বপ্নের কাছে
বিলিয়ে দেয়া কাল,

তবুও দৃষ্টির অন্তরালে বহুদির্ন এক চড়াই লুকিয়ে আছে,
এইসব নীরবতা মানে পোড়া উৎসবমাখা ভোর,
এরকম দৃশ্যপট আমাকে নিয়ে যায় অন্য এক বসন্তের বিলাপে ।

নক্ষত্রের ধ্বনি

মানুষ নয় পাখিও নয়,
কারা কথা কয় ওই ইটের গাঁথুনি থেকে,
নগ্ন দেয়াল ফেটে জলের
উত্থান-পতন হয়,

নির্জন শব্দেরা কাঁদে,
শব্দ হয় শব্দ শুনি অলৌকিক বাণীর বন্দরে।
ওখানে কী এমন কলতান হয়,
নির্মল চাঁদের আলোভরা সুরে!
দুঃখের পায়রা এসে মানবীয় নিশির কাহিনী গায়,
কারা ডাকে, ছুটে আসে প্রজাপতি
ক্ষেতের ফসল,
কারা কথা কয় ওই হৃদয়-আঙিনা থেকে!

বিষণ্ণ চাতক সুখের কপাট খুলে হাসে,
রঙিন শহর কেঁপে কেঁপে কালো পোশাকে
আচ্ছাদিত হয়,
তপ্ত কৃষক লাঙল ফেলে এপারে বাঁধে ঘর,
ওখানে কে এমন শিল্পের কারিগর, ডাকলেই
জনতার ভেতরে করুণার সম্ভার নেচে ওঠে
ওরা কারা, ডাকলেই
ছেলেহারা জননীর চোখের পর্দায় জমে
বুড়িগঙ্গা নদী!

নিষিদ্ধ জলরাশি

নদীর গহ্বরে নীল শ্যাওলার মিছিল সারারাত
চুলবুলি খায়,
তলহীন তলে উন্মত্ত পোড়খাওয়া জল চেয়ে চেয়ে দ্যাখে
—সেইসব দুঃসহ কালের চিত্রকর রূপ।
সারারাত ধরে বিরহী বাউলের ডানা ক্লান্ত হয়ে পড়ে,
শিল্পীর সুযোগ্য চোখ, উলুকি-ঝুলুকি বনান্তের ছায়া,
মনে হয়,
সেইসব অবসন্ন সময়ের গান কণ্ঠে ধারণ করে আছে,
মনে হয় কোনো গ্রাম্য বধূর নোলক বেজে ওঠে যূথবদ্ধ
কৃষকের লাঙলের ফলায়,
দূর গৃহ থেকে পিতামহের ভিটা, পূর্বপুরুষের খুঁটি
চিৎকার করে ওঠে—থামাও থামাও বলে।

লজ্জাহীন, চুপচাপ বৃদ্ধ জলরাশির কোলে, এইভাবে
কালের পর কাল,
অজানা ভবিষ্যতের নাভি থেকে ক্ষয়ে যায় নিজস্ব ঘরের ফসল,
প্রতিবাদহীন—আমাদের ন্যুব্জ·তরবারি দিন কাটায়
কালো পাহাড়ে,
অথচ, ঝলঝল করে সমস্ত চোখের জল ঝরে যায়,
শ্যাওলার সুবর্ণ আত্মার বহর বিলীন হয় নটীর থাবায়।

হে নদী পুরনো দিবসের জ্বলজ্বলে পাহারাদার,
তুমি তোমার অন্তরের সব ঘাস একটু দেখেশুনে রেখো।

সময় অসময়

একদিন সব ছিলো,
হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ছিলো, ঘরে-ঘরে প্রেম ছিলো
মাঠে শস্য ছিলো, আকাশের মেঘ ছিলো, জীবনের আশা ছিলো
সমুদ্রের ঢেউ ছিলো, সুখের সংসার ছিলো
মানুষে-মানুষে, চোখে-চোখে হৃদয়ে
সঠিক প্রণয় ছিলো,
শিশুর শৈশব ছিলো—সবুজাভ বৃক্ষ ছিলো,
বন্ধুত্ব প্রখর ছিলো, নারীর মন ছিলো ।

একদিন সব ছিলো,
পাখিদের গানে-গানে নিশীথের প্রাণ ছিলো,
কবির কলমে অঘ্রানের ছোঁয়া ছিলো,
শ্রমিকের হাসি ছিলো,
সঠিক রাজ্য ছিলো, রাজা ছিলো,
বুকে সাহস ছিলো, উদাস দুপুর ছিলো
নিবিড় সমাজ ছিলো ।
ফুলে ভ্রমর ছিলো, গর্বের সকাল ছিলো ।
জলে কলতান ছিলো, মধুর বিকেল ছিলো ।

একদিন সব ছিলো, আজ আর নেই ।
প্রেমিক মানুষ নেই, জনতার বিশ্বাস নেই,
ভালো কথা নেই, কাজ নেই, আশ্বাসও নেই,
প্রভাতি কোকিল নেই, ডাক নেই, শান্তির স্পর্শ নেই!

হে বিষণ্ন পথের মেঘ

শ্রাবণের বৃষ্টিঝরা এই রাত,
তুমি দূর অট্টালিকা জুড়ে—পাহাড় ঘুমিয়ে পড়ার মতন
চুপচাপ—শান্ত নীলিমায় বেদনার চাষবাসে মগ্ন।
চুপচাপ যেন কিচ্ছুটি আমার নও,
এরকম বিচ্ছিন্ন পৃথিবী ধারণ করে আছো!
ভেতরে লালিত অহংকারের বায়ুস্তর, মর্মরে আগুন—
বিবাগী রাত্রির শব্দহীন ঘাতকেরা তোমাকে ঘিরে আছে—

অথচ তোমাকে,
দীপ্তমান সৌরভে কতোকাল দেখেছি গেয়ে যেতে
সুসময়ের সংগীত,
দিকচিহ্নহীন এক সসার ছিলো তোমার অবাধ্য চলাফেরা!
সেই জাগ্রত পুষ্পমালা আজ কোথায় আছে?

তুমি কেন আজ নিঃশব্দ সমুদ্রের ঢেউ,
বিদগ্ধ রাত্রির সংগমে—অশুভ লতাপাতার বেড়ে ওঠায়
অর্পণ করেছো প্রাণ।
বাসি খাদ্যকণার মতো কালিমামুখর করেছো
উচ্ছ্বসিত ধারাপাত,
তোমার কি মনে নেই দুঃসহ পৃথিবীর অসহ্য বিলাপ,
লাঙল ও গুণটানা জয়নুলের চিত্র,
কৃষ্ণাঙ্গ ভাইয়ের ভূমি উজাড়ের হাহাকার।
কী করে ভুলতে পারো তুমি।

এখনও কি অবিরাম নদী পার হয়ে ছুটে আসে
অনাহারী শিশুদল,
শহরের বুকভর্তি—বিষধর নিশিতে সে কি
ইজ্জত-হারানো দৃশ্য,
অবাক-বিস্ময়ে বয়ে আনে,
প্রিয় মানুষের চোখ থেকে ঝরে পড়ে ক্রোধের জোয়ার,
কাকডাকা ভোরে সারি সারি মৃত গোলাপের
হাড়, মাংস ছিটকে পড়ে অপবিত্র মাঠে,
কুকুরের পাল ছিঁড়ে খায় বোনের সংসার।

অথচ তোমার রক্তকণিকায়
প্রাত্যহিক কাজেকর্মে, সংবাদ পরিবেশনায়
দেয়ালে পোস্টারে,
সামান্যতম শোকের চিহ্ন নেই—
প্রতিবাদ নেই, ভালোবাসার শব্দের গাঁথুনি নেই।

তোমার অধঃপতনের মৃত্যু হোক—
আমাদের ক্ষোভের গভীরে তোমারও ক্ষোভ একত্রিত হোক,
তোমাকে ছুঁয়ে যাওয়া নিরন্তর পাপের ক্ষয় হোক,
ক্ষয় হোক!

কোনো-এক ফুলের জন্য

মানুষকে কতোটা বুঝেছো তুমি, কেবল শাবল হাতে ভাঙনের কালে
তরতর করে ছুটে এসেছো বিষণ্ন শস্যের জমিনে।
পৃথিবীর নাভিমূলে বারবার পতন ও বিনাশের বীজ বুনে
কি এমন সুখ পাও তুমি, তা কেউ জানে না।

তোমাকে দেখেছি এশিয়ার বুকফাটা রমণীর আঁচলের মাঝে,
দক্ষিণ আফ্রিকা, লেবানন,
প্যালেস্টাইনের দুর্বিষহ রক্তভেজা মাটির কানায় কানায়,
গৃহহীন বালকের শার্টের কলারে,
কখনো কখনো করুণ নাইজেরিয়ার তপ্ত দরজার খিলে।
কিংবা একাত্তরের সবুজ বাংলার ঘরে,
থাবায় থাবায় অনেক নিয়েছো তুমি সব জীবনের ঘাম,
এভাবে কতোটুকু যাবে বাসযোগ্য ঘর, নীলিমার শেষ প্রহর।

হে কঠোর হে ধ্বংসস্তূপ আণবিক সমাজ
তোমাকে জেনেছি,
এক স্বপ্নহরণকারী বিরহকাতর সকালের চিৎকারে।
যার অদ্ভুত নিশ্বাসে এখন সান্ত্বনার ঘুম ভেঙে যায়।
এতো সব জলঝরার শব্দ তোমাকে কি অধীর করে না
জীবনের দিকে?
জ্বলজ্বলে এই তৃতীয় বিশ্বের রুগ্ন চিত্রকর,
তার সমস্ত বায়ুতাপে লেগে থাকে অসহ্যের বান,
সুখছেঁড়া নায়কের মনে বিশুদ্ধ পথ করে যায় ঋণী,
সে শুধু বিনাশ করতে জানে,

শিশুর প্রাণ, বৃদ্ধের অসহায় কুটিরে বসিয়ে দেয় অনবদ্য বিষদাঁত,
হে মানুষ, এসো আমাদের চোখের সম্মুখ থেকে সমস্ত অস্ত্রগুদাম,
ক্ষয়ী বোমা-মারণাস্ত্রের ঘাঁটিগুলো পুড়ে ছারখার করে দিই।
যুদ্ধবাজ শাসনযন্ত্রের সবরকম কাগজপত্র বিনষ্ট করে ফেলি।
এসো এইসব মানুষ-বিরোধীদের কুশপুত্তলিকা দাহ করি,
এসো আমরা আমাদের জন্য কিছুটা সুখ খুঁজে আনি।

আরও একটি দুঃখ

সুতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে গেছে বসন্ত-উদ্যানের ঘুড়ি,
কাতর লাটাই এখন একাকী
পড়ে আছে করুণ উপত্যকায়।
চাষবাসহীন,
ক্ষতিগ্রস্ত এই নদী,
এলোমেলো মাছের মতো জল থেকে ডাঙার নাভিতে—
নগ্ন রোদ খায় আর বাঁচে।
অযথাই রাতের প্রহরে নিজেকে আবৃত করে পথে,
তার তো কোনো রঙিন শস্যের ডেরা
কিংবা বিকেলের নিগূঢ় হাঁটিহাঁটি নেই।

অযথাই লাশের মতো লিলির পিষণে
বলে যায় দুঃখজীবনের কথা।
সময়ের খামে লিখে যায়,
কঠোর নারীর ভুলকাহিনী।
আহা কী বেদনার সুর নীল-চোখ-ছোঁয়া নারী,
উদ্ভট হরণে এতোকাল
নিয়ে গেছে অনবদ্য বীজ,
এখনও বিনাশী দাঁতের ছোঁয়া ভাঙে পুরনো হৃদয়,
চোখ বুজে গেলেও দখলের চিত্র এসে
কেড়ে নেয় আমার পৃথিবী।

হৃদয় একজন মানুষের কতোটা থাকে,
তুমি বহুবার আমার লাটাই থেকে ছিনিয়ে নিয়েছো ঘুড়ি।

মুক্তিযুদ্ধে হারানো শহীদ ফারুকের মা'র প্রতি

তোমাকে কিসের সান্ত্বনা দেবো মা,
যদি বলি, আমি তোমার সেই প্রিয় সন্তান ফারুক বেঁচে আছি!
যার শরীরে বুলেটের আঘাত দেখে
বাংলাদেশ কাঁপিয়ে কেঁদেছিলে।
বেয়োনেটের থাবা দেখে নিজের বুক ভরেছিলে যন্ত্রণার কালো জোয়ারে,
ছেলের মৃতমুখ দেখে একাত্তরের বিশ্বটাকে শুনিয়েছিলে বেদনার সংগীত!

জানি এতে তোমার তকতকে ঘা আরও প্রসারিত হয়ে যাবে,
এই প্রার্থনা আমার তোমাকে সুনীল আগুন বাড়িয়ে দেবে,
তোমার কান্নার শেষ নেই মা আমি জানি—
হৃদয়জমিন ছেয়ে গেছে অমাবস্যার সুতীব্র ধোঁয়ায়—

তোমাকে কিসের সান্ত্বনা দেবো মা,
হিরন্ময় সুখ দেবার মতো সবুজাভ শক্তি আমার নেই,
তোমাকে বোঝাবার মতো শোভিত শক্তি
সে তো আমার নেই ;
আমার শুধু ইচ্ছে করে তোমাকে শিলাস্তূপের গভীরে
গেঁথে গেঁথে মৃত্যুহীন অমর করে রাখি।

ঘামঝরা চিত্র

এখনও ঘামঝরা দুপুরের বাতাস মাঠের চত্বরে এসে
আদিম মেয়ের আঁচলের মতো পিতামহের গ্রামকে মনে
করে দেয়।
লালিত সময়ে নিশি যেসব ঢেউয়ের তালে একদিন
অন্তরঙ্গ সোহাগ ঢেলে দিতো,
যে-শ্রমিক-বউ অনাহারী সন্তানের শোকে গ্রাম ছেড়ে
শহরে গিয়েছে চলে,
যে-কৃষক ভিটার প্রাণ হারিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে এখনও দুদ্দাড়
হেঁটে হেঁটে চলে,
তাদের সবুজ জীবনের জন্যে কি তোমার একটুও অনুতাপ
নেই!
ওরা কি মানুষ নয়, ওরা কি ঈশ্বরের সৌন্দর্যের প্রভাত নয়!
চিল উড়ে গেলে পড়ে থাকা ছায়া!
শ্রমজীবী মানুষের কোনো বিপরীত ছায়া নেই, নিজস্ব পথের

মাটিতে লাঙল চালাতে চালাতে,
হৃদয় রাখতে রাখতে একাকার হয়ে পড়ে নিঝুম ঘাম,
ক্লান্ত মেঘ ঝরতে ঝরতে নির্বিকার ঋণী হয়ে যায় পৃথিবীর বুক,
নিরীহ পাখিদের ডানার মতো শ্রমিকের কোনো ডানা নেই,
কারখানার ডানায় ভর করে বয়ে চলে চিরকষ্টের বান,
ওরা একরকম যন্ত্রমানব—যাদের অবসাদ নেই,
হাহাকার নেই,

তুমি এগিয়ে দাও হাত,
পৃথিবীতে অন্নের সন্ধান দাও, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার
পথটুকু দাও,
ঝরে যেতে দাও প্রণয়ের বায়ু,
না হয় অনেক বেশি জর্জরিত হয়ে যাবে মানবিক ঋণের বোঝায়।

স্বপ্নহীন হয়ে যাবে রাত্রিদিনের সমস্ত উৎসব,
এখনও চোখের কোনায় খ্যালে সম্ভাব্য জীবন,
তুমি হৃদয়-নৌকার হাল ধরে এগিয়ে যাও—
কেবল একবার পৃথিবীতে অনিন্দ্য বাঁশির সুরে জাগাও মানুষ।

তোমার চিঠিগুলো

তোমার চিঠিগুলো যেন অল্প বয়সের শিশু, সারাটা দিন
অবুঝ বৃষ্টির মতো চোখের জল ফেলে ভিজিয়ে দেয়
আমার বেডের তলা, বইয়ের পাতা আর
বাক্সের নিস্তেজ কোনা ।
যেন বন্দি কয়েদি, কতোকাল মুক্তির আশায় আশায়
বাঁচার নামতা পড়ে!
ওদের ভেতরে সুখ নেই, ওরা একটুও স্বস্তির ভেতরে নেই,
তুমি ওদের মুক্তি প্রার্থনা করো,
না হয় অভিশাপ দাও যেন জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় ।

অনেক দিন হলো তোমার অযোগ্য চিঠিরা
আমার সমস্ত কাজে-কর্মে, ঘুমে, ঘরে-বাইরে,
সবকিছুতেই কেমন যেন ঘাতকের ছায়া ফেলে যায় ।
তুমি ওদের উপযুক্ত জায়গা করে দাও
আমি যেন শান্তি পাই ।
আমার বাঁচার জন্যে তুমি এইসব মাছি, মৃত্যুর ট্যাবলেট
মৃত বলে ঘোষণা করতে পারো,
কিংবা তোমার সন্তানদের, তোমার বুকেই ঠাঁই দাও,
আমি মুক্ত হতে চাই ।

আমি বাঁচতে চাই, আমাকে তোমার বদ্ধ মুঠি থেকে এখনই
মুক্ত করে দাও! মুক্ত করে দাও! মুক্ত করে দাও!

এখনও সেই মেঘ

তোমাকে রোজ রোজ আবিষ্কার করি ঘন অন্ধকার থেকে,
রোজ রোজ তুমি ডুবে যাও বিষাদিত চিমনির ধোঁয়ায়।
যেখানে সবুজ গ্রামে মানবিক দোতারায় পিষণ চলে,
বদরের পাশবিক দাঁতে ছিঁড়ে ফ্যালে বিশুদ্ধ তোমাকে,
এর মধ্য থেকেই তোমাকে বহু কষ্টে উদ্ধার করতে হয়,
ওই শ্মশানে পৃষ্ঠতা থেকেই তোমাকে আপন করতে হয়।

এই যে নরকের উৎপাত, সুতোয় টানাটানি,
শ্মশান পীড়িত বাড়ি জড়াজড়ি করে রয়,
ঘাম-ঝরা কালেও খেটে যাওয়া কৃষকের মতো
প্রণয়ের সাঁকো থাকে!
যেখানে শিল্পের নারীরা প্রতিদিন পাপবিদ্ধ হয়,
অশুভ ছায়া প্রচ্ছায়ার তলে মুখ থুবড়ে থাকে উদ্ধত গান,
সেখানে কীভাবে তোমার রাতগুলো কাটে!

যোদ্ধার মতো দুর্গম পথ পেরিয়ে তোমার কাছে যেতে হয়,
পাহারাদারের মতো দীর্ঘকাল অপেক্ষায় থেকে দেখতে হয় মুখ,
এত যে দহনের খেলা তবুও বুঝলে না—
কেনো-একজন কবি খরতাপ নিয়ে কালের পর কাল
অপেক্ষায় থাকে!

রোগশয্যায় কবিবন্ধুর মুখ দেখে

মৃত্যুর চেয়েও কঠিন থাবায় তুমি ধরা পড়ে গেছ।
সমুদ্রতৃষ্ণার মতো এক ক্ষয়ী জল্লাদ শিয়রে বসে আছে,
আমি শূন্য কারিগর, পকেটে শোকের বার্তাবহ নোটবই,
দিকচিহ্নহীন পাষাণ শ্রমিক, ভালোবাসি তাই প্রত্যহ
এখানে আসি—
তোমাকে দেখার জন্যে। তোমাকে দেখতে এসে আমি এক
বন্দি সৈনিকের চোখে জল, শিশুর কান্নার মতো এক পরিবেশ
জালে আটকানো খুব স্বদেশপ্রেমী যোদ্ধার হাহাকার শুনলাম।

এই প্রথম একজন কবির দু'চোখে দেখলাম মায়াময় দৃশ্য,
দেখলাম বিকেলের মেডিক্যাল ভবন অন্ধ পাহাড়ের মতো,
চিৎকার করছে রাজধানীর বুকে!

তুমি শুয়ে আছো। বুকে শাদা কাপড়, বেদনার অক্সিজেন
পাইপ নাকের পথ দিয়ে
জীবনের বসন্ত রেখেছে ধরে।
আমি এতো অকর্ম বাকী বিল্লাহ্, এমন শক্তি আমার নেই
যা নিয়ে জল্লাদের সাথে যুদ্ধ করি।
এমন কোনো হাতিয়ার নেই যার সচল প্রবাহে বিদ্ধ করতে পারি
তোমার ঘাতক

তোমার চোখ থেকে ভাদ্রের শিশিরমাখা কণা,
বিগত সময়ের সুবিন্যস্ত পথ-ঘাট বন্ধু-স্বজন
পৃথিবীর যাবতীয় বন, গ্লানি, উপত্যকা, কৈশোর-যৌবন
এমনকি পিতা আবদুস সামাদের প্রাণপণ শ্রম,
পাহাড় ভাঙার মতো কোনো শব্দের ভিতরে—
প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে বিলাপ এনে দেয়,

আমি দেখলাম,
ক্লান্ত দুপুরে যেভাবে কাঁদতে কাঁদতে বাউলপ্রাণ গৃহের
আস্তানা চায়,
তোমার মুখ থেকে যেরকম নদীস্রোত—দুনম্বর বেডের কাঁধে ভর
করে আছে!
গোলাপের প্রার্থনা যেন তোমার এই দৃষ্টিকাতর প্রহর।

কেবল উদ্ধার, কেবল বাঁচার স্বপ্ন, কেবল স্বস্তির বাক্যালাপ,
মানুষের কাছে তোমার এসব প্রার্থনাই ছিলো,
ছিলো প্রিয়জন, তারা আজ নেই, আছে অন্ধকার।
ব্যর্থ সিলিং ফ্যান, স্বস্তির মানব তাহারা নেই।
আমি পাষাণ, তাই পাথরের মতো নির্বাক তোমার
ইশারার দৃশ্যপটে,
অসহ্যের দিনে—তিন নম্বর কেবিনে দেখে যাই
ছিন্নভিন্ন বানবিদ্ধ মুখ।

জানি আমাকে ক্ষমা করার মতো উর্বর হাত তোমার নেই,
তবুও এসেছি, উড়ো-উড়ো পাখির তাপদগ্ধ অরণ্যে
কতোটা দিয়েছি বলো!
এই হাসপাতাল, আট নম্বর ওয়ার্ড জানে,
জানে মিসেস সামাদ, গোলাম মোস্তফা,
আরও জেনেছে যোগ্য চিকিৎসক বিদেশী যুবক!
এরা সবাই তোমার মৃত্যুর ভাগ নিতে এসেছে।
আর আমি এসেছি শূন্যতার গভীর পথে,

রোগশয্যা তোমার একার নয়,
এই আত্মত্যাগী কাল, হাহাকারময় ভূমি—
আমাকেও নিরন্ন করেছে—তারকালোক ছেয়ে,
কেননা একজন কবির বিরহ সকল কবির হৃদয়েই
নির্মমের বাতাস বয়—নেমে আসে গ্লানি, করুণ জোয়ার।

বিষবৃক্ষ

সূর্যাস্তের মতো তোমার গহিন গাঙে কতোবার ডুবলাম,
কতোবার কঠিন দরজা দিয়ে বের হয়ে এলাম দুঃখের গ্রামে,
কোথায়! একবারও তো মানবীলতা, শস্যভরা মাঠ
মানুষের দুর্দিন ঘুচে যাওয়ার সেই অমৃত কালের গান,
তার সন্ধানটুকু পাইনি কোনো চোখে!
এতো ঘুরেফিরে দেখা, হাঁটাহাঁটি,
জীবন ক্ষয় করে পেছনে ছুটোছুটি পথহারা কবি!
তাকে কখন শোনাবে হাহাকারহীন অপেক্ষার বিনষ্ট বাঁশি!

তোমার কাছে চেয়েছিলাম এক সবুজ বৃক্ষের প্রেমীয় উদ্যান,
কাতর বাউল, এতো বিলাপ এতো মাখামাখির বান
একদিনও তো তাপিত বুকের ভেতরে জমে ওঠেনি বৈরী সুখ ।
এতো যাওয়া-আসা রঙিন বসন্তের গোলাপ ছুড়ে ফেলে
তোমাকে ডাকাডাকি,

যেন বৃথাই ফুটে আছো চাষবাসহীন, বিশেষ থলে-হাতে ফুল ।

অভিমানী সূর্য

কবি হেলাল হাফিজকে

তুমিই দিয়েছো পৃথিবীতে
প্রণয়-উদ্যান, রক্তাক্ত জীবন
বিয়োগান্তক সিঁড়িতে স্বর্ণালি ঘাম,

প্রেম তো কতোজনেই করে,
দুই-একজন সুখী হয়, অন্যেরা সকলই ঝরে
কেন অভিমানী বাউল
আজও ঘুড়ির আশায়
লাটাই রেখেছো ধরে?
বুঝলে না কেন, এখনও তোমার পথে পথে
কঠোর মিসট্রেস ঝরিয়ে দিচ্ছে ঘাম।

তুমিই রেখেছো পৃথিবীতে
বাইশটি বসন্ত
যার মৃত্যুর ভয় নেই,
অন্তর দিয়েছো
দিয়েছো পুস্প, রাশি রাশি বুক,
চোখের জল—যৌবনের কিশোরগঞ্জ,
বোঝেনি সবিতা, বুঝিয়াছে কবিতার খাতা,
হেলাল হাফিজ এই এক ঝরনা, শোভিত অবাক নাম।

কেন ক্ষয়ে-ক্ষয়ে প্রেসক্লাব, ঢাকার রাজপথ,
তাসের আড্ডা, কাঁধের ঝুলিটাকে কাঁদাও।
তোমার কি ঘরের প্রয়োজন নেই, কেন নেই?
হে কবি, কেউ হয়তো ডাকছে, যাও—একবার গৃহের দিকে যাও!

ফিলিস্তিন : একজন গৃহহীন জনতার ভাষা

কে বলে ছেড়েছি ঘর,
আমার ঘর আমার ভেতরেই জেগে আছে, এ-ঘর আমায়
কেবলই নিয়ে যায় যুদ্ধের মাঠে
আমাকে উদ্বুদ্ধ করে ।
যেন আমি মাতৃভূমির পতাকা-হাতে ফিলিস্তিনি গান গাই ।
যে-হাতে নিয়েছি হাতিয়ার
সে-হাত আমায় প্রতিবাদী করে তোলে,
প্রিয় মুখ ; আপেল-উদ্যানের সরস গুঞ্জন উপহার দেয়,
সে আমাকে পারে না ফিরিয়ে দিতে
স্বাধীনতার অমল আশা থেকে ।
আমাদের অন্তরে পড়ে আছে আমাদের ভ্রাম্যমাণ ঘর
বৈরুতের বারান্দা আর বীরাঙ্গনা যুবতীর ঠোঁটের কিনারে বাহুতে,
কাতরবিদ্ধ উঠোনে, অমৃত জননীর রক্তাক্ত কাপড়
কামানের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ।

আমাদের পর্যটক গৃহ বিরহের প্রভাত বমি করে,
যেখানে নির্যাতন নামে খাদ্য চুষে বেঁচে আছে অসহায় লেবানন,
ওখানে বুলেটের মেঘে মেঘে কেটে যায় ভীতসন্ত্রস্ত প্রহর,
ওখানে অশ্রুর ভেতরে শুয়ে আছে লাবণ্য কালের বায়ু!

কে বলে ছেড়েছি ঘর!
আমাদের ভেতরে ভেতরে বসত করে এক তৃতীয় বিশ্বের ঘর ।
তার ডানায় ডানায় অমীয় প্যালেস্টাইন তারও রয়েছে মাটির উপাখ্যান!

জীবন্ত স্বপ্নের কাছাকাছি

অরণ্যের দিকে তাকালে চোখ দুটি অরণ্য হয়ে যায়,
বিশাল আকাশ দেখে বৃক্ষের মধুরতায় নিজের প্রতিচ্ছবি।
গভীর রোদের মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রাখে
পৃথিবীর সব পাখি।

হিসেবের খাতা আর প্রেয়সীর যুগল ঠোঁটের রসিকতা,
বিষণ্ন রাতের বিরতিশূন্য ভালোবাসা শুকিয়ে মরে,
অলৌকিক মানসে, শব্দহীন প্রণয়ের প্রপাতে।

জীবন্ত বৃক্ষের ভালোবাসায় আর সজীবতা নেই,
নৈঃশব্দের ফানুসে সবই দূষিত বায়ুর দলে ভিড়ে,
সে এক প্রাচীন সভ্যতার মতো ইতিহাস,
মাছেদের চোখের মতোই জ্বলজ্বলে
জীবন্ত স্বপ্নের কাছাকাছি।

অদ্ভুত হাত

অন্ধ দরজায় টোকা মেরে প্রতিরাতে ছুটে আসে
জল্লাদ মানবী,
কিসের লালসা চোখে-মুখে ধারণ করো তুমি, আমি তা
বুঝতে গিয়ে ফিরে আসি শূন্য ফলাফল পকেটে ভরে,
ভয় পাই! কেঁপে কেঁপে উঠি
চিৎকার করি, দূর হও দূর হও বলে বন্ধ করে দিই
মৃত্যুর কপাট ।

তুমি সেই নিবেদন মুছে ফেলে, ঘরময় ভরে তোলো তপ্ত বিষ
উলঙ্গ জ্যোৎস্না এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে—
শেষ করে যায় ঘুমের সাগর ।
যেন শ্রমিকের সস্তা প্রাণ, সয়ে যাই চাকার পিষণ,
পারিশ্রমিকহীন খেটে-যাওয়া,
অনাহারী গাছ, জল-রসহীন বেড়ে চলা দহনের দিকে ।

না না করি,
দুই হাত উঁচিয়ে প্রার্থনার ঢাল রঙিন করছি গ্রাম,
এই গ্রাম এই রাত তোমার পীড়নে মলিন হতে থাকে
এতোটা উজাড় হয় প্রাণ,
তোমার কি মায়াদয়া নেই! তুমি কি পারো না
আণবিক থাবা, বোমার আঘাত স্তব্ধ করে
মুক্তির দুয়ারে ফিরে যেতে ।
এইভাবে আর নিথর কোরো না নীরব শহর তুমি,
মানবিক দোতারায় একবার শুধু একবার স্বচ্ছ তৃণলাতা দাও!

আমারও বহন করতে হয়

নীল জল পেরিয়ে গভীর হৃদয়ের চত্বরে কতোবার
হেঁটে এসেছি নিজস্ব নিয়মে। কোথাও মানবিক গান,
পৃথিবী মুগ্ধ করে দেয় ফুটন্ত ভোরের শালিক এমন
কিছুই দেখা হলো না।
আমার কিছুই হয়নি দেখা, যা-কিছু ধারণ করি অপূর্ণ শরীরে
চৈতন্যঘেরা কোনো কোনো স্মৃতির নিশ্বাস,
বৃষ্টির শব্দের মতো অনায়েসে ফেলে যাই ফুটপাতে
নিরীহ শিল্পীর সাধ,

কিছুই করা হলো না আজও, শুধু নকল সংগমে কালের পর কাল
পার করে দিচ্ছি সময়,
ডালভাতহীন কৃষকীরূপের পিষণের চলন যেনো,
ভুল পথের আঙিনায় টেনে নিয়ে যায় কিশোর বালকের মতো,
কখনো ভাঙে, কখনো গড়ে
এই রূপবদলের আদালতে আসলে আমি একটুও ভালো নেই।

তবুও তোমাদের অন্তরে প্রতিদিন খুঁজে আসি
কিছু-কিছু জীবন, আসলে জীবন এই দুষ্প্রাপ্য কথাটি আজ বড়
পলাতক হয়ে গেছে,
মানুষের প্রাণ থেকে উধাও হয়ে গেছে অমরত্বের বাণী,
এর পরও তোমাদের কাছে যেতে হয়,
কারণ, পৃথিবীতে মানুষ খুব কষ্ট বয়ে চলেছে।

আমারও বহন করতে হয় জ্বলজ্বলে গ্রামের হাহাকার,
আমারও সয়ে যেতে হয় ঘোলা-কাদামাটির সবটুকু দহন।

গান এবং আমার সেই বন্ধুটি

তুমি কেন সমুদ্রের বিপরীতে গান ধরতে গেলে,
মধ্যরাতে বিবাগী যোদ্ধার মতো একা একা কষ্টের স্লোগান
দিতে গেলে,
ভাঙা সেতুর দৃশ্য নিয়ে যে তুমি নীরবে শহর হেঁটে চলো,
বেদনার রংগুলো ঝোলায় বিদ্ধ করে তুমি কেন ত্রস্ত দেহে
সমুদ্র শাসাতে গেলে।
তোমার কি মনে নেই বিপর্যস্ত গ্রামের কথা,
শূন্য চেয়ারের করুণাঘেরা জীবন হারানোর কথা,
নিশিদিন আমারও তো গৃহহীন বিড়ম্বনা ছিল,
প্রাণহীন চরের গুহার কাতরতা ছিল,
এইসব ঝড়ের জোয়ার এখন আমাকে ঠেকাতে পারে না,
ফসল পারে না কেড়ে নিতে দেশদ্রোহী বক।
তুমি অবোধ শ্রমিকের দুঃখের মতো কেন
কারখানার চাকায় দিতে গেলে প্রাণ।

তোমার হাত থেকে ঝরে পড়ছে লাল-নীল জীবন,
এখন কেউ তোমাকে উদ্ধারের কথা বলছে না,
বৃক্ষের ডালপালার মতো মরা উৎসবে রেখেছো পা,
কেন এইসব আগুনের অন্তরে প্রণয় দিয়েছো ঢেলে।
তোমার তো উজ্জ্বল মাছরাঙার মতো গান করার
কথা ছিলো,
কেন বিবাগী যোদ্ধার মতো সতেজ আঙিনা ফেলে—
প্রেমীয় হাতিয়ার মরীচিকায় রেখে
একা একা বিপরীত গান ধরতে গেলে,
সমুদ্রের বিরুদ্ধে হাহাকার করতে গেলে।

মাতৃভূমির মুখ

আমি সেই অবাক রাজ্যের নাগরিক,
যেখানে পথে বের হবার আগে
জীবন ছেড়ে দিতে হয় মৃত্যুর কাছে!
ভেতরে ভয় ভয় রোগ, ঘরে না ফেরার সন্তাপ থাকে!
কখন কি যেন হয়ে যাই—ঠিকঠাক নাই—
এ রকম মরণ-শিকল পরে
আমাকে দেখতে হয় মাতৃভূমির মুখ

আটই ফাল্গুন

সেই যে এক ভোরে কাকের ডাক শুনে বাহির হয়েছি পথে,
আজও তো সেখানেই আছি। মানুষ আসে মানুষ যায়,
কেউ-কেউ পুথির অক্ষরে কালো ছাপ দেখে
ঝরায় চোখের জল,
নগ্নপায় হেঁটে হেঁটে ক্লান্তিময় আঙিনায় রেখে যায় পুষ্পদল।
পৃথিবী এতোই কঠোরতা জানে—
অসহায় মায়ের কান্না শুনেও তার সহানুভূতির হাত, কিংবা
বন্দি দশা থেকে একটিও তুলে নেয়নি ফুল!
কেবল নিরন্ন চিত্রের বিস্ময়ে ছুটতে থাকে কাল
অশুভ সংগমের ভারে নুয়ে পড়ে শহীদমিনার,
পত্রিকার পাতায় যন্ত্রণার নামে রফিকের-সালামের
বেদনা মুখরিত হয়,
তবুও মাতৃভাষার স্বর্ণকাল এলো না!

সেই যে এক পাপবিদ্ধ সমুদ্রে বন্দি হয়েছি আমি,
আজও তো সেখানেই আছি—আহত সকালের মতো
আজন্ম সকাল!

গাছের দুঃখ

আমি কি গাছ না মাটির পুতুল,
মনে হয় কোনো-এক
আদিম পাহাড়ের বুকে
তোমরা যখন যা ইচ্ছে—তা-ই করছো।
এতোসব খোঁড়াখুঁড়ি কতো আর সহ্য করা যায়!

গাছ সেও তো কিছুকিছু সুখের স্পর্শ চায়,
হৃদয়ের আঙিনায় ভরে তুলতে চায়,
সৌরভের কথামালা,
আমি এ কোন সমুদ্রে রেখেছি পা,
যেখানে করাতকল—দুদ্দার কেটে যায়
শ্রমিকের প্রাণ,
কেবল বিষদাঁত, ছিঁড়ে খায়,
সাধারণ জীবন-যাপন!
আমি এ কোন সভ্যতা নিয়ে বেঁচে আছি!

সেইসব তুলি

কোথায় নীল পদ্ম—সূর্যস্নাত ভাটিয়ালি সুর,
ভীত খরগোশের ডানায় রক্তপুঁজ-গন্ধময় লোবানে
আমাদের দিনকাল কাটে ।

মানুষের স্বর্ণময় অন্তর,
চিতার দহনে-বেদনায়-ছাওয়া কণ্ঠস্বরে
কেবলই গিয়েছে ক্ষয়ে,
এমন তো কথা ছিলো না,
বলেছিলে মূঢ় নয়, অভিশাপ নয়, কেবল শিশুপ্রাণ ।
হৈমন্তী বিকেল হবে ।

লালিত শহর হবে,
আশা-আলো-আশা ভালোবাসা শূন্য নয়,
কথা ছিলো, প্রয়োজনে দেবদারু হবে,
সমুদ্র-স্বাচ্ছন্দ্য হবে, মুক্তির ঠিকানা হবে!
পাষাণের দেয়াল চিরে অনন্ত বসন্ত হবে!

কোথায় সেই বিশ্বাসের আজন্ম কালের বাউল,
তাঁরা আজ কোথায় থাকেন,
কোথায় সেইসব বিদগ্ধ শিল্পীর তুলি!

কয়েদি-ভাষণ

তুমি চলে গেলে আমার আর কীইবা থাকে,
দীনতার স্তূপ ছুঁয়ে পড়ে থাকি নষ্ট আঙিনায়,
অসম্ভব কালো ছায়া রাজপথে এসে অন্তরজ্বালা হয়,
বেসুরো সকাল চুরি করে নেয় রাখালের হাসিমুখ,
আর আমাকে দেখতে হয়
হিরোশিমার ছায়াপাত
প্রগাঢ় ঝড়ের ক্ষয়-রক্তপাত!

তুমি চলে গেলে আমার ঘরময় ছেয়ে যায়
দূষিত শহর বায়ু,
পোড়া ফুল—অসহ্যের কীট নিয়ে চলে যায় রাত,
শামুকের মতো অযথাই মুখ থুবড়ে পড়ে রই—
যেন আমি এক কয়েদীপ্রাণ
যার দেহের ভিতরে কেবলই চলবে কঠোর করাত!

আমাকে বাঁচতে দাও।
আমাকে জড়িয়ে দাও কুসুমিত স্বর্গের চাদর,
আমি মানবিক উদ্যান চাই,
প্রকৃত জীবন-জোয়ার—যুদ্ধহীন পৃথিবী চাই।
আমাকে কারাগারহীন সভ্যতা ফিরিয়ে দাও।

পূর্ব দাশরায় সেই দগ্ধ সেতার

আড়ালে রয়েছে পড়ে বেদনার্ত এক বৃক্ষের দেহ,
হাতে তার নিধির বাগানের উচ্চাঙ্গ ফুল,
মাটির দেয়ালে পিঠ,
ঘন সবুজের আস্তানায় দীর্ঘকাল শুয়ে আছে
অন্তরঙ্গ বাউল।

সবই রয়েছে তাঁর
পৃথিবীজোড়া কারিগরি হাত,
যুদ্ধের উপযোগী দুপা,
সে এখন আদিম সেতারে প্রত্যহ গড়ে যায়
বুকচাপা মুখর সংগীত,
মধ্যরাতে মানুষটাকে কে যেন বলে যায়
হাসন রাজার সুর,
কেউ-কেউ পাথরের অন্তরে ভরে তোলে কালো ধোঁয়া,
সে একটুও কেঁপে ওঠে না, বটবৃক্ষের ন্যায় আসামির
কাঠগড়ায় বুঝে নেয়
যতোসব কষ্টের পঞ্জিকা।
কে যেন বারবার নতুন ছুরিতে কেটে যায় চাঁদের শরীর,
সে এখনও অবিচল সুপুরিবাগানের শ্রমিক,
পূর্ব দাশরায় নির্জন বাঁশবাগানে, নারকেল আঙিনায়—
দুঃখের অস্তিত্বে চিবায় ঐতিহ্যের গ্রাম!
ওস্তাদ মোত্তালিব, আহা শান্তির কপাট,
কেন এসেছিলে মানিকগঞ্জের নীল-গামছা-পড়া সন্ধ্যায়
কেনো উর্বর হৃদয় আবিষ্ট করেছিলে সেতারে!

রবি ঠাকুরের ঝাঁকড়া চুল নয়,
আছে নির্মল কথার মালা-আঙুলের জাদুভরা যুগ,
সরোদের দরদি লহরি,
আছে উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ পদভার—তার ঘষাঘষি,
কখনো রঙিন জলসায় যেতে যেতে বলে ওঠেন,
সারে গা-রেগামা, মাগারে।

কেন—শুধু আমারই বন্দরে রাত আসে গভীর ক্রন্দনে,
বলেন, আহা মায়াময় সংগীতের ভুবন
তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে!

এইভাবে ত্রস্ত সাগরে পড়ে থাকে তার
নীলপদ্ম ছেলেবেলা!

ওস্তাদ মোত্তালিব, আহা কী রুটির জীবন দেখতে এলে,
তোমার তো বিস্তৃত হবার কথা ছিলো,
কথা ছিলো মিছিলের পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা,
তোমার আঙুলের কি ক্লান্তি নেই,
এখনও কি দুঃসাহসী সরোদের বিপ্লব
পর্যটক হয়ে যায়,

তুমি চেয়েছিলে এক উর্বরে সকাল,
সেই স্বর্ণের চাঁদ আজ কোথায়! তুমি আর কতটুকু যাবে!

২৯শে নভেম্বর ১৯৭১

আমি যদি আবার কথা বলি, আমার মুখ যদি আবার খুলে যায়—
তা হলে, একাত্তরের রক্তবন্যার কথা বলে দেবো।
বুকের মাঝে লালিত কষ্টগুলোর সুমহান পরিবেশ ঝরাবো!
যদি আবার কিশোরীর স্তন ছিঁড়তে দেখি,
বুড়িগঙ্গার ঢেউয়ে লাশের মিছিল ভাসতে দেখি,
তা হলে, একশো চল্লিশটি তাজা প্রাণের চাপ চাপ রক্তের
প্রতিশোধ নিতে—আবারও যুদ্ধে যাবো।

গত যুদ্ধের তাতানো ইতিহাস আমার জ্বলজ্বলে মনে আছে,
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল ঘিরে অশুভ ক্ষয়িত ধ্বংসের স্মৃতি
আমার হৃদয় ভরে জমা আছে।
আমার ভুলে যাবার কথা নয়। কোন সৌধ মিনারের দিকে তাকাবো!
এতো ফুল এতো নাম আমার সাহসে আমার ভালোবাসায় পাথর গেড়ে
আছে।
ধলেশ্বরীর স্রোতে, প্রতিটি জলের ফোঁটায় ফোঁটায় এসব অমৃত কুসুম
প্রভাত
প্রেমের সুবাস ঢেলে যায়—
তোমার আমার জন্যে আগামী দিনের কোমল বেলা, বাতাবিলেবুর
তন্দ্রা ফেলে যায়!

আমি সেই দৃশ্য মমতার কাছে মায়ের দুধের মতো ঋণী হয়ে আছি,
আমি সেই নভেম্বরের কাছে আমরণ মাথা নুয়ে থাকি।
আমি সেই আপনহারা সময়ের কাছে শঙ্কিত হতে থাকি।

শুয়োরের বাচ্চাদের টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে করে মনিরের কথা মনে হলে,
পায়ের তলায় ঘাতক কবর খুঁড়তে সাধ জাগে শাহ্ আলম, শহিদের
কথা মনে হলে,
অহিদের কথা মনে হলে আমার আটষট্টি ইঞ্চি শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে,
আমি যদি আবার প্রতিবাদমুখর হয়ে যাই, তা হলে
দুহাতের কবজি জুড়ে পোড়ামাটির ধূলি জড়াবো,

পকেটভর্তি হারানো মানুষের ছবি নিয়ে এগোতে থাকবো
যোজনকাল, আগামী বিশ্ব জুড়ে!

আমি যদি আবার কথা বলি,
আমার মুখ যদি আবার খুলে যায়, তা হলে
এক এক করে সকল সর্বনাশা ইতিহাস বর্ণনা করে যাবো,
সব মায়ের মুখে সূর্যের রশ্মির মতো আলোকমালা ফোটাবো।

অমর সাক্ষী

জানে বুড়িগঙ্গা সব জানে,
ইতরের গল্প, পাপীর ঠিকানা—সুবিধাবাদীর সংগীত,
কার কতো দৌড়—মানুষবিরোধী কাহিনী আছে,
আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদী,
বুড়ো বাউলটা সবকিছু জানে।

মানুষ ভুলে যায়, আমি ভুলে যাই, তুমিও ভুলের সমুদ্রে
পা দুটো বাড়াও,
সে ভোলে না,
অপরূপ গঙ্গা জ্ঞানী নদী,
তার ভুল-টুল নেই, যা-কিছু দেখে গেঁথে নেয় বুকের ঘরে,
সাক্ষীর মতো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক বলে যায়
ইতিহাস, শুদ্ধতম কাল।

কে কতোটুকু সরস আপেল,
কে কতোটুকু দহন অরণ্যে লাফিয়ে পড়ে,
রক্তাক্ত কালের কথা, সবই সে জানে,
জানে নারীহরণের পাপ, কার হাত কতোটা
অশুভ বৃক্ষ সাজতে থাকে,
বায়ান্ন, পঁয়ষট্টি, উনসত্তর, একাত্তরের ক্ষয়ের পুঁথি—
এইসব রঙিন গাথা সুর সবই জানে,
জানে আমাদের বুড়ো বাউল বুড়িগঙ্গা, সবকিছু জানে।

বাড়িটি

মরুবালুকার মতো একাকী পড়ে আছে অদ্ভুত আঙিনা
ব্যাথার চাদর গায়, ওই শোকগাথা বাড়ি বড়ো দুঃসহ
                    চাঁদের জীবনহারা যন্ত্রণায়
গড়ে যায় পাথুরে সমাজ ।
একদিন এই নিস্তেজ অদম্য মিনার বলেছিলো
                    সুরভিলতার কথা,
        বলেছিলো সুন্দর জীবন-যাপন
        বলেছিলো সকলের অধিকার চাই!

আজ তার সেই সুর ম্লান, স্বাদহীন-নুরি প্রস্তরময়
দামহীন উপত্যকা ।
গন্ধহীন, বাতিল ইঁটের ঘর, আজ তার শূন্য হাত,
যতোই ডাকবে এক দূরান্তের বাতি, জ্বলবে না ।
                হয়তোবা ব্যর্থ শিল্পের প্রাণ ।

এখন তার বুকে কেবলই নিশ্চিহ্ন ঢেউয়ের অহংকার,
যার সাথে মিশে আছে মায়া দস্যুরাজ—
                    অযোগ্য মানব,

হয়তো সে পৃথিবীকে কিছু-একটা দেবে,
হয়তোবা মানবিক উদ্যানে রেখে যাবে ঘৃণ্য পথ ।

জীবনের জন্যে

জীবনের খোঁজে সারাটা জীবন ঘুরে বেড়ালাম,
মানুষেরা খুব ছলাকলা জানে, ঘৃণা বোঝে ভালো ।
যার কাছে যাই সে-ই পালায়, শাদাকে করে কালো,
একথা ঠিক, জীবনের আশায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে জীবন হারালাম!

সবাই বলেছিলো অপেক্ষায় থেকো সবকিছুই দেবো,
তাই তো আছি চাতকের মতো তাকে পাবো বলে!
মরণের পথে ফেলে রেখে আমায়, সবাই গেছে চলে,
কতোকাল আর এইভাবে থাকা, অবশেষে আমি শূন্যই
থেকে যাবো!

সুরভিত মেঘমালা

যে-পথে আমার ভাই সালামের স্মৃতি জেগে আছে,
তার প্রতিটি বালুর কণা এক-একটি রক্তভেজা বাগান,
প্রতিটি ঘাসের সাথে প্রকৃতির ছোঁয়া,
পদেপদে জীবন, সূর্যের আলোর মতো হাসে প্রেম,
এখানে দোয়েল এসে নিশ্বাস ফ্যালে শান্তি শান্তি বলে।
ভাটিয়ালি গায় মাঝির দোতারা,
এই পথে গাড়িয়াল আসে,
জ্যোৎস্নার চুমুকে পবিত্র হয় মাটি,
উলঙ্গ শিশুর দল উল্লাসে-আমোদে হাঁটাহাঁটি করে,
ওরা কিসের সন্ধানে হাঁটে?
বস্ত্রহীন বুড়ো, খালিথালা-হাতে লুটোপুটি খায় স্বাধীন ভূমিতে

প্রতিবার আশা-নিরাশার ফেব্রুয়ারি আসে,
বিশ্বাসের চোখে জমে বেদনার মেঘ,
হামাগুড়ির শহর এই কালান্তর স্বপ্নের বাঁশি,
সুরহীন আসা-যাওয়ার এই রোগাক্রান্ত সময়,
এ-পথের ইতিহাস যেন সুবিন্যাস্ত হাতিয়ার,
যেন প্রতি দিবসের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসা।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হত্যার সংবাদ শোনার পর

মানুষের কাছে তুমি এক বিপরীত মানুষ এসেছিলে,
প্রণয়ের সুখে যে-হাত তোমার অসুরের বিষদাঁত ভেঙে দিতো
আজ আবার সেই অনন্য কথা, মানবিক স্পর্শের মর্মরে
কালান্তর দৃশ্য—
সমস্ত কিছুর মাঝে
            নতুন সূর্যের মতো আলো নিয়ে আসে।
তুমি তো মানুষ নও!

যেন ঈশ্বরের প্রদত্ত কোনো উর্বর নৌকোবোঝাই মেঘ,
মনে হয় দেবতা—তুমি তো কারো একার নও
সমগ্র পৃথিবীর বুকে এক কোমল চাঁদ
                        সুবিন্যস্ত পথ।
তোমার বিনাশ হওয়া নেই ; কিংবা
স্থির কোনো নদীর ঢেউ নও, নও অলৌকিক প্রেম।

মানুষের মাঝে তুমি এক সমুদ্র-জীবন এসেছিলে
শান্তির বৃক্ষের মতো ফলভারানত স্বস্তি এসেছিলে
মহান সৈনিক যেন
            নিরপেক্ষ চিমনির ধোঁয়া
            কারখানার শ্রমিকের হৃদয়,
সভ্যতার আদিগন্ত মাঠে, এই চিরউজ্জ্বল ফোয়ারা
তোমার কি মৃত্যু হয়, হয় না—
যেমন দেশের নাম, পতাকার মৃত্যু নেই।

আবার সন্ত্রাস-২

হৃদয়ে টোকা মারে বিষাক্ত হাত,
মনে হয় লিলি
কাঠের পুতুল এসে দেশপ্রেম শেখায়, নিশিতে
কপাট ভেঙে চুরি করে নেয় ক্ষেতমজুরের ভাত!
কখনো রোদের চোখে ফাঁকি দিয়ে
সাম্প্রতিক দুঃখ বাড়ায়—ঘন অন্ধকার!

মনে হয় সাপ,
মানুষের মাঝে হেলে দুলে বিষের কণা,
বারবার সুখ আসে না কখনো,
আসে লিলির ঘর্মাক্ত ছায়া,
কঠিন বরফের মতো প্রণয় দিতে এসে
রেখে যায় অবিনাশী মেঘ,

ভেতরে টোকা মারে কালো রাত—
মনে হয় লিলি একটি ঘুণের বাসা এসে
জয় করে নেয় সমস্ত শহর।

অন্যরকম জল

কথাও মাঝেমধ্যে শত্রুর মতো ভেতরে আঘাত করে,
তুমি কথার চাবুকে প্রতিদিন হৃদয়ের ঘরে
কী এক নাচন খেলায়
উন্মাতাল খেলে যাচ্ছো অদ্ভুত খেলা,
কোনো-এক রাতের সুখহীন জ্যোৎস্নায়,
শ্রমিকের দুয়ারে ভাঙনের হাত রাখো,
পৃথিবীর শেষ প্রহরেও এরকম মাতাল ছোঁয়া
চলবে নির্নিমেষ,

নিমগ্ন দোয়েল তা তো তুমি নও ।
এতোকাল মিছেমিছি পাথরের ভূমিকায়,
সর্বত্র, নিরীহ চত্বরে,
তোমার পাপের কথাগুলো, ছুঁয়ে গেছে বুক ।
এতোসব বেদনার রাত, অসহ্যের পাহাড়
কতো আর গ্রহণ করা যায়!

কতোটুকু বিনাশের জল আমাকে পুড়িয়ে মারবে!
আহা জল, তুমিও কি আগুনের মতো হয়ে গেলে,
তোমার কথাগুলো আজ মনে হয় শোকগাথা সেতার,
মনে হয় পাথরের সংসার ।

কোনো এক মুক্তির আকুলতা

একটি বাঁশির বিগলিত সুরের ছোঁয়ায় ঝরে পড়ে
কৌসুমী দুপুর,
সে বেজে উঠলেই শরতে বসন্ত আসে।
চৈত্রের বাউল মেঘের জলসায় ধূপের আসর জমায়।
ঘর ছেড়ে বনবাসী হয় অপেক্ষার মানুষ!
জাদুর মোহ জড়ানো
এই এক উচ্ছ্বসিত দোয়েল, সে ডাকলেই
গাছ থেকে পাতার বহর প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়!

এই এক চেতনার ভায়োলিন,
আদিম শস্যের বেড়ে ওঠার মতন এক উজ্জ্বলতা।
সে ডাকলেই—
মাঝি হাল ছেড়ে উদ্বেলিত হয়—তাকায় তীরের পানে,
নদীর জল থেকে মুছে যায় নোনার সাগর,
শান্ত মাছরাঙা এসে ভিড় জমায় পদ্মার ঘাটে,
তুমি সেই সম্ভাবনার ছিঁড়ে ফেলেছো তার,
ভয়ের উচ্ছ্বাসে কেড়ে নিয়েছো অনেক নাম।
এখন সর্বত্রই ভয়ের কাঁপন,
সবখানেই জন্মান্ধ ভয় পেতে থাকে,
আমাদের আত্মা নির্বিঘ্নে ভয় পেতে থাকে।
শিশুর বিদ্যালয় ব্যাগ ভয় পেতে থাকে,
রিকশার ঘণ্টা কৃষকের কাঁচি,
ভোরের ফুলেরা ভয় পেতে থাকে!

অভাবিত এই সুর, হাস্নুহেনার ভেতর থেকে জেগে-ওঠা বাণী
তাকে পাবার জন্যে কতো রজনী উজাড় হয়ে গেছে,
কতো রমণীর শরীর ছেঁড়া পোস্টারে লিখতে হয়েছে নাম,
বিষণ্ন উদ্যান থেকে ঝরে গেছে ভালোবাসার গোলাপ
মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব চাঁদের কলঙ্ক,
তুমিই এঁকেছো বারবার,
তোমার জন্যেই

আমার মানচিত্র থেকে সোনালি অক্ষরগুলো
খসে পড়েছে যোজন কাল,
এরকম ছোঁয়া, রোগাক্রান্ত আবর্জনা প্রলেপ
কষ্টের গহনে নিয়ে যায় ।

তুমি ওই দোতারার জীবন ফিরিয়ে দাও,
কেননা, ওই বাঁশি বেজে উঠলেই
পথ থেকে সরে যায় অগ্নিদগ্ধ কাঁটা ।
ফুরফুরে জীবনধারার বায়ু নেমে আসে
তৃষ্ণার্ত গৃহের দিকে,
সমাজের অন্তর জুড়ে ভরে ওঠে নীলাভ স্বস্তির তান!

মেঘের সাড়া

সেই প্রবীণ চোখে আজ দেখছি তোমাকে,
তোমাকে দেখছি সারাটা দুপুর দুচোখ ভরে তৃষ্ণার্ত রাত্রির মতো।
এতোটা গভীর দৃষ্টিপথ এই প্রথম আমার হয়তো তোমাকে দেখা,
আজ যে বাতাসের কণ্ঠদেশ বিলাপ করে যাচ্ছে, এসব প্রকৃত বিলাপ নয়।
ভোরের পিঠে যে-সমুদ্রের রং ভারানত হয়ে আছে, এসব দীর্ঘায়িত ফুল নয়।
অলস মেঘের ধারায় হয়তো স্মৃতির স্তূপ ক্রন্দন করে যাবে,
সমস্ত শহর গ্রাম উল্টে দেবে অসহায় নারীর মতো চিৎকার করে,
তবুও আমার চোখ সুস্থির থাকবে তোমার দিকে, তোমার দেহের সীমানায়।

তুমি তো ভয় পেয়ে জাগাবে নিঘুম নিস্তব্ধ মহলের নিদ্রিত মানুষ।
হয়তোবা মৃত্যুর মতো বিবর্ণ ছায়ার আলিঙ্গনে দোলাবে পবিত্র জলের মাছ,
ক্লান্ত বায়ুতে মিশে গিয়ে ছড়াবে বিগত ব্যর্থতার গ্লানি উপহাস তিমির,
তবুও জেনো এই চাওয়া ঘিরে থাকবে তোমার শরীর, সবটুকু আকাশ।

আমি দেখছি তোমাকে আজ পুরোনো শৃঙ্খল নিয়ম ভেঙে,
প্রভাতী সূর্যের মতো তাকাচ্ছি বারবার উপোসি চোখে চোখে,
মনে হয় কতোকাল যেন বিপ্লবহীন ছিলাম আমি তোমাকে বিহীন,
কষ্ট হয়, বড়ো কষ্ট হয় আমার, আর চলে যেতে বলে না!

অনন্ত দূরবিন

আমাদের পথগুলো হোক স্বর্গের আস্তানা, বেগবান
বাউলের চোখের নিশান,
হোক লাবণ্যময়ী রমণীর বিশুদ্ধ সিঁড়ি!
আমাদের ক্লান্তিগুলো হোক নিঃশর্ত স্বস্তির বিকেল,
হোক ফুল-পাখি-সমুদ্র, হোক শিশুদের আনন্দময়ী ভোর ।

বহুকাল সয়ে এসেছি বিরাগসম্পন্ন প্রজাপতির পিষণ,
ফেলে এসেছি না-ফেরা কুয়াশার ভিড়ে অমিয় চাঁদের আলো,
ফেলে এসেছি পিতৃভিটা জল্লাদ—কালো বন্যের আঁধারে,
আমাদের দিন যায় কলঙ্কময় শব্দের গাঁথুনি
আর ভুল গল্পের আসরে!
আমাদের রাত যায় কঠিন চিত্রের এলোমেলো যুদ্ধের জংগায়,
এসব তো নয় হারানো গ্রহের দর্পণ—কৈশোরের ভালোবাসা,
এসব তো নয় স্বর্ণালি বিশ্বের আগামী ভবিষ্যৎ!

আমাদের ক্ষোভগুলো হোক আণবিক বোমা,
হোক মুক্তির দিগন্ত—হোক শান্তির জাতিসত্তা
কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ ভাইয়ের তীর,
আমাদের চোখগুলো হোক বিস্তৃত পৃথিবীর প্রেমীয় দূরবিন,
আমাদের হাত হোক কারিগরি হাত,
পা'গুলো হোক বেদনাজয়ের হাতিয়ার,
আমাদের জীবন হোক মানবিক জীবনের কথামালা,
হোক স্মৃতিময়—গৌরবের শস্যভূমি ।

যে তিমির হৃদয় ছুঁয়ে যায়

শিশুবনে দাঁড়িয়ে

পৃথিবীর সব জ্বালাময় গল্প এসে নোঙর করেছে এইখানে,
বালির সমুদ্রে ঢাকা পড়ে গেছে মানুষের বেঁচে থাকা, আকাঙ্ক্ষা,
শিশুবনের শস্যময় স্বপ্ন,
দুঃখী পদ্মা, হায় তুমি বাঙালির দুঃখ গিলতে ভারাক্রান্ত হয়ে
গেছো,
কী এক ভয়াবহ পরাভবে-বিস্ময়ে ভরে গেছে তোমার তিলক,
কী এক যুদ্ধবাজ, ডালকুত্তা খেয়ে গেছে তোমার উচ্ছ্বাসময় জলরাশি।

তোমার হু হু কান্নার শব্দে বিক্ষত রাজশাহী ঘুমাতে পারে না!
তোমার অন্তর্দাহ কুলক্ষণি বাতাসে বাংলাদেশ ঘুমাতে পারে না!
চারিদিকে আতঙ্কিত ধু ধু মরুর বিলাপ বয়ে চলেছে,
শিশুবৃক্ষগুলোর শরীর থেকে খসে পড়ছে সাজানো পুষ্পদল,
নারীদের স্তনে নেই সন্তানের খাবার,
বৈরিতা ছেয়েছে ফসলের মাঠ। বেহুলার বহর নেই,
যেখানে সারারাত বেদের উচ্ছ্বাসে নৌকার গলুইয়ে বসে জমে উঠত
পুঁথিপাঠের আসর।

মাঝিদের বৈঠার শব্দে শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠত দুপাড়ের মানুষ,
জেলেরা জাল ফেলে নিশিতে গেয়ে উঠত ঐতিহ্যবাহী জারিগান,
হায় পদ্মা! হায় বৈরাগ্য সৈনিক। তোমার অন্তরঘেরা সেই
ধাবমান লখাইয়ের ব্যগ্রতা কোথায় বলো।

এতো রূপবতী! চন্দ্রবদনের অনন্য সুন্দরী হে পদ্মা,
তোমার বুক থেকে সে কোন তৃষ্ণার্ত পরী এসে খেয়ে গেছে সব জল।
এ কেমন মরুর উদ্যান, বালির মালা পড়েছো তোমার গায়।

যে জাদু করেছিলে

যেখানে দাঁড়িয়ে অশান্ত কর্ণফুলিকে সমুদ্রে মিশে যেতে দেখেছি
তার নাম সীতাপাহাড় ।
পাহাড় তো নয়– স্বর্ণ-ঈগল ।
হিরক খণ্ডে খণ্ডে গড়ে ওঠা এই টিলা যেন বাংলার
সুন্দরী মুখকে পৃথিবীতে উঁচু করে ধরে আছে ।
যেখানে দাঁড়িয়ে আমি উপজাতি ষোড়শী উজানীর চোলাই মদ পান করতে
করতে সাগরের কান্না শুনেছিলাম,
তার নাম অনন্য ভাগ্যবতী সীতাপাহাড় ।
পাহাড় তো নয়, পৃথিবীর সকল বিশ্বসুন্দরীর বিস্ময়কর
সৌন্দর্যের মেলা জমেছে এইখানে ।
এখানে সারাক্ষণ হাতির বহর আর হরিণের জলসায়
সীতাবিবি নৃত্য গান করে ।
এখানে চিরকাল শান্তি পরীরা সবুজ সমুদ্রে
ঈশ্বরের স্তবস্তুতি গায়!

যেখানে দাঁড়িয়ে আমি চন্দ্রঘোনার কোমল বায়ুর মাঝে
সমুদ্রের কান্না শুনেছিলাম,
তার নাম সীতাপাহাড় । এ কি পাহাড়? নাকি
লাবণ্যময়ী কোনো রাজকুমারী ।
তার কাঁকনের ধ্বনি, শস্যের বিষাদময় ভোর,
আদিম বাসীর ঘুম ভেঙে দেয়!

উপজাতি যুবা উজানির চুমোর বাহার
স্তূপাকার বৃক্ষদের পর্যটক কবির
ভাবনায় এলোমেলো ঝড় বইয়ে দেয়,
আহা উজানী! সেই যে তুমি আমায় জাদু করেছিলে
সেই থেকে আমি মন-কেড়ে-নেয়া সীতার কাছে
অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছি!

মহাকালের কেউ-একজন

নদীর স্রোতে শুয়ে থাকা অলৌকিক প্রজাপতি,
ইচ্ছে হলেই বাতাসের উপর ভর করে বয়ে চলো এক গ্রহ থেকে
অন্য এক নিজস্ব সংসারে।
তুমি কি বাউল কেউ-একজনা?

রুদ্রহীনতা

সেই যে ঘন দেবদারু পথের বুকে দেখা হয়েছিল,
তরুণ মুক্তিযোদ্ধা, কাঁধে রাইফেল—মুখে দাড়ি ।
অন্তরে সূর্যের অভাবনীয় কারুকাজ,
নীড় ছাড়া দোয়েলের মতো শুকনো ছিল সমগ্র আকাশ ।
অথচ সে কী সাহসিকতার চলাফেরা
এগিয়ে চলতে থাকা।

সেইসব আজ কোথায় গেলো!
তুমি তো দুঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলেছিলে,
তোমাদের জয় হোক ।
নতুন বারুদের উল্লাসে জেগে উঠুক ক্লান্ত চর ।
আমাদের জয় তো হলোই!
কিন্তু তোমার সেই রুদ্র হাসি—আর তুমি তো নেই ।

১৫০০ শতাব্দীর প্রতি

সমস্ত পৃথিবী এখন আমার কাছে নবজন্মের এক শিশু।
পিছনে জ্বলন্ত মানবতা।
হাড্ডিসার কঙ্কালের মিছিল ভেঙে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি
নব সূর্যোদয়ের আঙ্গিনায়,
কে যেন নিথর কুয়াশার ঝোপঝাড় থেকে আমাকে টেনে টেনে
নিয়ে এসেছে এই নীলিমার শিয়রে।
এ যেন নদীর বাঁক নিয়ে অন্য গ্রহে চেয়ে থাকা!
ভাঙতে ভাঙতে বসতবাটি হারিয়ে আবার বালির চরে জেগে ওঠা।
এ যেন হিমালয়ের বুক জুড়ে মাঘ ও চৈত্রের বন্দনা।
শীতের প্রচণ্ড হাওয়ার কবলে পড়ে জমাট বরফ হওয়া,
বসন্তের চিমটির নখরে নখরে আগ্নেয়গিরিতে জ্বলতে থাকা!
এ যেন টর্নেডোর শিকার এক ন্যাংটো বৃক্ষের অবিনশ্বর ভোর,
যার শিকড়ে শিকড়ে দুর্যোগের মেঘ,
কোথাও মাটির স্পর্শ নেই, ঝরে গেছে সব পাতার বহর।
ডালপালাগুলো অসহায় কাকাতুয়া।

আমি দিব্যি টের পাচ্ছি দুয়ারে দাঁড়ায়ে এক দেবদূত,
তার চোখে রক্তের পিপাসা নেই,
তার মুখে অহংকারের ছাপ নেই,
তার হাতে কালিমার জৌলুস নেই,
তার বুকে ঘৃণার প্রলেপ নেই,
শুধু তীর্থের পুণ্যের জলকেলি,
শুধু ঘুম ভেপু স্নিগ্ধ ঊষা গায়ে মাখা
শুধু সুন্দরের বনে শিউলি পুষ্পের আহ্বান,
শুধু ভীষণ ভালোলাগা বৃষ্টির জমিনে চুমো খাওয়া,
ক্রমশ হৃদয়শূন্য গলিপথ থেকে মানুষের নগরে হামাগুড়ি দেয়া।

এক জীবনের তীব্র হাহাকার...নষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে—
আমি এক সুগন্ধি বাগানের আঙিনায় এসে গেছি,
সমস্ত পৃথিবী দুঃখ নিয়ে অসহ্যরকম ঘুমে নিমজ্জমান!
এখন চোদ্দশো শতাব্দীর শেষরাতের কোনো-এক প্রহর,
১৪০১ সালের প্রথম প্রহরের অপেক্ষায় একজন ক্ষুধার্ত কৃষক
পুষ্পতোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদি গ্রামে।

মানুষ-বৃক্ষেরা আতরের গন্ধে মেতে উঠেছে,
পশু-পাখি, ইঁদুর আতরের গন্ধ গায়ে মেখেছে,
মাঝির বৈঠায় ফসলের গোলা এক দুরন্ত বাতাস গায়ে মেখেছে ।

সমস্ত পৃথিবী কিছুকাল পর নতুন এক শিশুর মুখ দেখে
গেয়ে উঠবে পাবলো নেরুদার আন্তর্জাতিক দেশগান ।
অসংখ্য রমণী তাদের বুকের স্তন খুলে দেবে
মাতৃসেবিকার নেশায়,
পাপের সমুদ্র থেকে মুক্তির অন্বেষায়,
জরাজীর্ণ শিল্পরীতির অঙ্গে সৌকর্য ক্যানভাস আঁকার উদ্দেশ্যে,
সকলেই মেলে দেবে সারি সারি হাত । কী অদ্ভুত গৌরবের হাত ।

বঙ্গোপসাগরের মুখে

ঢেউ থেকে ঢেউয়ের আছাড়ে আছাড়ে বাহাইছড়া এখন আধমরা হিমালয় যেন,
গভীর রাত্রির অন্ধকার বেয়ে যখন খ্যাপা বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসে খুবলে খাওয়া সব,
হায়! কক্সবাজার!
তখন তোমার চন্দ্রমুখী বাহাইছড়ার আত্মা,
উঁচু পর্বতের উপর দণ্ডায়মান রাত্রিকালীন সিগন্যাল টাওয়ার
থরথর করে কাঁপে।
পর্যটনের মোটেলগুলোতে নিদ্রারত অসংখ্য পর্যটকের শান্তিময় ঘুম ভেঙে যায়!
সাগরের শো শো গর্জন যখন হিমছড়ির সৈকতের প্রাণ
বালির আদলে উড়িয়ে নিয়ে যায়,
তখন এই সাগরসুন্দরী বাহাইছড়া
কান্নার স্বরে গোঙাতে থাকে!
প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে গাঁথা এতো অপরূপ মোহময়
লীলাস্থল এই বঙ্গভূমি,
তারপরও মাঝে মাঝে সামুদ্রিক দানব-তাণ্ডবের
খোঁচায় লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে!

মনে হয় এই তুলনাবিহীন সুন্দরীর কোনো অভিভাবক নেই।
পর্যটক আসে পর্যটক যায়,
শুধু বাহাইছড়া একাকী আজন্মকাল দাঁড়িয়ে থাকে—
বঙ্গোপসাগরের মুখে।

কেউ ফিরে আসেনি

আমার পিতামহের কাঁধে আজন্মকাল ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর
বন্দুক তাক করা ছিলো,
লোকটা নিজের জমিতে নিজেই বর্গা খেটে খেটে
বৃটিশ শোষণ ভোগ করে গেলেন ।
তবুও পিতৃভিটায় কোনো শ্বেতাঙ্গের কুলাঙ্গার আঁচড় পড়তে দেননি,
যেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের নখরে কেঁপে উঠেছিলো
বাংলার সব প্রান্তর,
লোকটা শাবল হাতে নিয়ে গর্জে উঠেছিলো যোদ্ধার বেশে,
আর বাড়ি ফিরে আসেনি ।
তারই সাহসের বহ্নিশিখায় আমার পিতা চব্বিশটি বছর
বর্বর সাম্প্রদায়িক পাক হানাদারদের
খড়্গ-দাপটের মোকাবেলা করে গেলেন,
অনেক রণাঙ্গনের পর একাত্তরে রক্ত সিঁড়ি বেয়ে আরও অজস্র
শাণিত মুখ গেছে ক্ষয়ে,
অজস্র মায়ের বুক থেকে ছিন্ন-হয়ে -খাওয়া সন্তানের বিনিময়ে
অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা ।

এর পরও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষিপ্র বিষাক্ত ছোবলের
হয়নি তো শেষ,
এখনও কেন নব জালিয়ানওয়ালাবাগের উপদ্রব এ-বাংলায়?

তুমি সেই বাতিঘর

আমাদের জন্ম এবং ইতিহাসের প্রতিটি শব্দ তোমার রক্তের
কণিকা দিয়ে বাঁধা।
আমাদের পতাকা, জাতীয়
সংগীতের প্রতিটি উচ্চারণ তোমার
অক্লান্ত ঘাম শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া।
সে কথা জানে তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফের সমগ্র ঘাসফুলের
কিশোর যৌবন আজন্মকাল।
সে কথা জানে সব পাখি, বন, আকাশজোড়া মেঘ,
জানে সমুদ্রের অজস্র ঢেউয়ের গর্জন,
সে কথা জানে ষড়ঋতুর প্রতিটি প্রহরের জ্বলজ্বলে
তারাদের মিটিমিটি আলো,
সে কথা জানে তিনশত পঁয়ষট্টি দিবসের ভোরের শিশির,
জানে গ্রাম্য মেয়ের অজস্র জীবন,
সে কথা জানে শুধু বারো কোটি বাঙালি নয়—
জানে পৃথিবীর সমগ্র মানুষ।

আমাদের বুক ফুলিয়ে হাঁটাহাঁটি মায়ের কোলে মাথা রেখে
নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়ার পুঁথি, তোমার
অমর কর্মের উর্বর ফসল।
আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের বেঁচে থাকা মৃত্তিকার হৃদয়ে
কান পেতে আজীবন ভাটিয়ালি গান শোনা, সে তো
তোমারই আত্মদানে পাওয়া।
সেই মর্মরে ইতিহাস জানে উনিশশো বায়ান্ন থেকে পঁচাত্তরের
সমগ্র সংগ্রামে আদিঅন্ত উষ্ণতা,
সে সব বর্ণমালা জানে পৃথিবীর প্রতিটি পল্লি।
জানে ইজ্জত-হারানো দুলাখ নারীর প্রাণ,
সে-কাহিনী জানে হায়েনার ছোবলে হারিয়ে যাওয়া
ত্রিশ লাখ শহীদের ছেঁড়াখোঁড়া সংসার,
সে-কাহিনী জানে একাত্তরের উদ্বাস্তু শিশুদের আর্তচিৎকার
এক কোটি মানবের শরণার্থী মিছিল,
আমাদের গোলাপ-হারানো-যুদ্ধে তুমিই নতুন গোলাপের
জন্ম দিয়েছিলে।
ঘোরতর অন্ধকার, আণবিক ধকলের বিরুদ্ধে,
যুদ্ধ, মৃত্যু অন্তহীন রক্তপাতের কালে তুমিই জ্বেলেছিলে
বারুদের অসামান্য বিস্ফোরণ,
মৃত্যুর কবরখানায় তর্জনী উঁচিয়ে তুমিই গেয়েছিলে
অমর কাব্যের বয়ান,
"ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও আমি বলব,
আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা।"

বেলেল্লাপনা

বারুদশিল্পের কষাঘাতে পৃথিবী এখন বড়ই ক্লান্ত।
খুব বেশি শানানো অস্ত্রের ঘা নিয়ে ঘুমায় পৃথিবী,
কোথাও গড়ার যুদ্ধ হয়,
কোথাও ভাঙার যুদ্ধ হয়,
কোথাও শিশুর জীবন বাঁচাতে অজস্র মানব প্রতিনিয়ত
সংগ্রামে রয়েছে মত্ত,
কোথাও শিশুকে উটের পিঠে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে
উল্লাসের মহড়া চলে,
আজকাল পৃথিবীতে মানুষই মানুষের সংজ্ঞা পালটে দিতে চলেছে,
পরাকাষ্ঠে ঝুলানোর মোহে—বেলেল্লাপনায়,
কী অদ্ভুত উগ্রপনায়
কী অদ্ভুত সাম্প্রদায়িকতার পিষণে জ্বলছে মানবিকতা।

মৃত্যু বিষয়ক কটি চরণ

মৃত্যুর পূর্বেই আমি আমার মৃত্যুর পরের সবকিছুর টের পাই,
কী হবে আমার মৃত্যুর পর এই শহরে।
বড়জোর সংবাদপত্রে ক'লাইন সংবাদ শোক-খবর বের হবে,
হয়তো তাও হবে না,
জননী ভাইবোন ছেলেমেয়ে হয়তো কিছুকাল কাঁদবে,
কেউ হয়তো ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করে বলবে লোকটা ভালোই ছিলেন,
অনেকে শোকতাপে ছুড়বে ভেতরের—
দীর্ঘময় কষ্টের নিশ্বাস—
অনেকের চোখেমুখে বাউলিপনায় লাউবন ঝাউবনে উল্লাসের
তারায় তারায় বাজবে অসহনীয় গান,
বড় অসহ্যকর কাঁটার অবসান হলো।

মৃত্যুর আগেই আমি আমার মৃত্যুর পরের সবকিছুর টের পাই,
যার মৃত্যু হামেশাই ঘিরে রয় সাম্রাজ্য জুড়ে,
যার সংসারময় সারাক্ষণ অভাবের ভ্রমর গুনগুন করে,
যার সন্তানের দুধ আনতে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়,
তার আবার মৃত্যু কিসের?
যার আজীবন কাফনের বস্ত্র গায় দেখতে হয় বিস্ময়কর পৃথিবীর মুখ,
তাকে আবার তোমরা কিসের কাফন পরাতে চাও?

মৃত্যু যাকে প্রত্যহ হানা দিতে দিতে জীবমৃত করে রেখেছে এইখানে,
তার আবার লোক দেখানো মৃত্যু কিসের?
মৃত্যুর আগেই আমি আমার মৃত্যুর পরের সবকিছুর টের পাই।

ভালোবাসার সেইসব গান

১.

হৃদয়কে ছেঁড়া জালের পোশাক পরিয়ে আর কতকাল
মানুষের আড়ালে রাখতে চাও!
হৃদয় তো কোনো বাউন্ডেলে পাখি নয়,
হৃদয় তো পাহাড়ের শরীরে জমাটবাঁধা মৃত্তিকা ।
হৃদয় তো শ্রাবণের অনন্ত বৃষ্টির সুখ ।
হৃদয় ভালোবাসার খুবই এক অদ্ভুত তালার চাবি!

তুমি সেই জীবনের সিঁড়িকে কেনো লুকিয়ে লুকিয়ে রাখ,
কেন তুমি জ্যোৎস্নার বিকিরণকে ঘুমিয়ে থাকতে বলো ।

২.

কথার মার সাথে কী এমন কথা,
এই কথা বলেছিলো কবি লিলি সত্যিকারের কথা,
কথার মার সাথে—তোমার কী এমন কথা ।

একান্ত নিজস্ব সংবাদ

কেন কাঁটাঘেরা জড়োয়ার সাজে সারাক্ষণ আমার ভেতরে
খুনসুটি চালচিত্র এঁকে যাও,
কেন মিছেমিছি বৃষ্টিঝড়ার সন্ধ্যার আদলে—
অভিনয় করো কবির দুয়ারে! অতিশয় বৃদ্ধ
গাছেদের পাতা খসে পড়ার ধুপধাপে
তুমি আমার বিরহকাতর জমিন থেকে
চুপচাপ সরে দাঁড়াও।

শিকড়হীন বসবাস—
পুতুলের হাস্যশয্যায় আমি তো পারি না ডুবে যেতে!
আমাকে কিছুটা কাল বেঁচে থাকতে দাও।
হে কাগুজে নটরানি তুমি আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও।

তবুও তোমার কাছে যেতে হয়

ওরা ভেবেছিলো তোমার মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে—
আর কখনো জীবনের গান জাগবে না,
মাটি ও মানুষের ভেতরে তোমার গ্রন্থিত চিরকালের দর্শন,
বিশ্বকাঁপানো মানবিক দোতারা বাজবে না,
ওরা চেয়েছিল এই শস্যভূমে ভুল কীর্তিনাশার বর্বরের পুনরুত্থান,
ওরা চেয়েছিল তোমার সাজানো অমর বৃক্ষগুলো কেটে কেটে
দুঃখ-জাগানিয়া প্রহর আনতে ।

পারেনি কিছুই!
টুঙ্গিপাড়ায় যখন সুশোভনা ঘেরা নক্ষত্র প্রজ্জ্বলিত মাটির সিথানে
তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়,
তখন থেকেই হাজার বছরের আলোকিত পায়রাগুলো গেয়ে চলেছে
তোমার সংগ্রামী জীবনের চব্বিশটি বছরের কালজয়ী ইতিহাস,
ওরা গেয়ে চলেছে এ-জাতির হাজার বছরের মহানায়কের তৃণধি
গজল,
ওরা গেয়ে চলেছে এ-জাতির মহান স্থপতির নক্ষত্র জাগানো
বিস্ময়কর চিত্রমালা ।
ওরা গেয়ে চলেছে এদেশের মর্মরে ব্যগ্রের আগুনঝরা
সময়ের গল্পমালা,
যাঁর রক্তের প্রতিটি কণায় কণায় গেঁথে আছে আমাদের
পতাকার জন্ম-ইতিহাস,
জাতীয় সংগীত, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের
সুখ ও কান্নার প্রদীপ্ত দিবানিশি ।

ওরা চেয়েছিলো আকাশের মতো সুবিশাল তোমার পৃথিবীজোড়া
কর্মপ্রবাহ বুলেটের আঘাতে মুছে দিতে,
সাগরের মতো শক্তিধর তোমার কীর্তিধারা,
অনন্য স্রোতশীল নদীর মতো আরও অসংখ্য উচ্চকিত নদীর
প্রবাহ গড়ে চলেছে ।

আমাদের এতো ক্ষয়, এতো হারনোর বিলাপ, না-পাওয়ার
হাহাকার,
তবুও তোমার কাছে যেতে হয়!
তুমিই আমাদের একমাত্র মুক্তির আদিগন্ত গ্রহ! সংগ্রামের হাতিয়ার ।

আলো-আঁধারে

১.
নিশীথ রাতের কুয়াশায় ভিজে ভিজে
কিছু লোক নষ্টামির আতর ছড়ায়।
কিছু লোক দিনমান ঠেলা-চালনার ঘর্মাক্ত
বিষময় জল ঝরায়,
বৃষ্টি আর কুয়াশা এতো বেশি মানবপ্রেমী—
উভয় আমাদের রাতভেজা চারিত্র দেখে
কেবলই অট্টহাসিতে মগ্ন রয়।

২.
পৃথিবীতে একটিমাত্র লোক আমাকে দেখেই
কেদারা ছেড়েছুড়ে দাঁড়িয়ে, বিনয়চিত্তে
আরবি ভাষায় বলতো আপনার শুভ হোক!
অবশেষে সেই মোহাম্মদ আলিও চলে গেল!
মোহাম্মদ আলি প্রহরী হোক, রাতের পাহারাদার হোক
পচা শামুক কিংবা ফুল হোক
সেও একজন মানুষ ছিলো।

এক ধরনের বিবাগি

অপরূপ মাধবকুন্ডে পৃথিবীর শীর্ষ ঝরনা সুন্দরীর পাশে বসে
সেদিন একটি বিকেল কাটালে তোমার কী এমন ক্ষতি হতো ।
কয়েকটি বসন্ত হারাবার পর আরেক বসন্তে আমাদের দেখা,
এতোকাল তোমার ভেতরে যতো কষ্ট জমা হয়েছিলো,
এতোকাল আমার ভেতরে যতো না-পাওয়া জমা হচ্ছিল,
ভেবেছিলাম আজ দুজন ময়মনসিংহে জয়নুলের
সংগ্রহশালা বাগানের স্মৃতিবহ কথামালা শুনবো,
ভেবেছিলাম স্টেশন রোডের হোটেল তাজমহলের দীর্ঘ
সময়ের আড্ডার কথা বলবো ।
হোটেল আসাদের নয় নম্বর কক্ষে যেদিন আমি
তোমাকে প্রথম আবিষ্কার করি,
তুমি যেভাবে আমাকে অন্তরে দিয়েছিলে ঠাঁই,
ভেবেছিলাম সেইসব মরিচাঘেরা কিছু সংগীতমালা
আমরা আবার গাইব ।

অথচ সেদিন তোমার মুখচ্ছবি অন্তরদৃষ্টি
কালো মেঘের আবরণে কেমন যেন বিবাগি সেজেছিল,
প্রকৃতির মহাবিস্ময়ের উপকরণে গড়ে ওঠা মাধবকুণ্ড
তার অপার ঝরনাধারার কাছে দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসলে
কী এমন ক্ষতি হতো তোমার ।
বাড়ি ছাড়া একজন সন্ন্যাসের ছায়ার কাছে একটি প্রহর
কাটালে সেদিন তোমার কতোটা কষ্ট পাওয়া হতো ।

অসংখ্য সূর্যাস্তের শেষে আরেক সূর্যাস্তে আমাদের দেখা ।
তোমাকে মনে হচ্ছিল আমার হারিয়ে-যাওয়া গোলাপ,
তোমার দেহকে মনে হচ্ছিল আমার নিজস্ব শরীর,
তোমার চোখ দুটোকে মনে হচ্ছিল আমার চোখ ।
সেদিন তোমার দীর্ঘ নিশ্বাসগুলো আমার খুব চেনা ছিল ।

আর একবার অস্ত্রটাকে উঁচিয়ে ধরো

শিল্পের জাগরণে ধর্মান্ধতার পোড়ে ঘর,
সংস্কৃতির উত্থানে সাম্প্রদায়িকতার ভাঙে ঘর।
যেখানে ক্ষুধার কষাঘাতে প্রতিনিয়ত মানবতার
অস্ত্র ভোতা হয়ে যায়,
সেখানে এই হয়েছে ভালোবাসা রক্ষার হাতিয়ার।
উগ্র ধর্মবাজ-বেহায়া ফতোয়াবাজের বিষদাঁত
এখানে পৃথিবী নামের গ্রহকে ছোবল মারায় উদ্ধত।

নিস্তেজ-ম্রিয়মাণ হে মানুষ,
আবার অস্ত্রটাকে উঁচিয়ে ধরো সকল উগ্রতার সম্মুখে.
সংস্কৃতি বিপ্লবের নেশায় আরেকটি জাগারণ ঘটাও।

স্বপ্নের বসতি

নদীতে-চরজাগা ভোরের অপেক্ষায় আমাদের অপেক্ষাগুলো
থুত্থুরে বৃদ্ধ বয়সি হয়ে গেছে,
যদি ওখানটায় কখনো ঘর বাঁধা যায়—
স্থলভাগে তো দাঁড়াবার স্থানটুকু নেই,
যদি ওই নবচরে নতুন গ্রামের বীজ বোনা যায়,
মাথা গোঁজার ঠাঁই মেলে,
হয়তোবা মানবসভ্যতাকে ঠেক দেয়া যায়।

নদীতে চর জাগার রূঢ় স্বপ্নের বিষণ্নতায় বিভোর এই শহর,
হয়তোবা আগামী প্রজন্ম ওখানে ফিরে পাবে ঠিকানা,
পাবে পা ফেলার দুর্লভ বসতি।

ঝিনুকের মৃত্যু-অহংকার

ঝিনুকের গর্ভ ছিঁড়ে শামুকেরা মহাপৃথিবীতে প্রসব করে
শাশ্বত প্রভা,
ঝিনুকের নাড়ি ছিন্ন করে শামুকেরা
ভিন্ন গ্রহে ছড়িয়ে দেয়
অসংখ্য হাত-পা,
চিরমূক, নিথর কচ্ছপ-চরিত্রের জীবন যেন—
সমস্ত পিষণ পিঠে বেঁধে ওরা শামুককে সন্তানের
তুল্য ছায়া দেয়,
এই তার জ্বলন্ত স্বভাব।
এটা তার জন্মের বৃত্তান্তর এটাই ঝিনুকের কর্মভূমি,
এই হচ্ছে ঝিনুকের মৃত্যুসংবাদ।
হাঁটতে হাঁটতে জীবের সংগম, জন্তুর অকাণ্ড দেখতে দেখতেই
এই তার ভালোবাসার স্বভাব,
এই হচ্ছে স্বর্গের স্বভাব,

ওরা মৃত্যুর পোশাক শরীরে ধারণ করে,
ঝিনুকের কোনো গর্ব নেই। শামুকের জন্মই তার মৃত্যুর অহংকার

নদীকাহিনী

যে-নদী জল বহন করে,
সে জানে তার কতোটা ক্ষয়ক্ষতি হয়।
ভেতরে জমিয়ে-রাখা নিজস্ব ভিটা কীভাবে হয় নিঃশেষ,
কার ঘর ভাঙ্গে। কার সর্বশেষ পিতৃভিটা উজাড় হয়,
তা জানে সে-নদী, যার আদিঅন্ত বারবার শানানো
তীরের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন হয়।
যে-নদী ভাঙতে ভাঙতে সকল গ্রাম, বিল, পাহাড়-বন্দর গ্রাস করে ফ্যালে,
সে-নদী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার আলোয় আলোয়
শস্যধরাও গড়তে জানে!
যে-নদী গর্ভবতী মায়ের সন্তানকে আঁকড়ে থাকার মতো
চিরকাল বুকে ধারণ করে আছে সেবাদাস, মানবতা,
সে জানে যৌবন হারিয়ে গেলে কার কী কী ক্ষতি হয়।

একটি ভ্রম্য-বিষয়ক গদ্য

এতোকাল পর আমাদের মাঝে হঠাৎ করে দেখা।
ক্ষোভ আর ক্ষরণের গল্প বলতে বলতে আমরা
আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম দুজনে দুই গ্রহে
জমানো অতিশয় জরুরি কথামালা কোলে চোখ রাখা,
চুমোয় চুমোয় বিকেল কাটানো আর হলো না!
অশান্ত প্রহরের ভারি দুঃসহ আকাঙ্ক্ষাগুলো,
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে,

হাতে হাত রেখে বুকে বুক রেখে,
হৃদয়ে হৃদয় ঘষে অন্তরে অন্তর রেখে,
তোমাকে সারারাত আবৃত্তি করা আর হলো না!
স্বপ্নের গেরামে এক ছায়ায় হাঁটাহাঁটি আর হলো না!

এতোকাল পর অচেনা এক বসন্তে আমাদের দেখা,
তুমি তো নির্বাক, বোবার আদলে শুধু আমাকে

চুরি করতে ছিলে,
বর্ষার গতিময় জলস্রোতের মতো ছুটছিলে কবির উদ্যানে!
বড়ো দুঃখ পাই, কষ্ট পাই—তার পরও চষে বেড়াও সব আঙিনা,
তোমার সঙ্গে কি আমার কখনো দেখা হয়,
নাকি পর্বত ধসে পড়ার মতো আমার আশাগুলো
অবলুপ্ত হয়ে পড়ে,
কেবল ক্ষরণে ক্ষরণে, শুধুই বিষণ্ন কালো মেঘ এসে ঢেকে দেয়
আমাদের দীর্ঘকাল পর সাক্ষাতের ইতিবৃত্ত।

বৃষ্টি ও মানবিকতার একজন
ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালকে

তুমি বৃষ্টিকে প্রাণাধিক ভালোবাসতে,
তোমার কবিতায় ছিলো বৃষ্টি,
তোমার গানের কথায় ছিলো বৃষ্টি,
তোমার চিন্তার গভীরে ছিলো বৃষ্টি,
তোমার চোখের পাতায় ছিলো বৃষ্টি,

বৃষ্টির ফোঁটার মতো কবিতায় তোমার ঝরেছে রক্ত,
বৃষ্টি ফোঁটার মতো গানের কথামালায় ঝরেছে রক্ত,
বৃষ্টি আদিমতায় ভিজতে ভিজতে তুমি—
বেদনার বিষণ্ন মেঘে ভেসে ভেসে গেছো,
বৃষ্টির বহতায় আকুল হৃদয়কে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
শিউলির আনন্দ দিয়েছো ভরে ।
তুমি বৃষ্টি ও মানবিকতার কেউ-একজন ছিলে ।

বাংলাদেশ

এতোকাল যারা বিষধর সাপ হয়ে আমাদের ইতিহাসের অন্তরে
ছোবলের থাবা মেরে হায়েনার কাজ করেছে,
এতোকাল শুধু ইতিহাস নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে।
স্বাধীনতার ক্রীড়নক, বেইমান হন্তারক হেসেছে।

আজ যখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বপদে স্বস্থানে এসেছে ফিরে,
আজ যখন আমাদের সন্তানের জন্যে পাঠ্যপুস্তকে আবারও লেখা হচ্ছে
স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঠিক অবয়ব,
আজ যখন শহিদের নামে আবারও প্রচারযন্ত্রে
বেজে উঠেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের গান,
তখন রক্তচোষা পুরনো শকুনগুলোর ডানায় ডানায় অভিশাপের
খোঁচা এসে প্রতিশোধের সুর বইয়ে দিচ্ছে।

আমি আমার সন্তানদের কথা দিয়েছিলাম,
এদেশে আবার একদিন-না-একদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর
সেই অকুতোভয়ী জাগরণ জেগে উঠবে,
বলেছিলাম তোমরা আবার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের কীর্তিময়
চব্বিশটি বছরের কথামালা দিয়ে গড়তে
থাকবে প্রতিটি প্রাণ!
আজ সেই চিরায়ত স্বপ্নের চাঁদ এসে আলোকিত করেছে বাংলার রাত্রি
দিনের ক্লান্তিময় সূর্যের রশ্মিতে এসে ঠাঁই নিচ্ছে একাত্তরের নয় মাস।

আজ বাংলাদেশ বড় সুখের নেশায় মত্ত,
চারিদিকে মুক্তির ঘাসফুলে নোলক পরিয়েছে প্রকৃতি
কারা যেন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল ভূমির কানে-কানে,
মানুষের হৃদয়ের চাষবাসে বলে যাচ্ছে "শাবাশ বাংলাদেশ!"

এইসব শকুন

সেদিন পুরো জমিনের শরীরে শরীরলাগা যোদ্ধার লাশ ছিলো,
আমি মৃতপুরী কারবালার বুক থেকে একমুঠো মাটি খুঁড়ে
সমগ্র জমিনে ছড়িয়ে বলেছিলাম,
এ আমার গোলাপ বাগান।
অজস্র দুঃখিনী মায়ের নাড়ি-ছেঁড়া অমরতার বীজ
থেকে জন্ম নেবে একটি বাউল গান,
প্রতিটি যোদ্ধার মুখাবয়ব অঙ্কিত স্থাপত্যকর্মে নির্মিত হবে
স্বাধীন পতাকা,
যার সবুজাভ ভূমি হবে
আমাদের স্বাধীন মাতৃভূমি
যার রক্তাক্ত গোলকের বালিকণা, জলের সরোবর
গাইতে থাকবে,
"মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি"
প্রত্যহ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তসীমায়
বাজতে থাকবে এই বিজয়ের সুরমালা।

সেই থেকে আজ দুটি যুগ পার হয়ে গেল বড়
অবসাদ অপমানে,
এ আমার অস্তিত্ব-বিকানো গোলাপবাগান,
বড় দুঃসময়, অনেক স্বজনের লাশ আর বোনের
সম্ভ্রমহানির এই উদ্যান,
এতোকাল পরও কেন তোমার বুকের উপর
ঘাতকের প্রেতাত্মা ছায়া ফেলে যায়,

আমি এইসব জল্লাদের হাঁমাগুড়ি চাই না।
আমি এইসব বেহায়া শক্তির ধ্বংস চাই। বিনষ্ট চাই।
আমি এইসব সিমারের ফাঁসি চাই।

কয়েদিপনা

ইতিহাস বিকৃতকারী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের প্রতি

যে-জীবন একটি ফুলকে বাঁচানোর লড়াইয়ে জল্লাদের কবল থেকে
গড়ে তুলেছে অনন্য এক জীবন
তুমি সেই জীবনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছো আরেকটি জল্লাদের থাবার সম্মুখে,
তুমি ফুলকে অকালে ঝড়ে করেছো বিচ্ছিন্ন,
তুমি এমনই জল্লাদরূপে সমস্ত মৃত্তিকার সম্পদের আত্মাজুড়ে
লেলিয়ে দিয়েছো ভয়াবহ ঘুনপোকা,
তুমি এমনই ঘাতক চিল,
যার ঠোকরে ঠোকরে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে সকল মানবিক বাগান,
তুমি এমনই অমাবস্যার ঘোরতর অন্ধকার—
যার বহতায় কুলাঙ্গা টানা-হেঁচড়ায় খসে পড়েছে—
আড়াই দশকের জমানো-লালিত স্বর্গকণা।

যে-গোলাপ অসংখ্য গোলাপ হারানোর যুদ্ধ থেকে
ফিরে পেয়েছে নবজন্মের শিল্পরূপ—
তুমি সেই অভাবিত শিল্পচিত্তে চালাচ্ছো এমনই ধারালো করাত,
যার বিষ বিগ্রহের কামড়ে কামড়ে প্রাণহীন হয়ে পড়ছে
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ—
প্রাণহীন হয়ে পড়ছে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন,
প্রাণহীন হয়ে পড়ছে আমাদের স্মৃতিসৌধ।

তোমার জল্লাদিপনার অবসান হোক।
তোমার হানাদারি রূপের অবসান হোক।

আমরা কি পেরেছি

পরিখার পাশে শত্রুর বুলেটবিদ্ধ তোমার লাশ ছুঁয়ে
আমরা উচ্চারণ করেছিলাম—যুদ্ধের পর
তোমার নিঃস্ব সংসার হবে আমাদের সংসার,
তোমার মাতা হবে আমাদের মাতা,
তোমার সন্তান হবে আমাদের সন্তান।
বলেছিলাম তোমার শহীদী নিষ্প্রাণ দেহ ছুঁয়ে বলছি,
যুদ্ধের পরের দিনগুলো হবে তোমার সন্তানের ভালোবাসা
তোমার কিশোরী কন্যার উজ্জীবিত কাল হবে গর্বের সময়।
কথা ছিল যুদ্ধশেষে কোনো ঘাতকের আস্তানা
থাকবে না এই স্বাধীন বাংলায়।

বলেছিলাম তোমার রক্তঝরার প্রতিটি কণার হিসেব দেবে
এই বহু দামে কেনা স্বাধীনতা,
কথা ছিল যুদ্ধের পর বিরান-বিষণ্ন উপত্যকায়
আমরা সবকিছু অর্পণ করবো আমাদের বারাঙ্গনা
মা-বোনদের করকমলে।

ওদের হারানো সম্পদের কথা ভেবে আমাদের সমগ্র
চেতনার উৎসরণ হবে কেবল তোমাদেরই
রক্তাপ্লুত মিনার।
আমরা কি পেরেছি এইসব অঙ্গীকারের প্রদীপ জ্বালাতে?

বিসর্জনের পূর্বগান

১.
জ্যোৎস্নার হীরক তালবাগানের মৃত্তিকা ছুঁয়ে যেভাবে চুমোয় চুমোয়
ঘিরে রয় অমর পৃথিবী,
আমি চিরকাল সেরকম অজস্র গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রবো—
তোমার অন্তর শয়নে।
এই ঘুম আমি কত্তোকাল ধরে ঘুমোতে পারিনি,
এই ঘুম গোলাপের স্পর্শভরা—বহুকাল ধরে আমি ছুঁতে পারিনি।
ভরা পূর্ণিমার চাঁদ যেভাবে ক্লান্তিহীন শরীর হেলিয়ে দেয়
আকাশের বুকে,
আমি অনন্তকাল ধরে সেই সন্ন্যাস গজল শুনতে শুনতে
চেয়ে থাকবো তোমার মুখের দিকে!

তখন তোমার সবটুকু মুখ হবে আমার মুখ,
তখন তোমার সবটুকু জীবন হবে আমার জীবন।

২.
কিছু মেঘ আকাশ জুড়ে শুয়েছিল সারারাত,
কিছু পাখি বসেছিল মেঘেদের আঙিনা জুড়ে,
কিছু রাখাল গঞ্জের মেঠোপথে বাঁশি বাজায় সারারাত।
কিছু রমণী ঘুমোতে পারেনি নিশির গোঙানির জন্যে,
কিছু মাছরাঙা বৃক্ষের শরীরে জমাট শিশিরে নেয়ে উঠেছিল,
কিছু সন্ন্যাস শরতের ঘাসে গড়াগড়ি দিয়ে পার করেছে যৌবন,
কিছু তারা রাতের পোকা খেয়ে খেয়ে রাতকে করেছে মহান।

তোমার এই নেশাকে থামাও

তোমার এই রক্তচোষা নেশা থামাও,
তোমার অহংকারের থাবাটাকে থামাও,
তুমি থেমে থাকো।
তুমি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ো,
ডানে বামে সম্মুখে পেছনে কোথাও যাবার নেশা থামাও!
তুমি একাকিত্ব হও। মনে করো তুমি এক কারাগারে আছো।
সম্পূর্ণরূপে একঘরে হয়ে গেছো,
তোমার বয়ে চলায় আমাদের দীর্ঘকালের লালিত বিশুদ্ধ
বায়ুতে দূষিত শ্যাওলার সর জমে!

তুমি যেখানে যাও সেখানেই রক্তনদী বয়ে যায়,
তুমি যেখানে যাও সেখানেই কালো পতাকার উড্ডিন ঘটে,
তুমি যেখানে যাও সেখানেই অসংখ্য ইয়াসমিনের কবর রচিত হয়!
তুমি প্রগাঢ় স্থবিরতার অরণ্যে নেমে গেছো।
মনে করো তুমি নেই—
স্বৈর উপত্যকা, জুলুম-পিষণ, বেহায়াপনার অভিশাপে চুরমার হয়ে গেছো!
তোমার নিষ্ঠুর পদপাতে তুমিই ধারণ করেছো সর্বগ্রাসী হাঙর,
তোমার চারদিক এখন তুমিই গড়ে তুলেছো এক তলাহীন পিঞ্জির,
তুমি তলিয়ে যেতে থাকো।
ধরাছোঁয়াহীন তলহীন তলায় তলিয়ে যেতে থাকো।

তোমার রক্তচোষা বেলেল্লাপনা থামাও
অনেক জীবনের দামে কেনা আমাদের সাজানো বাগানে
পূর্ণ গোলাপ ফুটতে দাও,
তুমি এই কুলাঙ্গিনী বর্ষণের ধৃষ্টতাকেও থামাও,
তোমার রক্তচোষা নেশাকেও থামাও।

কবি ও কবিতার বনবাস

আমি যে কবিতার পেছনে ছুটতে ছুটতে ছেড়েছি ঘর,
কবিতা তো ছাড়েনি আমায়,
কবিতা তো দেয়নি আমার ঘর,
কবিতা তো দেয়নি আমায় কাঙ্ক্ষিত রমণীমুখ।
আমি যে কবিতার জন্যে সেই যে কবে হয়ে গেছি জ্বলন্ত বাউল,
কবিতা তো দেয়নি একটুকু কোমল হাসনুহেনা
কবিতা তো একবারও চায়নি ফিরে—
বিষণ্ন সন্ন্যাসের নিরন্তর বনবাসে।
আমি যে কবিতার বসতভিটায় চাষাবাদ করেছি
গুচ্ছ গুচ্ছ বেদনার বীজ,
কবিতা তো দেয়নি কাব্যকৃষকের শ্রমের ফসল,
কবিতা তো একবারও বলেনি বিষণ্ন বাউল আয় ফিরে আয়।

আমি যে কবিতার শীর্ষ কালান্তরে আত্মজ ছোঁয়া আঁকতে আঁকতে
হারিয়ে ফেলেছি পঁচিশটি বসন্ত,
কবিতা তো আমার দেখেনি সেইসব ক্ষয়ের যাতনা,
কবিতা তো একবারও বলেনি—
এই এক পোড়া উদ্যান যার আদি অন্ত হয়ে গেছে বিলীন,
কবিতা তো হারায়নি চাঁদমুখ লিলির জীবন,
কবিতার জন্যে সেই যে কবে বের হয়ে এসেছি কাব্যবনবাসে
কবিতা তো একবারও ফেরায়নি মুখ, শোনেনি কাব্য-শ্রমিকের গান।

এখনও সেই অঙ্গীকার

পৃথিবীর সকল গোলাপ তুলে এনে যদি কোন সুভাষিণীর
খোঁপায় সজ্জিত করে বলা হয়,
এই নাও তোমাকে দিলাম জীবনানন্দের বনলতা সেন,
তার পরও কেউ আমায় ফেরাতে পারবে না তোমার অস্তিত্ব থেকে ।

যদি চাঁদের শরীর থেকে সবটুকু ঐশ্বর্য এনে কারো গায়ে মেখে বলা হয়,
এই নাও তোমাকে দিলাম নক্ষত্রের আতরমাখা বিশুদ্ধ শিথান,
তার পরও কেউ আমায় ফেরাতে পারবে না তোমার উদ্যান থেকে ।

যদি পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরে সুন্দরে একটি অর্ঘ্য গেঁথে
পরিয়ে দেয়া হয় কোনো বিরলমুখী দেহে,
তখন হয়তো বলবে—
এই নাও তোমাকে দিলাম স্বর্গের উর্বর ঠিকানা,
তার পরও কেউ আমায় ফেরাতে পারবে না তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে ।

টেলিস্কোপে চাঁদকে দেখে

সেদিন দূরবীক্ষণের পর্দায় চাঁদের মুখ দেখে আমি
বলে ফেলেছি এই তো তোমার মুখ।
এ কি চাঁদ—নাকি রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের গোলাপগুচ্ছ।
বাদামি রঙের মৃত্তিকা মহাকাশের বিষণ্নতাকে উপড়ে ফেলে
পৃথিবীতে সম্প্রচার করেছে অন্য এক পৃথিবী,
যার একাকিত্ব নিরহংকার আলোকমালায়
অনিন্দ্য মুক্তোর প্রতিচ্ছবি এসে ভরে দেয় আমাদের পথ,
ঠিক যেভাবে তুমি একদা আমার অন্তরে ছিলে জড়াজড়ি করে।
তারই রূপলাবণ্যে অবতীর্ণ ওই চাঁদ,
উঁচুনিচু পাহাড়ের মিছিল ওই চন্দ্রের শিয়রে নিমজ্জমান!
যেন রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের গোলাপগুচ্ছ
দূরবীক্ষণের পর্দায় নিয়েছে ঠাঁই।
যেন পরিণত সুন্দরীর অলংকার গায় মেখে
স্বপ্নের রোদ্দুরে একাকার,
যেন স্বর্গের অপ্সরা কবির যৌবনদীপ্ত দিনগুলোর চুরি-করা এক সন্ন্যাসিনী।

চিরকাল একটি মুখ

চিরকাল শুধু একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো কাঁটার জাল ফেলে
বন্দি করেছো আমায়!
দুহাতের মুঠো ভরে জমিয়ে গেছো নিরানন্দ মরুভূমির বেলা।
অসুখের পর অসুখ ছড়িয়ে গেছো আমার ক্লান্ত সমাজদেহে,
আজ কেবলই মনে হয়, তোমার অহংকারী খোঁপায় একটি
মানবিক গোলাপ গুঁজে দিয়ে পৃথিবীর আড়াল হয়ে যাই।
সবকিছু ভেঙেচুরে তার পরও
তোমার নামেই পাহাড়ের কাছে না-বলা গল্প বলি,
বৃষ্টির দুয়ারে বৃক্ষের কানে-কানে বলে ফেলি, সে শুধু আমার।

চিরকাল শুধু ভুল শিল্পে তাপিত নগরে রেখেছো আমায়,
ভুল জলসায় অবাক নরকে গেয়ে গেছো তুমি ক্রীতদাসের গান।

অপেক্ষা

পৃথিবীতে এমন একটা সকাল আসুক,
যার জন্মক্ষণে মানুষ দেখতে পাবে জগতের সকল অমানিশা
নিরাকার হচ্ছে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
যাবতীয় বিষবাষ্প, কাঁটার বহর বিলীন হচ্ছে সুশোভিত তাণ্ডবলীলায়,
যে ভোরে চোখ মেলেই মানুষ দেখতে পাবে—
পৃথিবীর সব মিথ্যারা পালাচ্ছে সত্যের জয়ে।
কৃষক কোদাল দিয়ে দুঃসংবাদের কবর খুঁড়ছে,
পৃথিবীর সকল বেদনা সিন্দুকে ভরে ফেলা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের তলে,
যার ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রবে মুঠিমুঠি গোলাপের
চাষাবাদ আর শিল্পী ও যোদ্ধার মুখ।

পৃথিবীতে এমন একটি ভোরের জন্ম হোক,
যার ক্রন্দনের ভারে বিশ্বের সকল গোলাবারুদ অকেজো হয়ে যাবে,
চুমুকে চুমুকে আদমসন্তানেরা গ্রহণ করবে নক্ষত্রবিলাসী ছায়া।
মায়ের কাছে পাঠানো ছেলের চিঠিগুলো হবে
এক-একটি অসামান্য গ্লানিহীন হৃৎপিণ্ড,
যে-সকাল শুধু সাহসী মাছরাঙার মতো উড়তে থাকবে অনবদ্য আকাশে,
শিউলিঘেরা পুষ্পের জীবন হবে প্রতিটি মানুষের জীবন,
যার সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বুক স্পর্শ করার সাথে সাথেই
যন্ত্রণাবিদ্ধ মারণাস্ত্রের সমস্ত ঘাঁটিগুলো হবে স্বস্তির উত্তাপ,
যে-সকালের ট্রেনগুলো এমন সব সংবাদপত্র বহন করবে, যার হেডলাইনগুলো জুড়ে
থাকবে আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ফসল,
নারীর আত্মহত্যা, অবক্ষয়ী দগ্ধ জীবন যে-সকাল রুদ্ধ করতে পারে
পৃথিবীতে এমন একটি সকাল আসুক নেমে।

যার জন্যে হাজার হাজার বছর ধরে মানবকুল অপেক্ষায় আছে,
বিশ্বময় আবির্ভূত হোক এমন একটি ভোর—
যার ক্যাটালগ জুড়ে অসাম্প্রদায়িক কবিতার প্রদর্শনী হবে,
বিষণ্নতার বাগানকে গিলে খাবে লৌকিক বৃষ্টি,

কেউ এসে বলবে বহুকালপর পৃথিবীতে আলোকিত

প্রজাপতি উড়ছে,
অপরূপ উপজাতি সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নামুখর সম্প্রীতির বয়ানে বয়ানে
কেটে যাবে দগ্ধ আবহাওয়া,
গর্বের নীলিমা এসে ছেয়ে যাবে দিগন্ত থেকে দিগন্তের ডেরা,
পৃথিবীতে এমন একটি সকাল আসুক।

মেঘ ও প্রকৃতির জাগরণ

১.

কিছু মেঘ অন্তরে আঘাত নিয়ে চিরকাল শুয়ে থাকে আকাশের বুকে,
কিছু মেঘ ক্রন্দনরত ফসলের সংসারে দুর্বিনীত প্রদীপ জ্বালাতে
বৃষ্টি হয়ে নামে ঘাসের দুয়ারে।
এইসব বিলাপের কান্না শোনে সাধক তেলশাইর জারুল বীথি,
আড্ডাবাজ রজনীগন্ধার বিকেল।
এইসব গজল জলসা মনে রাখে চিরায়ত শহীদ মিনার!
মানুষেরা কি জানে কেন মেঘের দুঃসময়ে মেঘেরাই কাঁদে? কেন পৃথিবীর মাজারময়
পরিবেশে শিষ্যরা গড়াগড়ি যায়?

২.

কিছু মেঘ সারারাত অসহায় যুবতীর বিনাশী দৃশ্য
দেখার মোহে প্রত্যহ ঘুরে আসে
গণিকার ঘর,
কিছু মেঘ সারারাত দেখতে থাকে
মতিঝিলে নারীর হৃদয় নিয়ে টানাটানি,
দেখতে থাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অসভ্যপনা,
ক্ষুধার্ত তহুরার জীবন খসে যাওয়ার চিত্রপট দ্যাখে,

কিছু মেঘ জাতিসংঘের সভায় হায় হায় করে!
খুব চিৎকার করে বলতে থাকে
আমরা এইসব শ্মশানের উত্থান চাই না,
আমরা এই মৃত্তিকার উঠোন জুড়ে পুষ্পউদ্যানের জাগরণ চাই।

একদিন ভাওয়াল রাজার উদ্যানে

১.

সবুজের চাদর গায় নিবিড় ঘুমে নিমজ্জমান তোমার শৈশব
যৌবন—চিরজনমের বসত ভিটা।
গজারি বাউল যেন তোমার রূপের কারুকাজ,
অরণ্য গজলের নেশায় সারাক্ষণ কারা যেন তোমার বুকজুড়ে
এঁকে যাচ্ছে চিরায়ত ক্যানভাস,
এখানে সুন্দর এতো চাঁদের ফোয়ারা
যার বৃক্ষকুল শিশুদের আত্মার মতো সর্বদা জড়াজড়ি করে আছে।
এখানে নারীমুখ এতো সতেজ ভোরের শিশির,
যার দিকে তাকিয়ে আমি বলে ফেলেছি
এই তো আমার চিরজনমের প্রজাপতি।
যার মাটির স্পর্শে উচ্ছল হয়ে সোনাবান বিবি ভুলে গিয়েছিল
পৃথিবীর সকল দুঃখবাদ।
হে ভাওয়াল সন্ন্যাস— হে রাজেন্দ্রপুর স্বর্গের মধুময় সিঁড়ি,
তুমি কি আমাকে সেই রূপকথার কাব্য-উপাখ্যানে
বন্দি করতে জেগে আছো?
যার মাটিতে পা ফেলেই আমি অজান্তে গেয়ে উঠেছি
রবীন্দ্রনাথের দেশ-গান।

২.

মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব পৃথিবীতে একদিন এই স্তবস্তুতি
আর থাকবে না। মুছে যাবে!
মনে হয় বৃক্ষরাই এই পুরনো অচল বাক্যের স্বাদ দখল করে নেবে,
সেইসব গল্প লেখার দিন এসে গেছে।
আজকাল মানুষের চেয়ে বৃক্ষকেই আমার অনেক বেশি আপন
মনে হয়,
মানুষ ধ্বংসের নেশায় সবকিছুই করতে পারে,
বৃক্ষেরা ধ্বংস বোঝে না।
মানুষ মিথ্যার বেসাতীতে নিজেদের তলিয়ে দিচ্ছে অতল গহ্বরে,
গাছেরা মিথ্যা বোঝে না, শুধু গায় জীবন বিলিয়ে দেয়ার সংগীত।

অচলায়তন

মৃত্যুর নিদ্রার মতো কে যেন আমাকে
চিরকাল ঘুম পাড়ায়ে রাখে,
আমি তো এই শ্মশানপীড়িত ঘুমের উদ্যান চাইনি।
আমি তো এই নির্জন বনভোজন কঠোর যুদ্ধ চাইনি।
চোখের সম্মুখে এতো রোদ ভরা ঢেউ—অতলান্ত সূর্যের নাচন,
কিছুই স্পর্শ করতে পারি না আমি।
কে যেন সারাক্ষণ পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যায়,
কে যেন অবরুদ্ধ করে রাখে কবির চোখ—
হৃদয়ের বসতবাটি।
আমি এই তো এই বিপন্ন দিনকাল চাইনি।

আজও সেই চিল

শৈশবে যে-হন্তারক কুঠারের শব্দ শুনতে শুনতে
ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম,
কী আশ্চর্য! আজও সেই কলঙ্কিত গর্জনের ঝাপটায়
গহিন নদী ভাঙে।
আজও সেই ডানাভাঙা চিলের ক্রন্দনে
পৃথিবী কেঁপে ওঠে!
মাটি, জল, বৃক্ষের অন্তর খুঁড়লে আজও উদ্বাস্তু জীবনের
আর্তনাদ শোনা যায়,
ধানী জমিনের বুক জুড়ে যে-বেহায়া বারুদের প্রলেপ জমেছিল,
আজও সেই নিষ্ঠুর গন্ধে বাংলাদেশ কাঁদে।
কী আশ্চর্য! আজও সেই বিষাদিত চোখের থাবায়
লোকালয়ে কালো মেঘ জমে!

হে মানুষ, তোমাদের আকাশকে দস্যুবৃত্তি থেকে মুক্তি দাও!
ঝরেছিল যেসব রজনীগন্ধার সকাল,
তাদের অন্তত, একবার শান্তির–
নিশ্বাস ফেলতে দাও।

গ্রামীণ দেবতা

তোমার অঙ্গীকারগুলোর সে কী খেয়াল,
চিরকাল সেতারের অস্তিত্ব জুড়ে রোপণ করে চলেছে
বৃষ্টিভেজা নিশীথের মুখ।
গুরুগম্ভীর বসন্ত জানে সেই সব অকথিত গল্পমালা!

ঝিম-ধরা বিমুখী বৃক্ষরা যখন সমুদ্রসৈকতে
নক্ষত্রের খোঁজে আলুথালু পড়ে রয়,
আমার করুণ চোখেরা যখন বিষলতার ছোবল থেকে
নিস্কৃতির প্রার্থনা করে,
তখন তোমার উর্বর আঙুলিগুলি আরও বেশি
কষ্টের পৃথিবী আলিঙ্গন করে।
গ্রামীণ অপেরায় আচ্ছন্ন নারী—তুমি জানো না এই
বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাসের সে কী ক্ষয়,
দূর পর্বতের রাখাইন পাখিরা জানে ফলবান কাব্য-প্রহরের
আদিঅন্ত—ঔপনিবেশিক জ্বালা!

তোমার অঙ্গীকারগুলো কখনো কখনো
সামুদ্রিক সাপের ফণা তুলে,
ছিঁড়ে খুঁড়ে খায় কবির জীবন।
অন্ধকার কারুকার্যে তৈরি করে যুদ্ধমান মুখাকৃতি
সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের বুক ভরে রচনা করে
অগোছালো বসন্তলতা।

এতোকাল পরও সেই চিত্রপট

প্রভু, আমি কেন সেদিন বুড়িগঙ্গাজলে চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম,
যাঁদের গুলিবিদ্ধ লাশের স্তূপ দেখে নিজেকেই মনে হয়েছিল জীবন্ত লাশ।
যাঁদের শরীরের রক্তে রক্তে সারাটা নদী হয়েছিল রক্তের নদী,
যাঁদের মৃত্যুলগ্নে চিৎকার শুনে পাতালের বালিকণাও
হায় হায় করে কেঁদে উঠেছিল।
পৃথিবীর সব প্রজাপতি সাদা বকের মিছিল এসে ডানা মেলে
শান্তির ছায়া দিয়েছিল,
আমি বলেছিলাম, প্রভু আমাকে এইসব মহান বীরদের সাথে
ঘুমিয়ে থাকতে দাও!
যাঁদের জীবন ঝরে-যাওয়া প্রতিটি নিশ্বাসের সাথে সাথে
জন্ম হতেছিল বাঙালির স্বাধীনতা নামের বৃক্ষের শিকড়!

আমি বলেছিলাম প্রভু আমাকে এইসব অমর বিহঙ্গের স্পর্শ
গ্রহণ করতে দাও,
কেন ফিরিয়ে দিয়েছিলে আমায়?
কেন নক্ষত্রের আলোয় আলোয় ভাসতে দাওনি আমায়?

অথচ, আজ এতোকাল পর,
চব্বিশটি রোগাটে বসন্তের পরও সেই বুড়ো নদীটির জল সরোবরে
বারবার তোমাদের চিত্রপট—
আমার ভিতরে এসে মৃদুল গর্জন রেখে যায়,
এখনও শিশিরভেজা ভোর এলে রক্তনদীর কোমল বহতার দিকে তাকালে
খুব নিবিড় হয়ে যোদ্ধা ফারুক, মনির শাহ আলম,
নূর মোহাম্মদ-এর মতো
অগণিত শহীদের আর্তচিৎকার শোনা যায়।
আমি এইসব পুষ্পের মৃত্যুজাগরণের কথা ভেবে প্রতিদিন
ক্লান্ত হয়ে পড়ি,
বাহার আলীর স্ত্রী জরিনা বেগমের ধর্ষিতা দেহের গোঙানি শুনে
প্রভু, শত্রুর বুলেটবিদ্ধ হয়ে কেন আমাকে ওইসব গোলাপের
সারিতে দাওনি ঠাঁই?
কেন প্রত্যহ তাদের অমলিন আত্মার ক্রন্দনে রেখেছো আমায়।

কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের হুইসেল

এইখানে এসে থেমে গেছে আমাদের অন্নভর্তি ট্রেন,
তার চাকার উদর জুড়ে জেঁকে আছে প্রগাঢ় মরীচিকা,
এ যেন রাজ্যজোড়া কুলাঙ্গার শামুক।
যার জন্যই দিয়েছে খুঁড়ে খুঁড়ে চলা,
খুঁটে খুঁটে স্বপ্নের বসতবাটি,
সাম্য পরিবেশের তরতাজা ভুজ,
ভূগোল চিরে চিরে নিশিগন্ধ চুরি করে নেয়।
এ যেন বাহক নয়, চাটার নিষ্পেষণ,
যার চাকার বেড়িতে লেহন করে আছে কুহকী বর্ণবাদ।

আমরণ ওই নির্দয় শজারু ট্রেন কি নিবদ্ধ থাকবে—
অরণ্য পথে পথে?
হে বেদনাকাতর ট্রেন—অন্নের বাহক,
আমাদের শীর্ণ মর্মস্পর্শী আঙিনার দিকে একবার
সজোরে হুইসেল বাজাও,
মানবিক টানে বেজে উঠুক তোমার নিষ্প্রভ সুরমালা।

মানুষের শিল্প-বন্দনা

আসলে আমাদের দিন ও রাতের শরীর একই অন্ধকারে ঢেকে আছে।
ঝড় বয়ে যাওয়ার পর ভোরের পাখিদের বসতবাটি,
কিছু ভাঙা শুকনো ডালপালা নিয়ে
লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছি, আমরা তো—
সেইসব উদ্বাস্তু। অন্তরে সারাক্ষণ ঘিরে থাকে মাকড়শার জাল।
বিনাশের পদধ্বনিতে গোঙাতে গোঙাতে ঘুমিয়ে পড়ি,
হৃদয় ভাঙার গর্জন শুনতে শুনতে জেগে উঠি প্রতি ভোরে।
কলুষিত মুখের শিল্প বারবার দেখতে হয় প্রতিটি প্রহর।

আমাদের গরিমার ভাস্কর্য শ্মশানের তীরের আঘাতে
চিরকাল পড়ে রয় উপদ্রুত বনে,
পোড়-খাওয়া ধানের জমির আত্মা যেন আমাদের আত্মা,
এর হৃদয় খুঁড়লে আজও পিতামহের ঘামের জোয়ার এসে
জানিয়ে দেয় স্বপ্নের পথ,
যেন মনে হয় হাজার বছর ধরে আমরা সকলে একসঙ্গে
আগুনের লেলিহানে মুক্তির বন্দনা করে চলেছি।
মনে হয় দীর্ঘকাল ধরে আমরা বলছি ভাত দাও বস্ত্র দাও।
মনে হয় অজানা কাল থেকে উচ্চারণ করছি ভালো মানুষের প্রেমের শব্দাবলি।

বাউল

মুখভরা প্রচ্ছন্ন বিষাদ-হাতে বাউল্সি লণ্ঠন,
শালু কাপড়ের ঝোলায় ঝিমানো পুঁথির পাতায় পাতায়
ক্লান্ত শব্দগুচ্ছের মেলা,
দাড়ি-চুলে-ছাওয়া চিরসন্নাসীপনার বয়ানে ধ্যানমগ্ন আদম,
মাজার-সংস্কৃতির বৃষ্টিতে যে তুমি প্রত্যহ নেয়ে ওঠো,
তুমি কি সেই ক্ষরণের বাউল কেউ?
জটাধারী—নিবিড় রাত্রির জ্যোৎস্নায় একা একা গৃহের সন্ধানে
কথা বলছো প্রকৃতির সাথে,
মনে হয় ঝুড়িতে লুকিয়ে রেখেছো কোনো-এক কালের স্বর্গের সুখ-
সংসারের মায়াভোলো চরে বেড়ানো শালিক কিংবা কাণ্ড থেকে
খসে-পড়া হাস্নুহেনা,
তুমি কি সেই জ্বলন্ত বাউল কেউ,
যার আদি-অন্ত গেছে মাজারের বুকে?

অগ্রন্থিত
কবিতাগুচ্ছ

আমার মাতৃভাষা আমার জননী

আমাকে এইখানে নিয়ে এসেছে আমার মাতৃভাষা–পৃথিবীজোড়া তার জৌলুস।
আমি তার গরিমায় নিটোল মালা গেঁথে গেঁথে বলতে শিখেছি—
আমার ভাষা–আমার জননী।
আমার ভাষা আমার মাটির অবিরাম ভালোবাসা, আদিগন্ত পরানের নিশ্বাস,
আমার সাহস আমার ভাষা সংগ্রামের দিনলিপি।
মাতৃভাষা, এ আমার ঐতিহ্যেধারণের স্বরলিপি। জন্মের পর
এ ভাষাই আমাকে মা বলতে
শিখিয়েছে—আমি তার বর্ণে বর্ণে শিখেছি পত্র-পল্লবের ভাষা, পোকা-মাকড়ের-
শীর্ণ-দীর্ণ দেহের বন্দনা আর বালুচরের চড়ুইভাতি, দাড়িয়াবাঁধার জন্মকথা।

আমি অ আ বলতে বলতে এই বর্ণমালার কীর্তি গ্রহণ করতে করতে...
তার রসের সঙ্গী হতে হতে এসেছি এই বাংলায়, এসেছি তো। আসছি আজও।
এসেছি বরকতের মাথা উঁচু করার পুঁথি নিয়ে। কী করে সে বুক পেতে দিয়েছিল
বর্বরের গুলির সম্মুখে–সেই দুঃখী প্রহরের পথ চলতে চলতে এসেছি এইখানে।
এসেছি শহীদ সালাম-সফিউরের বীরত্ববাণী শোনাতে, রফিকের নিঃস্ব হওয়া
গৃহের সংবাদ নিয়ে,
এসেছি মাতৃভাষার যাবতীয় আলোকমালার অনন্যবেলার গর্জন শোনাতে।
যে ভোর পৃথিবীতে রক্তাক্ত করেছিল বাংলার জমিন, ঢাকার রাজপথ
সমগ্র বাংলার মুখ–
আমি সেই আটই ফাল্গুনের ভাষাশহীদ-সংগ্রামী যোদ্ধার কথা বলতে এসেছি।
শহীদ জব্বারের মায়ের কান্নার জল আর ঢাকা মেডিক্যালের পাশে একশত
চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার গেটের মর্মরিত ইট সুড়কির বয়ান নিয়ে এসেছি এইখানে।

বায়ান্ন'র হাত ধরে আমি বলতে শিখেছি বাংলা আমার মায়ের ভাষা।
এ আমার গর্বের সূর্য ওঠার সকাল।
এ আমার অহংকারের ধূপবাতি, চিরকালের রাঙা পিদিম।
এ-ভাষায় বলতে শিখেছি প্রতিটি প্রহরের সুখ-দুঃখ,
বলতে শিখেছি কৃষকের ফসল ফলানোর গান।
বলতে শিখেছি এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নঘোর, রাজপথের চাহনি আর মায়ের কথা।

এ আমার স্বাধীনতার সিঁড়ি, যার বুকে ভর করে কোটি কোটি বাঙালি আসতে
শিখেছে এইখানে, সেই ভোর, সেই মিছিলে, সংগ্রামে-মুক্তির আন্দোলনে
বরকত, রফিক, শফিকের রক্তমাখা পথের ধুলোর
বাতি জ্বালতে জ্বালতে আমাকে এইখানে নিয়ে এসেছে সেকালের দাবানল সৃষ্টির
সুবাতাস-মুক্তির বাঁশরি। আমি ভাষাশহীদের বীরত্বের কথা বলতে এসেছি।

মেঘপ্রেমী

মেঘেদের ডালভাত খেলায় আকাশের ভেতর। মেঘ যখন উড়নচণ্ডি সাজে,
মেঘ যখন ক্ষুধার তাণ্ডবে সবকিছু ভুলে যায়,
মেঘ যখন মানুষের জন্যে ভালোবাসার পিঁড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে,
তখন পাখির ছায়ারা ঝিম মেরে ঘুমায় বৃক্ষদের নগ্ন ডালপালায়।
আর তখনই ঘুমিয়ে পড়ে আকাশ।

আর তখনই—
পাহাড়ি পাথরের সাথে সখ্য করে কেউ-কেউ ঘুমায়, মরে রাস্তার বালিতে।
কয়েকটি পাখির উড়োউড়োকালে উত্তরের টিলায় জমে মেঘ।
ওরা মেঘপ্রেমী।
মেঘ বৃষ্টির আকারে শস্য হয়। মেঘ তিল হয়, তাল হয়, উত্তাল হয়, প্রেম হয়।

মেঘ ভালোবাসার বিকেলে বালিকার ওড়না উড়িয়ে আদিবাসীর চরকায় বোনে
সূতো। সভ্যতার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে মেঘেরা কবির বাগানের শব্দাবলি হয় কালে।
কখনো কখনো হাজং নারীর বরজে পান কুড়াতে কুড়াতে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ওরা পাখির ছায়া-প্রত্যাশী, মানুষের জীবন চায়, ওরা বনে যায়। বনের ছায়ায়
নেচে নেচে মায়া জড়ায়। দীর্ঘতার বাতাস নিঃস্ব করে মেঘেরা সাহস বাড়ায়।

জালঘর আর বুড়িগঙ্গার কথা

এই তো এখানেই ছিল অমরের জালঘর। তার পাশে বসতভিটা।
অমর নেই।
জালগুলো নেই।
বসতঘরের
কোনো চিহ্ন নেই।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কোনো এক তপ্ত দুপুরে পুড়ে ছাই হয়েছে
অমরের আস্তানা। মনে হয় এই তো দেখছি,
পোড়াজালের ছাই,
চারপাশে ছড়িয়ে—
ছিটিয়ে আছে। পোড়া
গন্ধ শাঁই শাঁই করে ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র বাংলায়। নির্মল বাতাসের
সঙ্গে এই বেদনার বুদ্‌বুদ
শব্দাচ্ছন্ন ঘোর
পুরো বাংলায়, এশিয়া, ইউরোপ—
চলে যাচ্ছে দূরদূরান্তে। বহুদূর। চলে যাচ্ছে হাসন রাজার মাজার
ছুঁয়ে রবীন্দ্রনাথের
কুঠিবাড়ি। এখনও পাকবাহিনীর সেই তাণ্ডবের
টের পাই।
রাজাকারদের উৎপাতের টের পাই।
এখনও সেই দিন এলে বুড়িগঙ্গা ঘুমাতে পারে না। জাউল্লাপাড়া
ঘুমাতে পারে না।
সেই মর্মন্তুদ সময়ের কথা আজও
গেঁথে আছে এইখানে,
এই ছায়াপথের বিলাপে বিলাপে।

সেই কবে জেলে অমরের ঘর–তার প্রাণপ্রিয় বুড়িগঙ্গায় নেমে
এসেছিল বেহুলার হারিয়ে যাওয়া।
কীভাবে তার ঘর পুড়েছে,
কীভাবে তার জাল পুড়েছে,
কীভাবে তার বসতভিটা হলো ছাই,
কিভাবে ভিটাহারা হলো জেলেপাড়া,
তার কাহিনী বলতে বলতে প্রমত্তা নদী এখন বড় ক্লান্ত। তার
বুকে এখন জলেরা বড় দূষিত যন্ত্রণা,
তার বুকে মাছ নেই। জেলেদের নৌকা নেই।
বেদের বহর নেই।
তার বুকে অমর জেলেরা এখন কেবলই স্মৃতিময় ষড়ঋতু।

তোমার জন্যে একটি গজল

এগিয়ে যাও বঙ্গজননী, আমরা তো রয়েছি,
তোমার ছায়ায় ছায়ায় অনাদিপ্রহর
বুক পেতে দেবো,
তুমি যে পৃথিবীর সরাবে জঞ্জাল,
রাখবে মানুসের মুক্তজীবন, তার সুন্দর
সবটুকু নেবো ।
তোমার কঠিন সংগ্রামে নতুন ভোরে
জেগে ওঠে পথহারা মেঘপুঞ্জ, এ-মাটির
পুণ্য পরতে,
তোমারই সাধনা, কষ্ট, শ্রমঘোর
লালিত বাংলার স্বপ্নমায়ায় বাঁচিয়ে রেখেছে মাটি, পতাকা,
পূজ্য সলতে ।
বয়ে যায় মুক্তির উল্কাপাত এইখানে
তোমারই উচ্চবদান্যে, শ্রমলাল–জীবনঘষা
জলসায়,
অমাবস্যা মুছে যায়, সন্ধ্যাবৃক্ষ তার
পাতায় পাতায় ফিরে পায় পথ, তোমারই বহতায় ।
তোমার নামে গণপ্রাণ মুক্তির নিশান
উড়ায় প্রতিক্ষণ, স্বপ্নবানে তোমারই উদাত্ত বলবানে ।
এ-মাটির সাধনা-চাওয়া, একতারা,
দোতারায়-জাগে জীবন তোমারই জয়গানে ।

কে আর আছে আমাদের
তুমি ছাড়া, মাটির সিনায় দাঁড়িয়ে যে
উঁচিয়ে ধরবে বাঙালিদের দীর্ঘ জীবন ।
কে আর আছে আমাদের,
সব স্বপ্নের পাহারাদার–অনন্য মুক্তির ভরসা,
তুমিই যুদ্ধাপরাধীর বিচারের আশা–দুর্দান্ত কাঁপন ।
তুমিই জাতির শান্তির ভুর,
স্বাধীনতাবিরোধী করবে ধ্বংস-নির্বংশ
আমরা রয়েছি কোটি কোটি প্রাণ,
এগিয়ে যাও বঙ্গজননী, সাম্প্রদায়িক,
জঙ্গির মূলোৎপাটন করো–যাও, এগিয়ে যাও
আমরা রয়েছি, তামাম বাঙালি,
তোমারই সাহস, অগণিত সঙ্গীভাই, মৌলশক্তি,
দিয়ে দেবো. দেবো সব জান ।

জানালাটা

কখনো বন্ধ হয় না আমার জানালা—
শুধু তোমার জন্যে ।
তুমি দ্যাখো না-দ্যাখো, তাকাও বা না-
তাকাও, আড়াল করো মুখ, বা
ফিরিয়ে রাখো । এ তো খোলাই আছে
চিরকাল । শুধু তোমারই জন্যে ।

এইসব কথামালা

সব পথ সবার নয় । কিছু পথ আছে, যেখানে বদ্ধ
অন্ধকার শুয়ে থাকে সারাক্ষণ । অন্ধকার কোনো ঋদ্ধতা
জন্মাতে পারে না । ওই পথ সবার পথ নয় ।
কতটা পথ পার হয়ে এসেছো, আর কতটা যাবে ।
তা কিছুই জানা নেই, জানার আছে কি? কিছু পথ
আছে যা শুধুই আমার ।
আমি চলেছি আমারই পথে পথে । যা শুধুই আমার ।

দুই
কিছু-কিছু মেঘ আছে, তা শুধুই আমার ।
আমারই অন্তর ছিঁড়ে ওরা বেড়ায়
আকাশের বুকে—দূর মহাকাশে, আবার ফিরে
আসে আবারও চলে যায়, আমারই বুক চিরে ।

তিন
তোমাকে কয়েকদিন পর নদীতীর
থেকে নিয়ে আসা হলো বাড়ির উঠোনে ।
যোদ্ধা বন্ধুরা নিয়ে এলো তোমার নিথর দেহ । লাশ ।
এ তো লাশ নয়, জ্বলজ্বলে পতাকার মুখ ।
বুড়িগঙ্গা আর ধলেশ্বরীর মোহনার যুদ্ধ
লড়েছিল বীরের মতো । শত্রুর
হামলায় তোমার—
দেহখানা লুটিয়ে পড়েছিল জলের সরোবরে ।
তারপর ভাসতে ভাসতে বালির সঙ্গে বসবাস,
তারপর মায়ের বুকে শুয়ে থাকা । বাবার বুকে বুক রাখা ।

বাড়ি ফিরে দেখি

অনেক রক্তগঙ্গার বিনিময়ে তোমায় পেলাম।
বাড়ি ফিরে দেখি,
ত্রিশ লাখ শহীদ।
দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির পতাকাটি
উড়ছে সারা বাংলায়।
পুড়েছে লাখ লাখ ঘরবাড়ি। ছাইয়ের
পাহাড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন অগণিত
শহীদের মা। খুঁজছেন তাঁর
প্রিয়তম সন্তান।
খুঁজছেন স্বামীকে, ছেলেমেয়েকে।
বর্বর পাকবাহিনী কিছুই
আস্ত রাখেনি এই মাটিজুড়ে। যেদিকে
চোখ যায়,
শুধু লাশের গন্ধ। শুধুই বিধ্বস্ত আঙিনা।
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল
জুড়ে ধ্বংসাবশেষ। ছাই হয়েছে গ্রাম।
ছাই হয়েছে গোলার ধান।
ছাই হয়েছে কৃষাণীর উড়ন্ত শাড়ি।
অগণিত মায়ের স্বপ্ন গেছে হারিয়ে।

অনেক যুদ্ধের পর তোমার দেখা পেলাম।
বাড়ি ফিরে দেখি,
সহযোদ্ধারা অনেকেই ফেরেনি। রক্তসাগরের মাঝে—
যুদ্ধজয়ী বাঙালি জাতি মহা-উৎসব করছে। স্বাধীনতার
স্পর্শে ওরা গর্জে উঠলো।
সারা বাংলায় ওড়ালো মায়ের
পতাকা। পৃথিবীজোড়া লাল-সবুজের মায়াময় পতাকা।

টানে

পারি না ভুলে যেতে তোমায়,
ভুলতে গেলে তোমার মুখ এসে আমায় থামায়।
মুখ ফিরিয়ে রাখি, যতই না করি ততটা কাছে
তোমার ছায়া এসে টানে,
ভেবেছি তুমি হারিয়ে গেছো—কোনো এক শ্রাবণের
ভরাবর্ষার বৃষ্টির গানে।
আসলে কি তা-ই? হেমন্তের বাতাস এসে বলে
সব ঠিকঠাক আছে।
কেবল নেই তুমি, আছে তোমার দেহের সুললিত
ঘ্রাণ—ওরাই তো চোখের সামনে নাচে।

এমন হবার কথা ছিল না

এই শহরকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না।
এর সুন্দর ছায়ার
ভেতর দিয়ে যে একদা তুলতুলে রাঙা বাতাস ছুঁয়েছিলাম, সেই
থেকে আশা ছিল, চাওয়া ছিল,
কাল ভোরে
আর কোনো অশুভ সংবাদ শুনবো না,
আর কোনো করুণ মুখের কেউ
এসে কড়া নাড়বে না আমার দরজায়—
এমন স্বপ্নটপ্ন ছিল।
ক্রসফায়ারের শব্দঘোর আমাকে ছোঁবে না,
সদ্য ফোটা গোলাপের পাতায় ছড়াবে না
নিকষ দুঃসংবাদ
এমন ভালোবাসা হবার কথা ছিল।
বুক কাঁপায় এমন কোনো খবর আমাকে আর
অসুখী করবে না,
আর কোনো ভোরের খবর আমার বোধনে
জাগাবে না অন্ধকার। সুন্দর ভূমির শরীরে
বসাবে না বীভৎস নখর।
এমনই আশা ছিল।

এই শহরকে আমি আর ধারণ করতে পারছি না। সবকিছু নিয়ে
যাচ্ছে কিছু ভয়ানক চিল।
নিষিদ্ধ বাতাসের তোড়ে সবকিছু কারা যেন চুরমার করতে
চায়। এমন হবার কথা ছিল না।

গান

ওরা সোনার বাংলা গড়তে
লড়ছে,
ওরা মাঠে-মাঠে-কারখানায়,
গার্মেন্টসে-পথে-পথে
নদীর মোহনায়, সব আঙিনায়,
নতুন প্রত্যয়ে
ছুটছে।

আমাদের অনেকই তো আছে
প্রাণের মিনার,
স্মৃতির ভাস্বরে অমলিন ঠিকানা,
বধ্যভূমি, শহীদের প্রাণের উচ্ছ্বাস,
নারী-পুরুষের বাঁচার সংগ্রাম—
নতুন জীবন
আনছে।

আমাদের এগিয়ে যেতে হবেই,
সুন্দর আগামীর জন্যে,
সেই লক্ষ্যে ঘরে-ঘরে, পল্লিতে
শহর, বন্দর, গঞ্জে, পাহাড়ে
অনাবিল ভবিষ্যৎ
ডাকছে।

বঙ্গবন্ধু

বাঙালি জাতির সর্বোত্তম-সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান তুমি,
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
স্বাধীনতার স্থপতি, মহান পুরুষ, এনেছো
স্বাধীনতা, পতাকা, মাটির সম্মান।
বিশ্বজুড়ে তোমার খ্যাতি ভোলেনি কো পাঁচশো কোটি মানুষ,
ভুলবে না এ-জাতি কস্মিনকালে,
বাংলাদেশে তোমারই কীর্তি বাজবে ছাপ্পান্ন হাজার
বর্গমাইলের ভূমিজুড়ে অনন্য দীপ্ত তালে।
চব্বিশ বছর সংগ্রামের পরতে পরতে চোদ্দ বসন্ত গেছে
তোমার কারাগারে, তবুও হায়েনা দল
রুখতে পারেনি তোমার সংগ্রাম, স্বপ্নের স্বদেশ।
তুমি চিরকাল এইখানে আকাশসমান বল।
তুমি অম্লান, তুমি অবিনশ্বর, যারাই তোমার সংগ্রামে করেছে
আঘাত, যুদ্ধে হত্যা করেছে ত্রিশ লাখ
পৃথিবী, চেয়ে চেয়ে দ্যাখো আজও স্বাধীন সোনার বাংলার বুক
কী গৌরবে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, উড়ছে লক্ষ কোটি শহীদ প্রাণের ডানা ঝাঁকে
ঝাঁক।

একুশে ফেব্রুয়ারি একশত চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার মিনার

এখানে এখন প্রাণের মিনার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীপ্ত স্মৃতিসৌধ।
এখানে এখন বাঙালির জাতিসত্তার স্মৃতিচিহ্ন জ্বলজ্বল করছে
গৌরবে, প্রতি ভোর। সারাটি প্রহর।
যেখানে পাক জান্তার একশত চুয়াল্লিশ ধারা
ভাঙতে ভাঙতে
বীর বাঙালি রফিক, শফিক, জব্বার
বুকে ধারণ করেছিলেন বুলেটের আঘাত,
যেখানে পাকিস্তানি জোয়ান-জল্লাদ মিছিলে গুলি ছুড়ে হত্যা
করেছিলো বাংলা মায়ের এইসব সূর্যসন্তান,
যাঁদের জীবনের বিনিময়ে সৃষ্টি
হয়েছিল মহান একুশের রক্তাক্ত দিন।
জন্ম হয়েছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন।
তাদের আপসহীন সংগ্রামে স্বাধীনতার বীজ বোনা হয়েছিল
দুঃখিনী সোনার বাংলায়, এইখানে।
সেইদিন ওরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে
যে-পথ দিয়ে বের হয়ে
সাহসী মিছিল করে বর্বর পাকশোষকের ভিত কাঁপিয়েছিল,
ওরা বুলেটের মুখে এগিয়ে দিয়েছিল জীবন,
সেই পথ 'ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে মহান একুশের দিনে
একশত চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার স্মৃতিগেট' রঙিন ইতিহাস গড়ে
দাঁড়িয়ে আছে এইখানে ধন্যমাটিতে।

ধন্য এই মাটি। ধন্য মাতৃভূমি বাংলাদেশ। তোমার প্রতি ইঞ্চি
কণার সাথে জড়াজড়ি করে আছেন অসংখ্য মহান ভাষাশহীদ,
মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ যোদ্ধা।
তোমার প্রতিটি নিশ্বাসের সাথে অবিরাম শান্তির গল্প বলে যান
ভাষাশহীদ, ভাষাসৈনিক—একুশে ফেব্রুয়ারি।
শিল্পময় হাত বাড়িয়ে যায়,
সোয়া দুইশত বছরে জ্বলে-ওঠা সকল মুক্তির মিছিল।
তোমার প্রতিটি মুক্তির পেছনে এখনও বলিয়ান হয়ে—-
এই বিষণ্ন মর্মরিত
স্মৃতিসৌধ শান্তির স্বর্গ গড়ে যান। পথ দেখিয়ে যান।

আছে সে-বুকটাতে

রাসেল আছে রাসেল ছিল রাসেল রবে চিরকাল,
এই মাটির বুকে নিশান জুড়ে স্বাধীনতায় দীপ্তকাল।
মহান তুমি শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাংলা মায়ের আঁচলধারায়,
দিগ্বলয়ের উঠোনজুড়ে, মুক্তির প্রতীক সাহস বাড়ায়।
তোমার ঘাতক বুঝলো এবার ফাঁসিতে ঝুলে ঝুলে,
তোমার আসন বিশ্বজোড়া, লক্ষকোটির আপন কোলে।

রাসেল ছিলো, রাসেল আছে, রাসেল রবে সবারই অন্তরে,
পদ্মা, মেঘনা, সীতা পাহাড়, তেঁতুলিয়া-টেকনাফের মন্তরে।
তোমায় হত্যা করে ধন্য গৌরব মুছতে পারেনি ঘাতক ওই,
তোমার নাম জ্বলছে আলো ঘরে-ঘরে–বাংলার বুকের জুঁই।

রাসেল ছিল, রাসেল আছে, রাসেল রবে সব মায়েরই শ্বাসটাতে,
শোক ভুলিয়ে কান্না মুছে– নিরবধি বলছে তারা, আছে সে-বুকটাতে

শীত

কার্তিকের শীত আসত, আসত মড়করূপে।
বাঁচতে সবাই লুকিয়ে যেতো কূপে।
ভাপাপুলি পাটিশাপটা তেলের পিঠার ভুড়ে,
হাপুস-হুপুস হুমড়ি হতো শীতের ভোর ঘুরে।
এমনই শীত সেকালেতে জেঁকে বসত পল্লি,
কুয়াশার পাহাড় জমত নদী কিংবা ঝিল্লি।
মটরশুটি সিদ্ধগন্ধ শীতের সন্ধ্যার আড্ডায়,
তালের পিঠার স্বাদ নিতে, যেতাম চলে বাড্ডায়।
কাঁথামুড়ে খালপাড়ে কলাই শাকের জমিতে,
বন্ধুরা সব ভিড় জমাতাম মাটির পাইল্লায় খেতে।
প্রবল শীতে শোলমাছের পড়ত বড় সর,
মা দিতেন পান্তাভাতে ইলিশ শুটকির ঝর।
কলেরা তাড়াতে মাঘের শীতে হতো বন্দনা,
তার পরও মরত মানুষ, বাড়ত মানব যন্ত্রণা।

এখন দেখছি গভীর শীত গেছে যে বেড়াতে,
দাও শীত যদি থাকে, কারো কোনো আড়তে।

দুঃবহরণ কাব্য

লিচু
কচু
ঘেচু
ঢিসু
নিশু
পিসু
ইসু
    খাও,
নড়ে
চড়ে
পড়ে
মরে
ধরে
করে
লড়ে
    যাও।

মুক্তির পাতাবাহার
কবি অসীম সাহাকে

এক

কাব্যের চিরায়ত আকাশ ছুঁয়েছো দূরন্ত বাঙালি,
তোমার সাহসেই সভ্যতায় আজও পিদিম জ্বালি ।

দুই

পূর্ব গ্রহান্তরের পুঁথি হাতে এসেছিলে এইখানে ।
কেবল জীবন ঘষামাজা, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে– ধুলোয়
রক্ত মেখে
তামাম জমিন ভরে তুলছো মুক্তির পাতাবাহার ।
যেন শান্তির গল্পসম্ভার,
পরানের ভেতর এইসব লালিত স্বপ্নটুকুই বাজে ।

তাঁর মুখ বাংলার মায়াবী মুখ
(বিপ্লবী হেনা দাশ মাসি স্মরণে)

লাখাই, তোমার বীর সন্তানদের রক্তে গড়া স্বাধীন বাংলায় শিশুরা এখন
মায়ের আঁচলে শান্তির ঠিকানায় ঘুমায়।
মেয়েরা বিনাশী পর্দা ছিন্ন করে—
বীরদর্পে, সাহসী পদভারে—
ছুটে চলা ফসলের স্বপ্নে–কাদামাখা মাঠের কাজে যায়,
ছুটে চলে ইটভাটায়, কারখানার কর্মস্থলে-অফিসে, গার্মেন্টস-আঙিনায়।
দিনমজুরের টুকড়ি-
হাতে যে মা আমার ভোরে ঘন কুয়াশা ঠেলে কাজে যায়,
শিক্ষাবঞ্চিত যে-যুবক বেদনা সাথি করে প্রত্যহ ঠেলাগাড়ি, রিকশা বহে,
সেই ভাই সেই বোনের বুকে বুক রেখে লাখাই তোমার সন্তান বহুকাল
লড়াই করে আসতে শিখেছে এইখানে।
লাখাই, তোমার মনে পড়ে—
সেই বিপ্লবী, সেই মহীয়সী জননী আমার, আমার বিপ্লব, আমার সাহস,
আমাদের নির্ভর ঠিকানার সূর্য তোমার বুকেই উদিত হয়েছিল,
এই উপত্যকা থেকে শোষণ, দখলদার, লুটেরা তাড়াবার জন্যে উদিত
এই কীর্তিমান বীর স্বাধীনতার জন্যে, পতাকার জন্যে কী নির্ভয়,
অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়বার জন্যে—
মানবিক, মানুষদরদি সমাজ আনার জন্যে কী বিস্ময়কর অনুরণনের বাঁশি
বাজিয়ে গেলেন—
তা কি তোমার মনে পড়ে ধন্যবান শ্রীহট্ট।

লাখাই, তোমার মাটির সেই প্রিয় সন্তানের নামে এখানে এখন প্রকৃতি,
মানব, বৃক্ষের ঝনঝানানো পাতারবহর, নদীর অন্তর ছিঁড়ে জেগে-ওঠা চর,
প্রবল বৃষ্টিঘোরের দিনরাত—
তারই জন্যে উন্মুখ হয়ে ভালোবাসার স্বপ্ন বুনে যায়। ওরা তারই
পথে–পথে
সুখীকাল রচনার গান গেয়ে যায়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী ধ্বংসের
মিছিল করে যায় ওরা সুন্দর আগামীর জন্যে।

লাখাই তোমার মনে নেই, তোমার বুক থেকে খানিকটা দূরের পথ
পেরিয়ে শ্রীহট্ট শহরের পুরনো লেনের বাড়িতে উনিশশো চব্বিশ
সালের বারো জানুয়ারি–।
পৃথিবী কাঁপিয়ে জন্মেছিলেন বিপ্লবী হেনা দাশ।

লাখাই, তোমার কি মনে নেই—এই বাংলার বুক—চেপে—বসা বিনাশী
সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ'-এর বিরুদ্ধে, পাঞ্জাবী, বিহারি, ইয়াহিয়া-আইয়ুবি
বর্বরতা পিষে মারার লড়াই,
স্বদেশী আন্দোলনে,
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে,
অসহযোগ আন্দোলনে,
ভাষার সংগ্রামে,
ব্রিটিশ তাড়াবার জন্যে,
নানকার আন্দোলনে—
ধর্মান্ধ-বর্বর ভূত পাকিস্তানিদের তাড়াবার জন্যে, জনযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে
কীভাবে গর্জে উঠেছিলেন এই জননী।
তোমার কি মনে পড়ে না, কিশোর বয়স থেকেই তাঁর দুর্বিনীত
লড়াইয়ের কথামালা।

লাখাই জননী আমার। মহীয়সী, দীপ্ত সংগ্রামের প্রতীক হেনা দাশ।
তোমার সংগ্রামের প্রতিটি প্রহরের আলো জ্বলছে আজ সার্বভৌম
সোনার বাংলায়।

লাখাই, তুমি বাঙালি সংস্কৃতির লালনের তীর্থভূমি, শ্রমিকরাজ
কায়েমের তীরন্দাজ,
এজাতির মুক্তি সংগ্রামের লড়াইয়ে, স্বপ্নরঙিন ইতিহাস গড়ার যুদ্ধে—
তোমার দত্ত পরিবারের আত্মদান-
আলোকিত করে রেখেছে রক্তেপাওয়া বাংলার প্রতি ইঞ্চি মাটির বুক।

দত্ত—পরিবার, তোমার অসংখ্য বিপ্লবীর ঘামঝরা, রক্তঝড়া, কষ্ট আর
তাঁদের বয়ে চলার প্রতিটি সুখময় ভোর
এখন আমাদের গর্বিত ইতিহাস। শিকড়-সংস্কৃতি গড়ার ইতিহাস।

তোমার বীরযোদ্ধা—হেনা মাসি—আমাদের সত্তার অমলিন আরেক নাম—
তাঁর জীবন মানে বাংলার জীবন,
তাঁর মুখ বাংলার মায়াবী মুখ।

মাস্টারমশাই

(সন্তোষ গুপ্তকে)

যুগে যুগে এইখানে এসেছে মানবধর্মের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ
লড়াকু সন্তান,
তুমি সেই আলোর বার্তাবাহক, যার বুক জুড়ে সমগ্র
জীবন বয়ে চলেছে
বঞ্চিত মানুষের মুক্তির কথামালা। বয়ে চলেছে মাটির
মায়া, সংগ্রাম আর শ্রমিকরাজ কায়েমের যুদ্ধ যুদ্ধ বেলা।
তুমি সাহসের ঠিকানা।
তুমি জাগরণের প্রতীক,
আলোকিত সভ্যতার এমনই কারিগর তুমি—
যার ছায়ার ভেতর ঠাঁই নিয়ে এখনও এগিয়ে চলেছি
আমরা। কমরেড, আমাদের ঠিকানা এখন তোমার
অসাম্প্রদায়িক কথামালা,
আমাদের ঠিকানা এখন জেলখানায় বসে লেখা তোমার
অমর কবিতামালার প্রদীপ্ত বাতিঘর,
আমাদের ঠিকানা এখন তোমার নির্ভীক জীবনচরণ।
কমরেড,
আগামী পৃথিবীর জ্বলজ্বলে মানব হয়ে জ্বলবে তুমি
আমাদের প্রতিটি প্রহরে।
আমরা এখনও তোমার পথে-পথে, তোমার
মৌলবাদবিরোধী
তরবারির সাহসে,
আমরা এখনও তোমার মানবধর্মের দর্শন নিয়ে মাতৃভূমি
থেকে দানবের ডানা ভাঙার কবিতা লিখে চলেছি।
অনাগত পৃথিবীর সকল প্রজন্ম যখন তোমার
কুসংস্কারবিরোধী গান গেয়ে জাগাবে
ঘুমন্ত জনতা। তখন তোমার আপসহীন সাংবাদিকতা,
তোমার দুর্বিনীত কলমযুদ্ধ,
তোমার মানবমুক্তির সংগ্রামের তারায় তারায় এগিয়ে
যাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ। মনে পড়ছে,
জেলখানার দেয়ালে লেখা তোমার সেই মরমি কবিতার
হুংকার,
যা এখন কৃষকের বাঁচার সাহস, কারখানায় শ্রমিকের
চাকা ঘোরানোর ধারাপাত হয়ে আছে।

যুগে যুগে এইখানে যারা ভালোবেসেছে ভবের শান্তি
আর নির্ভেজাল মুক্তির উপত্যকা,
তুমি সেই বিদ্যার মাস্টারমশাই,
তুমি সেই ভূমির স্বাধীনতার অমলিন যোদ্ধা।

এই কবিতার নাম গাজীউল হক

বুকের ভেতর জমা রেখেছি তোমার কীর্তিময় পৃথিবী।
বুকের সিন্দুকে যা-কিছু জমিয়ে রেখেছি তাতে রয়েছে
তোমার মুখ,
তোমার জীবন
তোমার গানের কথা
তোমার ভাষা-সংগ্রামের ইতিহাস,
মায়ের ভাষাকে মাতৃভাষার রূপায়ণে তোমার
আন্দোলন—
স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমার শেকড়সন্ধানী বয়ে চলা।
মুক্তিসংগ্রামে তোমার আপসহীন যুদ্ধ,
মুক্তিযুদ্ধে তোমার বীরত্বগাথা,
হারমোনিয়ামে তোমার উচ্ছ্বসিত আঙুলের লড়াই।

বুকের ভেতর জমা করে রেখেছি ঐতিহ্যেঘেরা সেই চিত্র—
গামছা দিয়ে হারমোনিয়াম বেঁধে তা গলায় ঝুলিয়ে গান
গাইছেন গাজীউল হক। তাঁর পাশে শিল্পী আবদুল লতিফ,
আকাশ কাঁপিয়ে গানের চরণ গাইছেন তোমার সাথে
আবদুর গাফফার চৌধুরী, আবদুস সালাম, শফিকুর রহমান
জব্বার—আরও অনেকে।
একশো' চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার
জন্যে তোমাদের মিছিলের গর্জন এখনও
বাংলাদেশকে জাগায়।
এখনও বায়ান্নর একুশের গর্বিত সেই দিন তোমাদের
নামে—
বাংলার সুখের জন্যে বাঙালির শান্তির জন্যে
স্বাধীনতার ঘাতকদের ঘায়েল করার জন্যে
সাহস বাড়িয়ে যায়।
বুকের ভেতর জমিয়ে রেখেছি
বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি তোমার—তোমার সঙ্গী
যোদ্ধাদের একশত চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার দলিল।
অন্তরের খুব গভীরে চিরজনমের জন্যে জমা হয়ে আছে
অগণিত শ্রেষ্ঠতম সন্তানের নাম-ইতিহাস,
জমা হয়ে আছে অগণিত যোদ্ধার রাঙায়িত কাল।
তুমি সেই কাল, সেই যুদ্ধের, সেইসব অমর ইতিহাসের
অমলিন স্বাক্ষর। জ্বলজ্বলে ইতিহাস। মহান যোদ্ধা।

আকাশ-পাতালের কবিতাগুচ্ছ

আকাশ একা একা তাকায় আমার দিকে।
আমারই দিকে আকাশ
সুন্দর চোখ মেলে তাকায় আর দেখে, কোনো কোনো নারী কবিদের
বাগান থেকে চুরি করে নেয় অস্থির শব্দমালা।
আকাশ নারী বোঝে না, বোঝে কবির মাথার ভেতর গিজগিজ-করা
লবঙ্গবন, কাঁকড়ার লাফালাফি, দেখে বটগাছের ডালপালার
গুঁতোগুঁতির কাহিনী।
আকাশ বড়বেশি উদারতার সেই কবে মেলে ধরেছে
কবির কবিতার খাতা—তা আকাশই জানে।

২.
তারছেঁড়া দোতারা পড়ে আছে, গায়েন নেই। তাই বুঝি এখন আর
হেমন্তের গ্রামে কুয়াশার গানের আসর দেখি না, এই শোকে-শোকে
খড়-ছাওয়া উঠোনে রাত্রির চাঁদ নিবুনিবু হাঁটে মেঘেদের ফাঁকে-ফঁকে।
বিলের কিছু-কিছু শ্যাওলার বাতাস এই গল্প শুনে বয়ান করে যায়—
গায়েন নেই, আসর নেই, মরে গেছে ভালোবাসা, ওরা বেড়াতে গিয়েছে
অজানা রূপবানের দেশে, বহুদূরে না—ফেরা পৃথিবীর তাণ্ডবখানায়।

৩.
প্রেমের গায়েনকে তো দেখি না। হারিয়ে গেলো কি তার সুর! নাকি চুরি
হলো। তার লম্বাচুলের বাতাস, একতারার সিম্ফনি, লাউয়ের ডগার বিহান—
কত কী চুরি হয়ে গেল! প্রেমের গায়েনকে তো দেখি না, দেখি না তার মুখ।

৪.
ফুল বিক্রির নেশায় সারাক্ষণ ছোটাছুটি দেখনি। সাধারণ নারী, কিশোরী—
ক্ষুধার রোগ সারাতে কী সুন্দর পেশায় নেমেছে এইখানে, কত ছোটাছুটি।

৫.
নুড়িপাথর তাকায় আমার দিকে, ওরা দেখে আমি কতটা ভালো আছি।
আমার প্রকৃতি কোথায় হারায় তার রূপের খোয়ার—তাও ওরা দেখে।

৬.
শান্তিনামার বর্ষণ আর কতদূর। আবার ডাকছি, আয় শান্তি আয় আমাদের ঘরে। শুধু গাধার কর্ষণ, কিছু সুপ্রভাত, মাঝেমধ্যে প্রাণ-জুড়ানো কিছু সংবাদ আসে, তার পরও বলছি, শান্তি নেমে আসুক, শান্তি নেমে আসুক এইখানে পূর্ণ শান্তি চাই।

৭.
কিছু-কিছু বিকেলের অপেক্ষায় থাকি। ওগুলো আসলে
বিকেল নয়।
বড়বেশি অপেক্ষায় থাকি তার বুকের ভেতর ছুঁয়ে-থাকা
গভীর হিজল বনের পদ্যরসের জন্যে।

৮.
আমার কোন আকাংখা নেই। আবারও বলছি, আমার
কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকবে না-যদি পৃথিবীতে শান্তি এনে দাও

৯.
বুদ্ধিরা কুবুদ্ধির ঢলে পরাজিত হতে হতে বুদ্ধির
হাট যাচ্ছে মরে। মানুষেরা ভালো বুদ্ধি কিনতে এখন চলে
যাচ্ছে অন্যদেশে, অন্য নগরী-ফুটপাতের দোকানে।

১০.
আমাদের সবই আছে। আছে বিশাল আকাশ। মাটির
ঢেড়া, কনুই ঠেক-দেয়া শান্তির স্বপ্ন। নদীদের বেড়ানো।
শুধু নাই জাতীয় চরিত্র, নেই মানুষের জন্য ভালোবাসা।

১১.
এই শহরের ভেতর কত কী বজ্জাত ঢুকে আছে। প্রতিনিয়ত
মানুষ খুন করে ওরা বোঝাতে চাইছে আমরা চোখে দেখি না।
আমাদের চোখগুলো কি বেড়াতে গিয়েছে? নাকি জঙ্গিদের
সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের ভিড়ে কিছু হারিয়ে শূকরের বিষ্ঠার
ভেতর কাটাই রাত।
আহা কোথায় গেল আমাদের হাতের
মুঠোর সেই আঘাত—যার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধে ওদের
খতম করেছিলাম।

১২.
ও মাঝি তুমি কি পদ্মার ঢেউ-এর গর্জনে শুনতে পাওনি
শ্যাওলার বিষময় কান্না।
দেখনি, জালের তলায় মাছেদের চুলবুলি খেলাখেলি।
দেখনি, পাহাড়ি কচুরিপানায় দার্শনিক কীটপতঙ্গের বহর।
এতোকাল ওরা হিমালয়ের অন্তরে ফুল হয়ে বাতি হয়ে
বাসা বেঁধেছিল মানবশক্তির জন্যে, বর্ণালি মুক্তির জন্যে।
ওরা সাজিয়েছিল পর্বতে মানবমনের বাসর, দুর্জয় বাসর।

১৩.
অনন্য সেই সব নারীকে নিয়ে আমরা গর্ব করে করে
নিজেদের উজ্জ্বল করছি, কিন্তু তাদের স্মরণে কে কতটা
ফেলেছি চোখের জল, যারা যুদ্ধে হারিয়েছে সম্ভ্রম আর
জীবনের সর্বোচ্চ ধন।